University of Rajshahi Rajshahi-6205 Bangladesh.

RUCL Institutional Repository http://rulrepository.ru.ac.bd

Department of Islamic Studies MPhil Thesis

2008-02

Abbas Ali Khan and His Thoughts: An Appraisal

Islam, G. M. Shafiqul

University of Rajshahi

http://rulrepository.ru.ac.bd/handle/123456789/1017

Copyright to the University of Rajshahi. All rights reserved. Downloaded from RUCL Institutional Repository.

আব্বাস আলী খান ও তাঁর চিন্তাধারা ঃ একটি মূল্যায়ন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের
এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. এ. কে. এম. আব্দুল লতিফ
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী-৬২০৫।

গবেষক
জি. এম. শফিকুল ইসলাম
জুলাই-২০০৩ ব্যাচ, রোল-৩৭
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী-৬২০৫।

ফেব্রুয়ারি - ২০০৮ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم

Phone: Of: 750041/4154
Res: (0721) 750212, Mob: 01914-254112

Dr. A. K. M. Abdul Latif
B. A. (Hons), M. A, Ph. D. (Raj)
Professor
Department of Islamic Studies
University of Rajshahi
Rajshahi-6206, Bangladesh.
Date: 27. 2. 2008

ড. এ. কে. এম. আব্দুল লতিফ
বি. এ. (অনার্স), এম.এ, পিএইচ. ডি. (রাজ)
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী-৬২০৫, বাংলাদেশ।

تليفون: مكتب: ٧٥٠٠٤١-٤٩/٤١٥٤
مسكن: ٧٥٠٢١٢ (٠٧٢١)
الدكتور إ، كى، إم عبد اللطيف
الأستاذ
قسم الدراسات الإسلامية
جامعة راجشاهي
راجشاهي، بنغلاديش.
التاريخ: ٢٠٠٨/٠٢/٢٧

প্রত্যয়ন পত্র

২০০৩ সালের জুলাই ব্যাচের এম. ফিল. গবেষক জি. এম. শফিকুল ইসলাম, রোল নং-৩৭, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত "আব্বাস আলী খান ও তাঁর চিন্তাধরা ঃ একটি মূল্যায়ন" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে,

১. এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় প্রণীত হয়েছে।

২. এটি গবেষকের সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রচেষ্টা ও একক গবেষণাকর্ম।

৩. এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম।

আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এই শিরোনামে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এই গবেষণা সন্দর্ভের চুড়ান্ত কপিটি আদ্যান্ত পাঠ করেছি এবং তা উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

আপনার বিশ্বস্ত

২৮.০২.০৮

(ড. এ. কে. এম. আব্দুল লতিফ)
প্রফেসর ও তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী-৬২০৫।

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, এ অভিসন্দর্ভটি আমার একক গবেষণার ফসল। এটি কোন যুগ্ম গবেষণাকর্ম নয়। এটি সম্পূর্ণ বা এর কোন অংশ কোথাও প্রকাশিত হয়নি এবং কোন ডিগ্রী অথবা পুরস্কার গ্রহণের জন্য কোথাও উপস্থাপন করিনি।

গবেষক জি. এম. শফিকুল ইসলাম
২৮.০২.২০

জি. এম. শফিকুল ইসলাম
জুলাই-২০০৩ ব্যাচ, রোল-৩৭
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী-৬২০৫।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আল-হামদুলিল্লাহ। আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মহান রাব্বুর আলামিনের প্রতি যিনি মানুষকে আশরাফুর মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধির দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। এবং তারই একান্ত মেহেরবানীতে আমার এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক, সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি যিনি ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য প্রেরিত হয়েছেন।

জ্ঞান চর্চার তাগিদ থেকে আমার উচ্চতর গবেষণার প্রয়াস দীর্ঘ দিনের। এ প্রয়াসের বশবর্তী হয়ে আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. এ. কে. এম. আব্দুল লতিফ স্যারের শরণাপন্ন হই। তিনি এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহানুভূতি ও আন্তরিকতা নিয়ে আমাকে উৎসাহ প্রদান করেন। নিজের হাজারও ব্যস্ততার মাঝে আমার প্রতি যথেষ্ট আন্তরিক এবং আমার আগ্রহের বাস্তবায়নের জন্য অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি আমার জন্য যে ভাবে ত্যাগ স্বীকার ও শ্রম স্বীকার করেছেন, নিরন্তর উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন সত্যিই তার তুলনা হয় না। তিনি আমার এ অভিসন্দর্ভ আদ্যন্ত দেখে দিয়েছেন। এ গবেষণা পত্রের প্রতিটি শব্দ তিনি পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করেছেন। মোট কথায় এ অভিসন্দর্ভের প্রতিটি শব্দ প্রতিটি ছত্র তাঁর অবদানের স্বাক্ষ্য বহন করছে। তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শুধু আজ কেন, কোন দিন তাঁর এ অবদানের ঋণ আমার পক্ষ্যে পরিশোধ্য নয়। আমি তাঁকে আন্তরিক ভাবে মুবারকবাদ জানাচ্ছি এবং মহান আল্লাহর নিকট তাঁর উত্তম পুরুষ্কার কামনা করছি।

আমি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান স্যার-এর প্রতি যিনি তাঁর মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমার এ গবেষণা কর্মকে সহজ করেছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মণ্ডলীর প্রতি। যারা আমাকে এ সন্দর্ভের ব্যাপারে মূল্যবান পরামর্শ এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাকে উৎসাহ প্রদান করেছেন। বিশেষ করে আমারই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্, প্রফেসর ড. এফ. এম. এ. এইচ. তাকী, প্রফেসর ড. মোঃ রুহুল আমিন, ড. মুহাম্মদ আবুল খায়ের, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, শেখ মোঃ তৈয়বুর রহমান ও মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন-এর প্রতি যারা মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমার সু-কঠিন কাজকে সহজ করে তুলেছেন। এছাড়া আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল হান্নান স্যার-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় আববা-আম্মা ও শশুর-শাশুড়ীর প্রতি যাদের স্নেহ ভালবাসা এবং আন্তরিক দোয়ায় গবেষণা কর্মের মত একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি।

আমি আন্তরিকতার সাথে স্মরণ করছি, আমার পরম হিতৈষী 'এম. এ. মজিদ ডিগ্রী কলেজের' অধ্যক্ষ জনাব মির্জা নুরুজ্জামান, বন্ধুবর খান তরিকুল ইসলাম, মোঃ নাজমুস শাহাদত, মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন, আব্দুল্লাহ আল-মামুন, মিকাইল হুসাইন, মোঃ কুদ্দুসুর রহমান, জি. এম. শহিদুল ইসলাম, বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক ড. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম মাসুদ, মুহাম্মদ জাহিদুর রহমান, মুহাম্মদ রেজাউল করিম, মুহাম্মদ দেলাওয়ার হুসাইন সাঈদী, মুঃ সানাউল্লাহ, মুঃ মুমিনুল ইসলাম মামুন, মুশফিকুজ্জামান নোমান, মু. ফরহাদ আলম, আব্দুল্লাহ্ আল-মাহমূদ সোহেল, মোঃ নজির আহমাদ, মাফরুজা সুলতানা, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী প্রভাষক মুঃ জিল্লুর রহমান, 'মুহসিন মহিলা কলেজের' ইসলাম শিক্ষা বিভাগের প্রভাষক ও গবেষক এইচ. এম. নজরুল ইসলাম, ওয়ামী-এর প্রোগ্রামার অফিসার মুঃ নাজমুজ শাহাদাত ওবায়েদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র মু. নাইমুল ইসলাম এবং আমার সহধর্মিনী মাহবুবা সুলতানা সহ যারা সহযোগিতা করেছে এবং আমার এ গবেষণা কর্মে আমাকে যে প্রেরণা যুগিয়েছেন তা সত্যিই স্মৃতির মুকুটে চির অম্লান হয়ে থাকবে। আমি তাদের সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, খুলনা বিভাগীয় গন্থাগার এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সেমিনারের সকল কর্মচারী ও কর্মকর্তা বৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তারা আমাকে সময়ে অসময়ে সেমিনার ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি সরবরাহ করে গবেষণার কাজে সহযোগিতা করেছেন।

আমি আরো শুকরিয়া জানাচ্ছি মোঃ মোশাররফ হোসেন এবং গোলাম মুর্শেদকে যারা আমার অভিসন্দের্ভের কম্পিউটার কম্পোজ অতি যত্ন সহকারে সম্পন্ন করে দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন।

পরিশেষে মহান রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে দোয়া করছি যে, তিনি যেন আমাদের এ খেদমত টুকু কবুল করেন এবং আমৃত্য আমাদেরকে ইসলামের সঠিক পথে অবিচল থাকার তাওফিক দেন। আমীন!

জি. এম. শফিকুল ইসলাম
এম. ফিল. গবেষক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সূচী পত্র

প্রত্যয়ন পত্র	অ
ঘোষনাপত্র	আ
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	ই-ঈ
সূচী পত্র	উ
ভূমিকা	১-৩
প্রথম অধ্যায়: আব্বাস আলী খানের সমসাময়িক বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ..	৪-৩৬
বাংলাদেশের ভৌগলিক পরিচিতি	৪-৮
বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা	৯-১১
বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা	১২-৩৬
দ্বিতীয় অধ্যায়: আব্বাস আলী খানের জীবন পরিক্রমা	৩৮-৭১
বংশ পরিচয়	৩৮
জন্ম	৩৯
নামকরণ	৩৯
বাল্য জীবন	৪০
শিক্ষা জীবন	৪০-৪৩
বৈবাহিক অবস্থা	৪৪
কর্মজীবন	৪৫-৪৮
জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান	৪৮-৫০
বিদেশ সফর	৫০-৫১
কারাবরণ	৫১-৫২
রচনাবলী	৫২-৫৫
চরিত্র মাধুর্য	৫৫-৫৬
সমাজ সেবামূলক কর্মকাণ্ড	৫৬-৬১
ইন্তিকাল	৬১-৬৪
শোকসভা ও দু'আর মাহফিল	৬৫-৬৭
আব্বাস আলী খান সম্পর্কে সুধীজনের মন্তব্য	৬৭-৭১
তৃতীয় অধ্যায়: ইসলামী আন্দোলনে তাঁর চিন্তাধারা ও মূল্যায়ন	৭৩-১১১
ইসলামী আন্দোলনের পরিচয়	৭৩-৮৫
ইসলামী আন্দোলনে আব্বাস আলী খানের অবদান	৮৫-৮৮
রাজনৈতিক অঙ্গনে আব্বাস আলী খানের অবদান	৮৮-৯৪
লেখনির মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনে অবদান	৯৪-৯৯
বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনে অবদান	১০০-১১১
চতুর্থ অধ্যায়: আব্বাস আলী খানের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা	১১৩-১৬০
উপসংহার	১৬১-১৬৩
গ্রন্থপঞ্জী	১৬৫-১৭১
পরিশিষ্ট	১৭৩-২১২
রেডিও ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ	১৭৩-১৮৮
হস্তলিপি	১৮৯-১৯৮
আলোকচিত্র	১৯৯-২১০
আব্বাস আলী খানের বর্তমান বংশধর	২১১

ভূমিকা

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। বিশ্বমানবতার কল্যাণ সাধনের জন্যই ইসলামের আবির্ভাব। ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুগে যুগে পৃথিবীতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন,[১]

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

-'তিনি সেই সত্ত্বা যিনি তাঁর রাসূলকে সত্য দ্বীন ও হেদায়েত সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে সকল মতবাদের উপর ইসলামকে বিজয়ী করতে পারেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে'।

সর্বশেষ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে তিনি দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণতা বিধান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,[২] الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

-'আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর খোলাফায়ে রাশেদা এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁদের পরে বিভিন্ন সময়ে ইসলামের মহান মনীষী ও ইমামগণ এ আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। খোলাফায়ে রাশেদার পর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও মুসলিম শাসিত দেশগুলোতে সর্বত্রই কুর'আন ও সুন্নাহর আইন প্রচলিত ছিল। এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলেও ইসলামী আইন কানুন চালু ছিল। কতিপয় স্বার্থপূজারী 'আলিমগণের সহযোগীতায় সম্রাট আকবর 'দ্বীনে ইলাহী' নামে এক উদ্ভট ধর্মের প্রবর্তণের চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দ মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী (র) প্রচণ্ডভাবে রুখে দাঁড়ান। মোঘল সাম্রাজ্য পতনের পর বিগত শতাব্দির প্রথম পদে সাইয়্যেদ আহমদ (র) এবং শাহ ইসমা'ঈল (র) ইসলামী আন্দোলনকে সশস্ত্র যুদ্ধে রূপদান করেন। ইসলাম বিরোধী শিখ শক্তিকে পরাভূত করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তাঁরা একটি সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন। কিন্তু কতিপয় বিশ্বাসঘাতক মুসলমান নেতৃবৃন্দের নির্দেশে সমগ্র অঞ্চলে ফজরের নামাজরত অবস্থায় কয়েক হাজার মুজাহীদকে একই সময় শহীদ করা হয়। এ সময় সাইয়্যেদ আহমদ উপলব্ধি করলেন এ সব বিশ্বাষঘাতক মুসলমান নেতৃবৃন্দ ইসলামী শাসনকে মেনে নিতে রাজী নয়। তাই তিনি অন্যত্র চলে

---

১. *আল-কুর'আন,* সূরা আস-সফ: ৬১ : ৯।
২. সূরা আল-মায়িদা: ৫ : ৩।

যাওয়ার জন্য সংগী সাথীসহ বালাকোটে বিশ্রাম করতে থাকেন। এমতাবস্থায় ঐ সকল মুসলমান নেতৃবৃন্দের প্ররোচনায় শিখ বাহিনী বালাকোটে বিশ্রামরত মুজাহিদ বাহিনীর উপর হঠাৎ আক্রমন চালায়। এ যুদ্ধে সাইয়্যেদ আহমদ (র) তাঁর বহু সংগী সাথী সহ শাহাদত বরণ করেন।[৩] বালাকোট ট্রাজেডির একশত বছর পর ১৯৩১ সালের শেষার্ধে মাসিক 'তর্জুমানুল কুর'আনের' মাধ্যমে নতুন করে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা করেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। মাওলানার একজন ঘনিষ্ট সহচর হিসেবে আব্বাস আলী খান তাঁর দ্বীনি দায়িত্বের প্রায় সিকি শতাব্দীকাল ব্যাপী আঞ্জাম দিয়েছেন। এ দীর্ঘ সময় তিনি মাওলানা মওদূদী (র)-এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সান্নিধ্যে থেকে এদেশের মানুষের নিকট ইসলামী আন্দোলনের গ্রহণযোগ্যতাকে ফলপ্রসূ করে উপস্থাপন করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় তিনি মাওলানার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই অনুবাদ করেছেন। কর্মজীবনের প্রথম পর্যায়ে খান সাহেব সরকারী চাকুরীর সুবাদে তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক এর সান্নিধ্যে আসায় ধর্মহীন রাজনীতির কুফল স্বচক্ষে উপলদ্ধি করেন। পরবর্তীতে ফুরফুরা শরীফের পীরের সান্নিধ্যে এসে তিনি ইলমে তাসাউফ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। পঞ্চাশ দশকের মাঝা-মাঝি সময়ে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে তিনি জামায়াতে ইসলামীর সাথে নিজেকে শামিল করেন। জামায়াতে ইসলামীর বৃহত্তর অঙ্গনে কাজ করার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এ দেশের রাজনীতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটময় ইস্যুতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। আশির দশকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে তিনিই সর্বপ্রথম কেয়ারটেকার সরকারের ফর্মুলা ঘোষনা করেন। রাজনীতির মত জটিল ও সংকটাপন্ন অঙ্গনে কাজ করলেও ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপক গবেষণা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

আববাস আলী খান একজন ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন। তাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর চিন্তা চেতনা এবং এ ক্ষেত্রে তিনি কতটুকু অবদান রেখেছেন ও সার্থক হয়েছেন তার যথার্থ মূল্যায়ন করাই হবে আমার এ গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য। তাছাড়া তার সম্পর্কে ব্যাপক ভাবে গবেষণা হওয়া একান্তই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু একথা সত্য যে, আমাদের জানা মতে এ যাবৎ কোন গবেষক তাঁর এ অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান অবদানের সঠিক মূল্যায়নে এগিয়ে আসেননি। এমনকি তাঁর কর্মবহুল জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুক্ষাতিসুক্ষ্ম আলোচনা ও পর্যালোচনায় তেমন কেউ ব্রতী হননি। তাই এমন একজন ব্যক্তির কর্মময় জীবন ও চিন্তা দর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত অধ্যয়ন ও গবেষণার প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। পাশাপাশি ইসলামী আন্দোলনের সকল স্তরের জনশক্তিকেই তাঁর জীবনেতিহাস ও চিন্তাধারা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এ সব কথা বিবেচনা করে আমরা এ তথ্যবহুল বিষয় **'আব্বাস আলী খান ও তাঁর চিন্তাধারা ঃ একটি মূল্যায়ন'** শীর্ষক শিরোনামে এ বিষয় নির্বাচন করেছি।

---

৩. আব্বাস আলী খান, *ইসলামী আন্দোলন ও তাঁর দাবী* (ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, প্রকাশনা বিভাগ, ১৯৮৯ খ্রী:), পৃঃ ৬।

আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি তাঁর জীবন ও চিন্তাধারা সম্পর্কে জানার সূচনা মাত্র। ভবিষ্যতে আশা করি তাঁর সম্পর্কে অধিক গবেষণা পরিচালিত হবে। আমরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ বিষয়ে নিরলস গবেষণার মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য উদঘাটনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। গবেষণার নিয়ম পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমরা গবেষণা বিষয়ক আর্ন্তজাতিক স্বীকৃত নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করেছি। আমরা এ বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা পরিচালনার নিমিত্তে অভিসন্দর্ভের বিষয় বস্তুটিকে মোট ৪টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি এবং প্রতিটি অধ্যায়ের শিরোনাম নির্ধারণ করেছি। এছাড়া পৃথক ভাবে ভূমিকা ও উপসংহার সংযোজন করেছি।

ভূমিকা: এতে আমরা গবেষণার উদ্দেশ্য, বিষয় নির্ধারণের যুক্তিকতা, গবেষণার পদ্ধতি, উৎস এবং অভিসন্দর্ভের অনুসৃত নীতিমালার বিবরণ দিয়েছি।

প্রথম অধ্যায়: এর শিরোনাম দিয়েছি, **আব্বাস আলী খাঁন এর সমসাময়িক বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা**। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচয়, তৎকালীন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজ চিত্রকে এতে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়: এ অধ্যায়ের শিরোনাম **"আব্বাস আলী খানের জীবন পরিক্রমা"**। এতে তাঁর বংশ পরিচয়, জন্ম, বাল্য জীবন, কর্ম জীবন, চরিত্র মাধূর্য, সমাজসেবা মূলক কর্মকান্ড এবং তাঁর ইন্তিকাল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: এর শিরোনাম হলো, **"ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনে তাঁর চিন্তাধারা"**। এ অধ্যায়ে ইসলামী আন্দোলনের পরিচয় এবং ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত ও তথ্যবহুল আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: এ অধ্যায়ের শিরোনাম **"আব্বাস আলী খানের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা"**। এতে তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই এর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে। যেমন: বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, মৃত্যু যবনিকার ওপারে, স্মৃতি সাগরের ঢেউ, ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব, ইসলামী বিপ্লব একটি পরিপূর্ণ নৈতিক বিপ্লব, একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ: তার থেকে বাচাঁর উপায়, মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস, মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান, ইসলামী আন্দোলন ও তার দাবী, ঈমানের দাবী, যুক্তরাজ্যে একুশ দিন এবং দেশের বাইরে পঞ্চাশ দিন।

উপসংহারে আমরা আমাদের সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের সার-সংক্ষেপ এবং গবেষণা লব্ধ উদ্ভাবিত বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। পরিশেষে আমার এ অভিসন্দর্ভের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

প্রথম অধ্যায়

আব্বাস আলী খানের সমসাময়িক বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

বাংলাদেশের ভৌগলিক পরিচিতি

বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা

প্রথম অধ্যায়

আব্বাস আলী খানের সমসাময়িক বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

আব্বাস আলী খান ছিলেন উনবিংশ শতাব্দির একজন শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, সু-সাহিত্যিক, লেখক, অনুবাদক ও যোগ্য সংগঠক।[১] বিশেষ করে তাঁর রাজনীতি ও দর্শন বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তৎপরবর্তীতে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে তাঁর বলিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এই প্রথিতযশা পণ্ডিত বৃটিশ শাসন, পাকিস্তান ও পরবর্তীতে বাংলাদেশের পরিবেশে (১৯১৪-১৯৯৯ খ্রী:) শিক্ষা, কর্মজীবন ও রাজনৈতিক জীবন অতিক্রম করেন। তাঁর সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য তাঁর সমসাময়িক সময়ের শিক্ষা-সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। এখন আমরা তাঁর সমসাময়িক বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রতি আলোকপাত করার প্রয়াসি হবো।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি

বাংলা বলতে মূলত এক বিশাল ভূখণ্ডকে বুঝায়। প্রথম দিকে এ ভূখণ্ডের মধ্যে অনেকগুলো ভৌগোলিক নামের অস্তিত্ব ছিল। ১৯৪৭ সালের পূর্বে বৃটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রদেশের ভূখণ্ডই বাংলা নামে পরিচিত ছিল। যা বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ। প্রায় আশি হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত নদী বিধৌত পলি দ্বারা গঠিত বিশাল সমভূমি এ বাংলা।[২] এর পূর্বে ত্রিপুরা, গারো ও লুসাই পর্বতমালা, উত্তরে শিলিং মালভূমি ও নেপাল তরাই অঞ্চল, পশ্চিমে রাজমহল ও ছোট নাগপুর পর্বতরাজীর উচ্চভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।[৩]

বাংলাদেশ ২৭°.৯" এবং ২০°.৫০" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৬°.৮৫" ও ৯২°.৩০" পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।[৪]

---

১. আব্দুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত, *আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ* (ঢাকা: সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ১৯৯৯ খ্রী:), পৃ: ২০৪।

২. ড. আব্দুর রহীম, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০১ খ্রী:), পৃ: ১৭।

৩. তদেব।

৪. রমেশ চন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), *হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা, ১৯৪৩ খ্রী:), পৃ: ১; S. Hossain, *Every day life in the pal Empaire* (Dhaka :Asiatic Socity of Pakestan, 1968 Ad), P.1; ড. এস. এম. রফিকুল ইসলাম, *সেনযুগে বাংলার সামাজিক জীবন* (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে P.H.D ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত ইতিহাস বিষয়ক গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৪ খ্রী:), পৃ: ১-২।

অধ্যাপক কে, আলী উল্লেখ করেন, প্রাচীন কালে বাংলা বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল।[৫] এগুলো বঙ্গ[৬], গৌড়[৭], সমতট[৮], হরিকেল[৯], পুণ্ড্র[১০], রাঢ়[১১] নামে অভিহিত ছিল। মুসলমানরাই সর্বপ্রথম বাংলার সব অঞ্চলকেই

---

৫. ড. এস. এম. রফিকুল ইসলাম, *সেনযুগে বাংলার সামাজিক জীবন*, পৃ: ২; রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ*, ১ম খণ্ড (কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, নবম সং, ১৯৯৮ খ্রী:), পৃ: ১; এ. কে. এম. রইস উদ্দিন খান, *বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ৮ম সং, ১৯৯৮ খ্রী:), পৃ: ২৩; ড. এ. কে. এম. মোহসিন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রী:) পৃ: ১।

৬. বঙ্গ : "বঙ্গ" এদেশের প্রাচীন একটি জনপদ। আর্যদের ঐতরেয় আরণ্যক পুরান, রামায়ন, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে "বঙ্গ" জনপদের উল্লেখ রয়েছে। এ বঙ্গ নাম থেকে বর্তমান বাংলা দেশের নামের উদ্ভব হয়েছে। সকল পন্ডিত একমত যে, বঙ্গ জনপদটি বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ নিয়ে গঠিত ছিল। সাধারণতঃ এর সীমা রেখা ছিল পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে গঙ্গা (পদ্মা), পূর্বে ব্রক্ষপুত্র ও মেঘনা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।
দ্রঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস প্রচীন যুগ*, পৃ: ৭; কে. এম. রইস উদ্দিন খান, *বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা*, পৃ: ৩৩; ড. নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব* (কলিকাতা: দে-জ পাবলিশিং, ২য় সং, ১৪০২ বাং সন), পৃ: ১১০-১১১; ড. এ. কে. এম. মোহসিন ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ*, পৃ: ২০; মাসুদ মজুমদার ও অন্যান্য, *বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস কেন্দ্র, ১৯৯৭ খ্রী:) পৃ: ২০৫; এস. এম. দোহা, *জিয়াউর রহমান ও জাতীয়তাবাদ* (ঢাকা: হিমি বুকস এণ্ড বুকস, ২০০২ খ্রী:), পৃ: ২৮; খান বাহাদুর আব্দুল হাকিম সম্পাদিত, *বাংলা বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৩ খ্রী:), পৃ: ২৮১; ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *বরেন্দ্র অঞ্চলে মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্য* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০২ খ্রী:), পৃ: ১১।

৭. গৌড় : একটি সুপ্রাচীন জনপদ। চম্পা গৌড়ের রাজধানী। শশাংক সর্বপ্রথম গৌড়ের সম্রাট হিসেবে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার দক্ষিণাংশ গৌড় নামে পরিচিত । পরবর্তীতে সমগ্র বাংলা গৌড় দেশ হিসেবে গণ্য হয় এবং মুসলিম যুগের শেষ পর্যায়ে গৌড় বলতে সমগ্র বাংলাদেশকেই বুঝাত।
দ্রঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ*, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯; ড. এ. কে. এম. মোহসিন ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ*, পৃ: ২২; ড. নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব*, পৃ: ১২১; ড. এস. এম. রফিকুল ইসলাম, *সেন যুগে বাংলার সামাজিক জীবন*, পৃ: ২১-২২।

৮. দক্ষিণ পূর্ব-বাংলার অপর একটি জনপদ সমতট। সর্বপ্রথম সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ড. মুমিন চৌধুরী বলেন, কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল নিয়ে "সমতট" গঠিত। তবে রমেশ চন্দ্র মজুমদার মনে করেন, সমতটের পশ্চিম সীমা একসময় চব্বিশ পরগনা পর্যন্ত বিস্তৃতি ছিল এবং গঙ্গা ভাগীরথীর পূর্ব তীর হতে আরম্ভ করে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রশায়ী অঞ্চল "সমতট" নামে অভিহিত হয়।
দ্রঃ ড. এস. এম. রফিকুল ইসলাম, *সেনযুগে বাংলার সামাজিক জীবন*, পৃ: ২৫-২৬; ড. এ. কে. এম. মোহসিন ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ*, পৃ: ২১; জি. এম. শফিকুল ইসলাম, *ইসলাম প্রচারে হযরত শাহ সুলতান বলখী (রঃ) এবং হযরত শাহ নিয়ামত উল্লাহ (রহঃ) এর অবদান* (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত এম. এ. থিসিস, ২০০০ খ্রী:), পৃ: ৮।

৯. বাংলাদেশের পূর্ব, দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তবর্তী চট্টগ্রাম অঞ্চলই ছিল "হরিকেল"। অনেক ঐতিহাসিক হরিকেলকে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় জনপদ বলে মনে করেন। এবং চট্টগ্রাম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল ছিল তখন প্রাচীন হরিকেল। ঐতিহাসিকগণ অবশ্যই চট্টগ্রাম অঞ্চলেই "হরিকেলের" আদি অবস্থিতির কথা বলেছেন। পরবর্তীতে হরিকেল রাজাদের শাসনামলে সমতট পর্যন্ত হরিকেল জনপদটি সম্প্রসারিত হয়।
দ্রঃ ড. রফিকুল ইসলাম, *সেনযুগে বাংলার সামাজিক জীবন*, পৃ: ২৭-২৮।

১০. পুণ্ড্র : একটি প্রাচীন জনপদ। পুণ্ড্র নামীয় জাতির ভিত্তিতে এ অঞ্চলের নাম "পুণ্ড্রবর্ধন" হয়েছে। পাল ও সেন আমলের লিপিমালায় গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে পুণ্ড্রবর্ধনের নাম বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। চীনা ভ্রমণকারী য়ুয়ানচুয়াং কজঙ্গলও করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগই "পুণ্ড্রর্ধন" এবং এই অঞ্চলের কেন্দ্রস্থল "পুণ্ড্রনগর" হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কালক্রমে পুণ্ড্রের বিস্তৃতি ঘটে এবং একসময় সমগ্র বাংলাদেশই পুণ্ড্রবর্ধন নামে অভিহিত হয়।
দ্রঃ ড. এ. কে. এম. মোহসিন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পৃ: ২১; ড. এস.এম. রফিকুল ইসলাম, *সেন যুগে বাংলার সামাজিক জীবন*, পৃ: ১৮-১৯; এ. কে. এম. রইস উদ্দিন খান, *বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা*, পৃ: ৩৫; ড. নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস, আদি পর্ব*, পৃ: ১১৫; রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন, মধ্য ও আদিযুগ*, পৃ: ১।

১১ রাঢ় : বাংলার একটি সুপরিচিত জনপদ। এ অঞ্চলটি জাতিবাচক "রাঢ়া শব্দ" হতে উৎপন্ন। নবম ও দশম শতাব্দী হতেই এ জনপদটি দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। যা উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় নামে পরিচিত। অজয় নদী উভয় রাঢ়কে বিভক্ত করেছে। বর্তমান ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী মুর্শিদাবাদ হতে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত রাঢ় জনপদটি বিস্তৃত ছিল।
দ্রঃ ড. এ. কে. এম. রইস উদ্দীন খান, *বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা*, পৃ: ৩৪; ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ*, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮, ড. এস. এম. রফিকুল ইসলাম, *সেন যুগে বাংলার সামাজিক জীবন*, পৃ: ২০-২১।

"বাঙ্গালাহ" নামে অভিহিত করে। ঐতিহাসিক আবুল ফজল উল্লেখ করেন বাঙ্গালার আসল নাম ছিল বঙ্গ। প্রাচীন কালের এখানকার রাজা বাদশারা ১০ গজ উঁচু ও ২০ গজ প্রস্থ প্রকাণ্ড বিশাল "বাঁধ" তৈরী করতেন। এ বাঁধ গুলোকে "আল" বলা হতো। আর বঙ্গ শব্দের সাথে "আল" যুক্ত হয়ে বাঙ্গাল বা বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি হয়েছে।[১২] পাল রাজাদের সময় বাংলা বলতে সমগ্র বাংলাকে বুঝান হতো। অবশ্য এ কথার স্বপক্ষে কোন যৌক্তিক প্রমান নেই। পাল ও সেনদের বঙ্গ বলতে বাংলার একটি ক্ষুদ্রাঞ্চলকে বুঝাত।[১৩] সেন রাজারা যদিও বাংলার একটি বৃহদাংশ শাসন করতেন, তবুও তারা নিজেদেরকে "গৌড়েশ্বর" (গৌড়ের রাজা) বলতে গর্ব অনুভব করতেন। এ থেকে বুঝা যায়, দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগেও "বাঙ্গালাহ" নামটি কেবলমাত্র বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এমনকি মুসলিম শাসনের প্রথম দিকেও বাংলার একমাত্র পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলই "বঙ্গ ও বাঙ্গালাহ" নামে পরিচিত ছিল।[১৪] ঐতিহাসিক মিনহাজ উদ্দীন সিরাজ এ অঞ্চলের কথা উল্লেখ করে বলেন, "তাঁর লক্ষণাবতীতে ভ্রমণ কাল পর্যন্ত (১২৪২-১২৪৪ খ্রী:) লক্ষণ সেনের বংশধরগণ তখন "বঙ্গে" তাদের শাসন বজায় রেখেছিল। মিনহাজ উদ্দীন পূর্ব-ভারতের ভৌগোলিক বিভাগ ও বিভিন্ন নামের সংগে খুবই পরিচিত ছিলেন এবং বঙ্গ বলতে তিনি বাংলার পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলকে মনে করতেন।[১৫] তিনি আরো বলেন, লক্ষণাবতী ও বিহারের বিভিন্ন অংশে বঙ্গ ও কামরূপ দেশের লোকেরা বখতিয়ার খলজির[১৬] ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিল। এ থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমানিত হয়, লক্ষণাবতী অঞ্চল থেকে বঙ্গ অঞ্চল ভিন্ন ছিল

---

১২. ড. এম. এ. রহীম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ খ্রী:), পৃ: ৩২; গোলাম হোসাইন সলিম, *রিয়াজ-উস-সালেহীন*, আকবর উদ্দিন (অনুদিত) *বাংলার ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম সংস্কার, ১৯৭৪ খ্রী:), পৃ: ১৬; সুধীর কুমার মিত্র. *হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ* (কলিকাতা: মিত্রানী প্রকাশন, ১৯৬২ খ্রী:), পৃ: ৬৫; আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ৩য় সংস্কারণ, ২০০২ খ্রী:), পৃ: ২৫; আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ খ্রী:), পৃ: ১।

১৩. ড. এম. এ. রহীম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ: ২।

১৪. তদেব।

১৫. তদেব।

১৬. **বখতিয়ার খলজি :** বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি। তিনি জাতিতে ছিলেন তুর্কী এবং বৃত্তিতে ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। বখতিয়ার ছিলেন আফগানিস্তানের গরমশির বা আধুনিক দশত-ই-মার্গের অধিবাসী। তাঁর বাল্যজীবন সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে মনে হয় দারিদ্রের পিড়নে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করে স্বীয় কর্মশক্তির উপর নির্ভর করে ভাগ্যান্বেষণে বের হন। তিনি ছিলেন খাট, হাত লম্বা ও কুৎসিৎ চেহারার অধিকারী। দিল্লির শাসন কর্তা কুতুবউদ্দীনের নিকট চাকুরীর জন্য যান। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়ে বাদাউনে যান এবং সেখানকার শাসন কর্তা হুসাম উদ্দীন ভাগবত ও ভিউলী নামক দুটি পরগনা প্রদান করেন। বখতিয়ার অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে হিন্দু রাজ্য আক্রমন ও লুণ্ঠন করতে থাকেন। তিনি নদীয়া, গৌড় জয় করেন এবং তার শেষ কার্য তিব্বত আক্রমন। অবশেষে বখতিয়ার দেবকোটে অবস্থান কালে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। বিপুল পরিমান সৈন্য ধ্বংস হওয়ার থেকে ও ব্যর্থতার গ্লানীতে তিনি ভেঙ্গেঁ পড়েন। শর্যাশায়ী অবস্থায় ১২০৬ খ্রী: তিনি মৃত্যুমুখী পতিত হন।
দ্র: ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ৭ম সং, ১৯৯৮ খ্রী:), পৃ: ১৩২-১৩৮।

এবং লক্ষণাবতী যেমন বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চল ছিল, তেমনি বঙ্গ অঞ্চল ও কামরুপ অঞ্চল পাশা-পাশি অবস্থিত ছিল।[১৭]

গিয়াস উদ্দিন বলবানের সময় থেকে "বাঙ্গালাহ্" নাম মুসলমানদের মধ্যে প্রচলন হয় এবং বাংলার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের জন্য সাধারণতঃ এ নাম ব্যবহৃত হয়। জিয়াউদ্দিন বারনী সর্বপ্রথম মুসলিম লেখক যিনি বাঙ্গালা নাম ব্যবহার এবং এর দ্বারা তিনি বাংলার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে বাংলা তখন কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এবং মুসলমানগণ এর ভিন্ন ভিন্ন নামে নামকরণ করেছিলেন। যেমন- আরসাই-বাঙ্গালাহ, ইকলিম-ই-বাঙ্গালাহ ও দিয়ার-ই-বাঙ্গালাহ। আরসাই বাঙ্গালাকে সাতগাঁও অঞ্চল (দক্ষিণ বঙ্গ), ইকলিম-ই-বাঙ্গালাকে সোনারগাও অঞ্চল (পূর্ব বঙ্গ) এবং দিয়ার-ই-বাঙ্গালাকে সংযুক্ত সোনারগাঁও ও সাতগাঁও অঞ্চল রূপে অভিহিত করা হয়। এ ভাবে চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গকে "বাঙ্গালাহ্" বলা হতো এবং এ অঞ্চলের অধিবাসীরা বাঙ্গালী নামে পরিচিত ছিল।[১৮]

পরবর্তীতে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী শব্দ দুটি এ অঞ্চলের সংগে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের লোকদের প্রতিও প্রযোজ্য হয়। সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের সময় থেকে এ নামের বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায় এবং সমগ্র বঙ্গদেশ "বাঙ্গালা" নামে পরিচিত হয়। অতপর তিনি স্বাধীন সুলতানী আমলের সূচনা করেন। তিনি এ যুক্ত অঞ্চলগুলিকে "বাঙ্গালা" এবং এর অধিবাসীদেরকে 'বাঙ্গালী' নামে অভিহিত করেন।[১৯] তিনি এক দিকে দিল্লি থেকে বাংলার স্বাধীনতা সংরক্ষণ করেন যা পরবর্তী দু'শত বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। অপরদিকে বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে একটি জাতিতে পরিণত করেন। তিনি এমন একটি নামে পরিচিত করেন যা ছিল সার্বজনীন এবং পরবর্তীতে সাতশত বছরব্যাপী এ নামে পরিচয় দিতে বাঙ্গালীরা গর্ব অনুভব করত। অন্যথায় এদেশের নাম হতে পারত গৌড়, সমতট, হরিকেল বা অন্যকিছু। জাতি হিসেবে হয়তো বাঙ্গালী না হয়ে গৌড়ী, সমতটী, হরিকেলী বা অন্য নামে পরিচিত হত। এর পরেও দুইবার বাংলার মানচিত্রে পরিবর্তন হয়েছে। সর্বশেষ ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ফলে আজকের এ স্বাধীন বাংলাদেশ নামক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটির জন্ম হয়।[২০]

মোট কথা গৌড়, বঙ্গ, পুন্ড্র, রাঢ়, বরেন্দ্র, সমতট, হরিকেল, গঙ্গাঁরিডি এ রকম ভিন্ন ভিন্ন জনপদই কালক্রমে অনেক ভূ-রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশ।[২১]

---

১৭. ড. এম. এ. রহীম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২।
১৮. তদেব, পৃঃ২-৩।
১৯. তদেব, পৃঃ ৩-৪।
২০. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, (সম্পাদিত), *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, ১ম খণ্ড, পৃঃ১।
২১. ড. এম. এ. রহীম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২।

বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

মানুষ স্বভাবগত ভাবে সামাজিক জীব। মানুষ হিসেবে নিজের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনের তাগিদে তাকে সমাজ বদ্ধ হয়ে বসবাস করতে হয়।[২২] একটি দেশ বা জনপদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সে দেশের রাজনৈতিক আধিপত্য ও দর্শনের সংগে ওতোপ্রতো ভাবে জড়িত। একটি সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোক বসবাস করে। বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ব্রাহ্মন্য, বৌদ্ধ ও ইসলামী সংস্কৃতি এবং সর্বশেষ পাশ্চত্য সংস্কৃতি দ্বারা পর্যায়ক্রমে প্রভাবিত হয়েছে।[২৩] সমাজ বিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারায় মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস গড়ে ওঠে। ফলে তারা কুলীন ও অকুলীন এই দু' শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কুলীন বলতে সৈয়দ, শেখ ('আরব), পাকিস্তান, তুর্কী ও মোঘলদের বুঝায়।[২৪] গরীবরা ছিল সাধারণতঃ অকুলীন। কুলীন মুসলমানরা অকুলীন মুসলমানদের চাইতে নিজেদেরকে সভ্য ও শিক্ষিত মনে করত।[২৫] এমনকি বিয়ে শাদী ইত্যাদি অনুষ্ঠানেও তারা এক সাথে ভোজন করত না।[২৬] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পাশ্চত্যের শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসার এবং অর্থনৈতিক কারণে সমাজ বিবর্তনের ধারা পরিবর্তন হওয়ায় কুলীন সমস্যার অনেকটা বিলুপ্তি ঘটে।[২৭] তবে বৃটিশ শাসনের প্রথম একশত বছরে মুসলমান সম্প্রদায় একটি গরীব মানুষের সমাজে পরিণত হয়। তারা সাধারণতঃ পাশ্চত্য শিক্ষা বর্জন করায় তাদের সমাজ থেকে অভিজাত ও উচ্চ শ্রেণীর প্রায় বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু বিংশ শতাব্দির গোড়া থেকে পাশ্চত্য শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং কিছু কিছু মুসলমান ইউরোপীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসে। ১৯২১ সালে বাংলা অঞ্চলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আরো কতিপয় কলেজ প্রতিষ্ঠার পর এ অঞ্চলে মুসলমানরা পাশ্চত্য শিক্ষা গ্রহণে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত হয়।[২৮] মাওলানা আকরাম খাঁ তৎকালীন সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করে তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, বাংলার মুসলিম সমাজের ইতিহাস জানতে হলে পাশাপাশি বঙ্গদেশের ও তার সমসাময়িক "হিন্দু"[২৯] অধিবাসীদের ইতিহাস জানতে হবে। শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক দিকে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বেশ রক্ষণশীল। বিজাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি তাদের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব থাকলেও

---

২২. ইব্‌ন খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা* (বৈরুতঃ দারুল কলম, ৪র্থ সং, ১৯৮১ খ্রীঃ), পৃঃ৩৫-৩৬।

২৩. ড. সিরাজুল হক (সম্পাঃ) *বাংলাদেশের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড (১৭০৪-১৯৭১) (ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রীঃ), পৃঃ১।

২৪. আব্দুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ রেখা* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮ খ্রীঃ), পৃঃ ৬৮।

২৫. তদেব, পৃঃ ৮৩।

২৬. তদেব।

২৭. তদেব, পৃঃ৮৪।

২৮. ড. মোহাম্মাদ ইন্নাস আলী, *বাংলার সমাজ ও রাজনীতি* (ঢাকাঃ কনফিডেন্ট পাবলিকেশন্স প্রাঃ লিঃ, ২০০০ খ্রীঃ),পৃঃ৩৮।

২৯. মুসলমানগণ বাংলায় আগমনের পর এদেশীয় বিভিন্ন ধর্মে কর্মে বিভক্ত জৈন, বৌদ্ধ শক্তি ও বৈদিক বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়কে তাঁরা হিন্দু নামে চিহ্নিত করে। রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন "মুসলমানরা ভারত অধিকারের সাথে বিজিত ভারত বাসীকে হিন্দু" নামে অভিহিত করে এবং এদেশের অধিবাসী সকলের ধর্মকে হিন্দু ধর্ম এই সাধারণ সঙ্গা প্রদান করে। দ্রঃ মাহামুদা খাতুন, *মুসলমানদের আগমনে বাংলার সামাজিক রূপান্তর একটি পর্যালোচনা*, গবেষণা পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, কলা অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭ খ্রীঃ পৃঃ ১৩১; ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ* (কলিকাতাঃ জেনারেল প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ১৩০; ড. এ. কে. এম. মোহসিন ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ*, পৃঃ১৪২।

শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাদের একটি অংশ ইংরেজী শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করে। ফলে সমাজে বড় ধরণের পরিবর্তনের সূচনা হয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমান বুদ্ধিজীবিগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।[৩০] বিশ শতকের শুরু থেকেই মুসলমান লেখক, সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদগণ আরবী ও ফার্সী ভাষার পাশা-পাশি ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের জন্য মুসলমানদের উৎসাহিত করেন।[৩১] মোস্তফা নূর-উল-ইসলাম তাঁর গ্রন্থে তৎকালীন সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করেন, শিক্ষিত সমাজে ইংরেজ অনুকরণে জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ কোর্ট, প্যান্ট, শার্ট ব্যবহার করা, ইংরেজী ফ্যাশনে কলার, নেকটাই পরিধান করা, হুক্কা-তামাক ছেড়ে সিগারেটের ধুমোদগার করা, আহারের সময় চেয়ার-টেবিল ব্যবহার করা, হাতের পরিবর্তে কাটা চামচ, ছুরি ব্যবহার করা, আচকান পায়জামার পরিবর্তে হিন্দুদের অনুকরণে ধুতি, টুপির পরিবর্তে নগ্ন মস্তক ইত্যাদি আধুনিক সভ্যতার নামে মুসলিম সমাজে তা অনুপ্রবেশ করতে থাকে ।[৩২] তবে এটি মুসলিম সমাজের সার্বিক চিত্র নয়। সমাজের গুটি কয়েক ব্যক্তি ও পরিবারে এ ধরণের চিত্র সাধারণত: দেখা যায়। কিন্তু বৃহত্তর মুসলিম সমাজ কোন সময় তাদের সনাতন সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়নি।[৩৩] ড. এম. এ. রহীম তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, "বাংলার মুসলমান সমাজের উন্নয়নে শায়খ, আলিম-'উলামা সম্প্রদায় তাদের ধর্ম প্রচার মূলক শিক্ষাগত ও মানব হিতৈষনামূলক কার্যাবলীর দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তাঁরা সমাজের উন্নয়ন সাধন করেছেন। জনসাধারণের মধ্যে তাদের তাওহীদি ধর্মমত জনপ্রিয় করে তুলেছেন এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারে সহায়তা দান করেছেন। তাঁরা মুসলমানদের সংহতির মনোভাব সৃষ্টিতে সাহায্য করেছেন এবং মুসলমানদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিভিত্তিক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছেন"।[৩৪] ফলে মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি ইসলামের ভাবধারায় গড়ে ওঠে। মানুষের আচার আচরণে, কথা-বার্তায়, চিন্তা-চেতনায় ইসলামী ভাবধারা বিরাজমান ছিল। রাজনৈতিক ভাবে মানুষের মধ্যে ভিন্নমত থাকলেও ইসলামের মৌলিক বিষয়ে তাদের মধ্যে ঐক্যের ব্যাপারে দ্বিমত ছিল না। মানুষের সামাজিক কর্মকাণ্ড ও সংস্কৃতি সেই সমাজের ঐতিহ্য ও ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এর ছাপ সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে দেখা যায়।[৩৫] তবে ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসনের অবসানের পর পূর্ব-বাংলায় (তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান) মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চত্য শিক্ষার প্রসার ঘটে এবং তারা সাধারণ ভাবে একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের সমাজে পরিণত হয়। এতদসত্ত্বেও মুসলিম সমাজ সব সময় তাদের

৩০. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস* (ঢাকা: আজাদ অফিস, ১৯৬৫ খ্রী:), পৃ: ৫৮-৫৯; কে. এম. মাহফুজুল করিম, *পীর মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার (রহ:)-এর ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদান* (চট্টগ্রাম: হোমল্যাণ্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৪ খ্রী:), পৃ:৭।

৩১. ড. সিরাজুল হক (সম্পা:), *বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড* (১৭০৪-১৯৭২) (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রী:), পৃ: ৭৩১।

৩২. মুস্তাফা নূর-উল-ইসলাম, *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ খ্রী:), পৃ:৭২।

৩৩. কে. এম. মাহফুজুল করিম, *পীর মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ:)-এর ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদান*, পৃ: ৮।

৩৪. ড. এম. এ. রহীম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ: ভূমিকা - ১।

৩৫. কে. এম. মাহফুজুল করিম, *পীর মাওলানা আবদুল জব্বার (রহ:)-এর ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদান*, পৃ: ৮।

ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যেবোধ বজায় রাখতে সক্ষম হয়।[৩৬] আবুল মনসুর আহমদ বলেন, 'বাঙ্গালী মুসলমানরা একটি সমৃদ্ধশালী ঐতিহাসিক কালচারের উত্তরাধিকারী প্রাচীন সভ্যজাতি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় বাঙ্গালী মুসলমানরা ধর্ম ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের বিশ্বাসে-ঈমানে, আচার-অনুষ্ঠানে, আদব-কায়দায়, জন্ম-মৃত্যুতে, বিয়ে-শাদীতে, আমোদ-প্রমোদে, খেলায়-ধূলায়, নাচে-গানে, ইনসাফ-আদালতে, আইন-কানুনে একটা ব্যাপক ও সামগ্রিক উদার ও উন্নত সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।[৩৭] ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর বাংলাদেশের সমাজ একটি সাধারণ মানুষের সমাজে পরিণত হয়। এতে উচ্চবিত্ত কিংবা অভিজাত শ্রেণী গড়ে ওঠেনি। বরং স্বাধীনতা সংগ্রাম কালে এই সমাজ চরম দেশ প্রেম, আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের বিরল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছিল।[৩৮] তবে এ সময় ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস করলে দেখা যায়, শতকরা ১৫ ভাগ মানুষের হাতে দেশের সম্পদের ৮৫ ভাগ, আর বাকী ৮৫ ভাগ মানুষের অধীনে রয়েছে ১৫ ভাগ সম্পদ। এ সময় দেশের মোট জনসংখ্যার ৫০ ভাগ মানুষ নিঃস্ব, চরম দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। দেশের বেশীর ভাগ মানুষ মৌলিক অধিকার শিক্ষা, খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান থেকে বঞ্চিত। এর ফলে সমাজের সর্বক্ষেত্রে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে, সমাজে নেমে আসে দুর্নীতি, অন্যায় ও অবিচার। পদে পদে লাঞ্চিত হয় মানবাধিকার।[৩৯] নব্বইয়ের দশকের শুরুতে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের এক নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচিত হয়। এ সময় বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো আরো সুদৃঢ় হয়। শিক্ষার প্রতি রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতা বৃদ্ধি পায়। ফলে শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটে। কিন্তু শিক্ষার প্রসারে ও গুণগত মানে সমাজের ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, তা সামাজিক কাঠামোতে প্রতিফলিত হয়।[৪০] বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষ মুসলমান। এ কারণে বিশ্বে এটি একটি মুসলিম দেশ হিসেবে পরিচিত। অবশিষ্ট ১৫ ভাগ মানুষ হিন্দু, খৃষ্টান ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় সকল ধর্মের লোকের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এটি এ অঞ্চলের মানুষের অতি প্রাচীন ইতিহাস।[৪১]

Rajshahi University Library
Documentation Section
Document No. D-2924
Date 28.4.08

৩৬. ড. ইন্নাস আলী, *বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, পৃ: ৩৮-৩৯।
৩৭. আবুল মনসুর আহমদ, *বাংলাদেশের কালচার* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ৩য় সং, ১৯৮৫ খ্রী:), পৃ: ২৬।
৩৮. তদেব, পৃ: ৭৭।
৩৯. তদেব, পৃ: ৯৮, ১০৬।
৪০. তদেব, পৃ: ১৩১-১৩২।
৪১. তদেব, পৃ: ১৩৬।

রাজনৈতিক আবস্থা

আব্বাস আলী খানের বর্নাঢ্য রাজনৈতিক জীবনালেখ্য, তাঁর সমাজচিন্তা আলোচনা করতে হলে তাঁর সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায় তাঁর সমসাময়িক কালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আমরা এখন সেই ইতিহাসের দিকে আলোকপাত করব।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন প্রেক্ষাপট ও রদ

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ঘটনা ইতিহাসের একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হবার পর তা তৎকালীন বাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। বৃটিশ সরকার তথা 'লর্ড কার্জন'[৪২] দৃশ্যত প্রশাসনিক সুবিধার্থে বাংলাকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৪৩] এতে বাংলার অবহেলিত ও নির্যাতিত মুসলমানরা পুলোকিত হলেও হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গকে এক গুরুতর জাতীয় বিপর্যয় হিসেবে গণ্য করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবি ও তাদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদ পত্রগুলো বঙ্গভঙ্গকে "বাঙ্গালী জাতিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র", "মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং বৃটিশদের Divide and rule policy ইত্যাদি ভাষায় অভিহিত করে।[৪৪]

তবে এ বিভক্তি একই জনপদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তার কারণ হিসেবে বলা যায় যে, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কৃপায় হিন্দুদের মধ্যে ধনী-বণিক সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটেছিল, তারা লাভ করেছিল বাণিজ্যের নেতৃত্ব, সরকারী চাকুরী ও জমিদারী। বৃটিশদের আনুকূল্য ও আশির্বাদে তারা শিক্ষায় দিক্ষায় অগ্রসর হয়। ফলে তাদের মধ্য থেকেই বুদ্ধিজীবি ও

---

৪২. লর্ড কার্জন এর পূর্ণ নাম জর্জ নাথানিয়েল কার্জন । ১৯৫৯ সালের ১১ জানুয়ারী তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম লর্ড স্কার্থডেল। হ্যাম্পশায়ারের উইক্রেনফোর্ড পাবলিক স্কুল এবং পরে ইইল স্কুল ও অক্সফোর্ডের ব্যালিওল কলেজে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। তিনি একজন রক্ষণশীল হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে তিনি ১৮৮৫-৮৬ সালে সাউথপোর্ট-এর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৮৯১-৯২ সালে তিনি ভারতের জন্য পার্লামেন্টারী আন্ডার সেক্রেটারী এবং পরে ১৮৯৩-৯৮ সাল পর্যন্ত "ফরেন আন্ডার সেক্রেটারী" হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। লর্ড কার্জন পরপর দুইবার ভারত সাম্রাজ্যের অধিকর্তা ছিলেন। তাঁর প্রথমবারের শাসন কালকে (১৮৯৯-১৯০৪) ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বর্নযুগ বলা হয়। লর্ড কার্জনের সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত পদক্ষেপ ছিল বঙ্গভঙ্গ। চির অবহেলিত বাংলার ভাগ্য উন্নয়নের নামে তিনি রাজ্যটিকে দু'ভাগে ভাগ করেন। কংগ্রেস একে "ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল" নীতি হিসেবে আখ্যা দেয়। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কেপে ওঠে। এ পরিস্থিতিতে ১৯০৫ সালে তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯২৫ সালে ২০ মার্চ লর্ড কার্জনের মৃত্যু হয়।
দ্রঃ সিরাজুল ইসলাম (সম্পাঃ), *বাংলা পিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, ২য় খণ্ড (ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রীঃ), পৃঃ ২৮৭-৮৮।

৪৩. ড. এম. এ. রহীম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পৃঃ ২০১; আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতহিাস*, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৪র্থ প্রকাশ, ২০০২ খ্রীঃ), পৃঃ ৩১৪।

৪৪. মুহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, *আমাদের মুক্তি সংগ্রাম* (ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ৩য় সং, ১৯৬৯ খ্রীঃ), পৃঃ ১৭৭।

কলিকাতা কেন্দ্রীক কায়েমী স্বার্থবাদী হিন্দু শোষক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়।[৪৫] তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে বৃটিশ সরকার বাধ্য ছিল। কারণ বহু বর্ণ হিন্দুর জমিদারী ছিল পূর্ব-বঙ্গে। কিন্তু তাদের বাসস্থান ছিল কলিকাতা। হিন্দু লেখক, গ্রন্থকার বা সাংবাদিক যারা আদিতে পূর্ব-বঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে কলিকাতা এসেছিল, তাদের পক্ষে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব ছিল না। এদের অনেকেরই নির্ভর করতে হতো সেখানকার পৈত্রিক সম্পত্তির উপর। কলিকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীদের নির্ভর করতে হতো পূর্ব-বঙ্গের মক্কেলদের উপর। সরকারী অফিস আদালতের কর্মচারীদের অধিকাংশ ছিল পূর্ব-বঙ্গের লোক। এ ছাড়াও উভয় বাংলাতেই বাঙ্গালী হিন্দুরা ছিল সংখ্যা লঘিষ্ট। কাজেই তারা চরম সংকটের মুখোমুখি হয়ে বৃটিশ পরিকল্পনা বঙ্গভঙ্গ বানচাল করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল।[৪৬] এ মতাবস্থায় বাঙ্গালী জাতি, বিশেষ করে জমিদার ও বুদ্ধিজীবিরা মুসলমানদের ওপর তাদের এতদিনকার প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হবে এবং আগের মত শোষন করতে পারবে না এ আশংকায় তারা শংকিত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে বাংলার মুসলমান ও নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের ফলে তাদের ভাগ্যন্নয়নের আশায় আশান্বিত হয়ে উঠে।[৪৭] লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বলেন, এ বিভক্তি দ্বারা পূর্বাঞ্চলের নিপীড়িত জনসাধারণের শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতি সরকার অধিকতর মনোযোগী হতে পারবে। এবং তারা ক্রমশ: পশ্চিমাঞ্চলের অধিক ভাগ্যবান ও উন্নত লোকদের সমতুল্য হতে পারবে। এতে ভবিষ্যতে বাংলা একটি সমৃদ্ধ প্রদেশে পরিণত হতে পারবে।[৪৮] মূলতঃ নতুন পূর্ব-বাংলা প্রদেশ গঠন পূর্বাঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের উন্নতি-অগ্রগতির এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। বঙ্গভঙ্গের ঘটনাটি একদিকে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ সুখ-স্বপ্নে উদ্বেলিত করে, অপরদিকে কায়েমী স্বার্থবাদী হিন্দুদের প্রতিহিংসা ও উন্নাসিকতা দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান রেখাকে আরো সম্প্রসারিত করে। যা পরবর্তীতে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট স্বাধীন পৃথক আবাসভূমির ভিত্তিমূলে শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করে।[৪৯] নবাব সলিমুল্লাহ[৫০] বলেন, "বঙ্গভঙ্গ আমাদের নিষ্ক্রিয় জীবন থেকে জাগিয়ে তুলেছে এবং সক্রিয় জীবন ও সংগ্রামের পথে ধাবিত করেছে। পুর্ব-বাংলার জনগণের বিশেষ করে মুসলমানদের

৪৫. মাসুদ মজুমদার (সম্পা:), *বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ*, পৃ: ১৯৩-৯৪।
৪৬. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, *বাংলাদেশ পরিক্রমা* (ঢাকা: ইউনিভার্সাল বুক এজেন্সী, ২০০৩ খ্রী:), পৃ: ৬০।
৪৭. মাসুদ মজুমদার (সম্পা:), *বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ*, পৃ: ১৯৩-৯৪।
৪৮. তদেব।
৪৯. তদেব।
৫০. **নবাব সলিমউল্লাহ: (১৮৭১-১৯১৫ খ্রী:)** পূর্ব-বঙ্গের প্রখ্যাত রাজনীতিবীদ, সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। ১৮৭১ সালে ঢাকার নওয়াব পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নওয়াব আব্দুল গনি এবং দাদার নাম নওয়াব খাজা আহসান উল্লাহ। সলিমুল্লাহ পূর্ব-বঙ্গের মুসলমানদের হাতে স্থানীয় শাসন-ক্ষমতা আনার উদ্দেশ্যে পূর্ব-বঙ্গ ও আসাম নিয়ে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের জন্য ব্রিটিশ পরিকল্পনা সহযোগী ও সমর্থক হিসেবে কাজ করেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ সেই পরিকল্পনারই ফসল। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের তিনি অন্যতম রূপকার। পূর্ব-বঙ্গ ও আসাম মুসলিম লীগের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পিছনে তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জমি দান করেন। তাছাড়া তিনি একাধিক মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ, স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইয়াতিম ছেলে মেয়েদের লালন-পালন ও শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে ঢাকায় একটি ইয়াতিম খানা গড়ে তোলেন। বর্তমান যা "সলিমুল্লাহ মুসলিম ইয়াতিম খানা" নামে পরিচিত। ১৯১৫ সালের ১৬ জানুয়ারী তিনি ৪৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।
দ্র: আব্দুল্লাহ আল-মুতি (সম্পা:), *শিশু বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ শিশু-একাডেমী, ১৯৯৭ খ্রী:), পৃ: ২৬২।

সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হউক হিন্দুগণ কোন দিনই আনন্দ চিত্তে তা গ্রহণ করতে পারেনি। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব-বাংলা প্রদেশ তাদের মধ্যে দারুণ ঈর্ষার উদ্রেক করে"।[৫১] অপর দিকে হিন্দুদের অন্যতম নেতা মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী বলেন, "নতুন প্রদেশে মুসলমানরা হবে সংখ্যাগুরু আর বাঙ্গালী হিন্দুরা হবে সংখ্যা লঘু। ফলে স্বদেশে আমরা হবো প্রবাসী"।[৫২] তিনি কখনো মুসলমানদেরকে বাঙ্গালী বলে স্বীকার করেননি। অন্যদিকে সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় বাংলাকে বিভক্ত করে হিন্দুদের অপমান ও অপদস্থ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন।[৫৩] এ দিকে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হবার দিনকে কংগ্রেস শোক দিবস হিসেবে পালন করে।[৫৪] অন্যদিকে কবি রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর[৫৫] সে দিন রাখী বন্ধন উৎসবের প্রচলন করেন।[৫৬] তাছাড়া তিনি বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসী" গানটি রচনা করেন।[৫৭] প্রকৃত পক্ষে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন মুসলিম বিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।[৫৮] পরবর্তীতে যখন ভারতবর্ষব্যাপী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে তখন বঙ্গভঙ্গের ফলশ্রুতিতে স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের আদলে আরো দুটি ধারার আন্দোলনের সূত্রপাত হয় যা বৃটিশ শাসকদের জন্য উদ্বেগের কারণ হিসেবে দেখা দেয়। বৃটিশ শাসন অবসানের ক্ষেত্রে এ দুটি আন্দোলন বিশেষ ভূমিকা পালন করলেও এর নেতৃত্বে যারা ছিল তারা প্রথম পাওনা হিসেবে বঙ্গভঙ্গ রদ প্রত্যাশা করেছিল। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ শাসকরা হিন্দুদের এ আন্দোলনের কাছে

---

৫১. ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, *বাংলাদেশ পরিক্রমা*, পৃঃ ৬০।

৫২. মাসুদ মজুমাদার (সম্পাঃ), *বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ*, পৃঃ ১৯৪।

৫৩. এম. এ. রহীম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পৃঃ ২০৫-৬।

৫৪. মুনতাসির মামুন সম্পাদিত, *বঙ্গভঙ্গ* (ঢাকাঃ সমাজ নিরক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮১ খ্রীঃ), পৃঃ ৫৬; আবুল আসাদ, *একশ বছরের রাজনীতি* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২য় সং, ২০০৫ খ্রীঃ), পৃঃ ৪৭; আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পৃঃ ৩১৫।

৫৫. **রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর** : ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভা, আধুনিক বাংলা ভাষার যিনি স্থপতি, বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, বাংলা ছোট গল্পের জনক ও আধুনিক নাটক ও নাট্যকলার জন্মদাতা এবং বাঙ্গালী জাতির সর্বোত্তম সঙ্গীত প্রতিভা ছিলো কবি রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ১৮৬১ খ্রীঃ ৭ মে কলিকাতা শহরে জোড়া সাঁকো অঞ্চলের ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা ছিলেন ধণাঢ্য জমিদার 'প্রিন্স দারকানাথ ঠাকুর'। তার পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতার নাম সরদা সুন্দরী দেবী। এই ঠাকুর পরিবারটি ছিল পিরালি ব্রাহ্মণ বংশ। তিনি ছিলেন স্ব-শিক্ষিত। স্কুল-কলেজে লেখা পড়া শিখিয়ে শিক্ষিত করার অনেক চেষ্টা তাঁর গুরুজনেরা করেছিলেন কিন্তু ধরাবাধা লেখা পড়ার দিকে কোন আগ্রহ তাঁর ছিল না। রবিন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার স্ফুরণ হয় বাল্যকাল থেকে মাত্র ৮ বছর বয়সে। ১৩ বছর বয়স থেকে তার কবিতা প্রকাশিত হওয়া শুরু করে। তার প্রথম রচনা ছিল বনফুল (১৮৮০ খ্রীঃ)। মাত্র ২২ বছর বয়সে ভবতারিনী দেবীর সংগে তাঁর বিবাহ হয়। তার গর্ভে ৫ জন ছেলে মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্য নোবেল পুরস্কার পান। অবশেষে ১৯৪১ সালের ৭ আগষ্ট দুপুর ১২ টা ১০ মিঃ ৮০ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

দ্রঃ আব্দুল্লাহ আল-মুতি (সম্পাঃ), *শিশু বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড (ঢাকাঃ বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৯৯৭), পৃঃ ২৫-৩১; সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, ৮ম খণ্ড (ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রীঃ), পৃঃ ৪৭৭।

৫৬. আবুল আসাদ, *একশ বছরের রাজনীতি*, পৃঃ ৪৭।

৫৭. তদেব।

৫৮. মাসুদ মজুমদার, *বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ*, পৃঃ ১৯৫; ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, *বাংলাদেশ পরিক্রমা*, পৃঃ ৬১।

নতিস্বীকার করে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করে।[৫৯] এতে হিন্দু সম্প্রদায় অত্যন্ত উল্লোসিত হয়। পক্ষান্তরে মুসলমানগণ ভীষন ভাবে মর্মাহত হন। মুসলমানগণের এ ক্ষোভকে প্রশমিত করার জন্য 'লর্ড হার্ডিঞ্জ'[৬০] ১৯১২ সালে ঢাকায় আসেন এবং ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেন।[৬১] এতে হিন্দু নেতৃবৃন্দ বিরোধিতা করে বলেন, এর ফলে বাঙ্গালী জাতি বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং এ থেকে বাংলার কৃষক মুসলমানরা উপকৃত হতে পারবে কিনা সে বিষয়ে আশংকা ব্যক্ত করেন।[৬২] পূর্ব-বাংলার মুসলমানদের যে কোন ধরণের কল্যাণের ব্যাপারে হিন্দুদের অসহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।[৬৩]

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হওয়ার ফলে হিন্দু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবি, কবি, সাহিত্যিক তাদের হিন্দু জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যেভাবে জেগে উঠেছিল এবং তাদের কর্ম-কাণ্ডে মুসলমানগণ বুঝে ফেলেছিল যে, হিন্দু সম্প্রদায় আর যাইহোক মুসলিম সমাজের উন্নতি, সমৃদ্ধি কখনই সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। তখন তারা নতুন করে ভাবতে শুরু করে এবং এরই ফলশ্রুতিতে ১৯০৬ সালে ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন আহুত হয়।[৬৪] এ. কে. ফজলুল হক[৬৫]-এর উৎসাহ উদ্দীপনায় এ সম্মেলনে ৮০০০ (আট হাজার) প্রতিনিধি যোগদান করেন। এ শিক্ষা সম্মেলনেই বাংলা তথা সারা ভারতের মুসলমানদের স্বার্থ

---

৫৯. তদেব।

৬০. লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪ খ্রী: পর্যন্ত ভারতের গর্ভনর জেনারেল ছিলেন। পেশাগত সৈনিক লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতের কার্যভার গ্রহণের পূর্বে ইংল্যাণ্ডের কয়েকটি উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। তিনি প্রথম শিখ যুদ্ধে (১৯৪৫-৪৬) জড়িয়ে পড়েন, লাহোর চুক্তির মাধ্যমে যার পরিসমাপ্তি ঘটে। শিখ যুদ্ধের সমাপ্তির পর হার্ডিঞ্জকে ভাইকাউন্ট করা হয়। ১৮৪৮ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং ব্রিটেনে উচ্চপদে নিযুক্ত হন। সেখানে প্রথমে তিনি সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্র-শস্ত্র বিভাগের প্রধান ও পরে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৫৬ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন।
দ্র: সিরাজুল ইসলাম (সম্পা:), *বাংলা পিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ,* ১০ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রী:), পৃ: ৪৫৬।

৬১. ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, *বাংলাদেশ পরিক্রমা,* পৃ: ৬১।

৬২. তদেব।

৬৩. তদেব।

৬৪. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতহিাস,* পৃ: ৩২৩।

৬৫. **এ. কে. ফজলুল হক:** এশিয়ার অবিসাংবাদিত মহান নেতা শের-ই-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর মোতাবেক ১২৮০ বঙ্গাব্দ ৯ ই কার্তিক দক্ষিণ পূর্ব। বর্তমান বরিশাল বিভাগের ঝালকাটি জেলার রাজাপুর থানার সাকুরিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মোহাম্মদ ওয়াজেদ (১৮৪৩-১৯০১) মাতার নাম বেগম সৈয়দুন্নেছা (মৃত ১৯২১)। চাখারে তাঁর বসতবাড়ী বর্তমান কাজী বাড়ী নামে পরিচিত। শৈশবে বাড়ীর নিকট বর্তী জুনিয়ার মাদ্রাসায় শিক্ষা জীবন শুরু করেন। ১৮৮১ সালে তিনি বরিশাল জিলা স্কুলে ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৮৮৬ সালে তিনি ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮৯ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে কৃতিত্ত্বের সাথে এফ. এ (বর্তমান আই. এ.) পাশ করে বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৯৪ সালে বি. এ. এবং ১৮৯৫ সালে গণিতে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাশ করেন। ১৮৯৬ সালে ঢাকার খানবাহাদুর সৈয়দ আহমদের মেয়ে খুরশিদ তালাত বেগমকে বিয়ে করেন। ১৯০০ সালে কলিকাতায় হাইকোর্টে আইন ব্যবসা দিয়ে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। তারপর ১৯০৩-১৯০৪ সালে বরিশালের রাজচন্দ্র কলেজে গণিত শাস্ত্রে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯১৫ সালে বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সালে তিনি খুলনা থেকে আইন সভায় এম. এল. সি. নির্বাচিত হন। ১৯৩৪ সালে কলিকাতা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র নির্বাচিত হন। ১৯৩৫ সালে তিনি মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রী সভায় পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ১১ আগষ্ট শপথ গ্রহণ করেন। অবশেষে ১৯৬২ সালের ১৭ এপ্রিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বাংলার বাঘ ফজলুল হক ইন্তিকাল করেন। জানাযা শেষে ৩৭ পুরাতন হাইকোর্ট এলাকায় হাজী শাহবাগ মসজিদের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।
দ্র: ড. বিজয় কিষ্ণ বনিক, *শের-ই-বাংলা একটি যাদুঘর* (ঢাকা: মা মণি প্রিন্টাস, ২০০২ খ্রী:), পৃ: ১৯-৪৮; আবুল্লাহ আল মুতি ও অন্যান্য (সম্পা:), *শিশু বিশ্বকোষ,* ৪র্থ খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৯৯৭ খ্রী:), পৃ: ২-৩।

সংরক্ষণের জন্য এবং জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ গঠিত হয়।[৬৬] মূলতঃ বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে হিন্দু বিদ্বেষ, ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল তাই মুসলিম লীগের জন্ম দিয়েছিল। বৃটিশ শাসনামলে (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রী:) এটি ছিল ভারতের মুসলমানদের পুরাতন রাজনৈতিক দল। ১৯৪৭ খ্রী: দেশ বিভাগের পর নিখিল ভারত মুসলিম লীগ থেকে পাকিস্তান মুসলিম লীগের জন্ম হয়।[৬৭] তখন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ[৬৮] পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৮ সালে মাওলানা আকরাম খাঁ[৬৯] কে সভাপতি এবং মোহন মিয়াকে সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ব-পাকিস্তানে মুসলিম লীগ গঠিত হয়। সভাপতির দায়িত্ব পেয়ে মাওলানা আকরাম খাঁ পূর্ব-পাকিস্তানে মুসলিম লীগকে সু-সংহত করেন।[৭০]

পাকিস্তান আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের শেষের দিকে (১৯৩৭-১৯৪৭ খ্রী:) মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। মুসলিম নেতৃবৃন্দ এ সময়ে মন্ত্রী সভাতেও গুরুত্বপূর্ণ আসনে সমাসীন

---

৬৬. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,* পৃ: ২২৪।

৬৭. ড. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশের রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন* (১৭৫৭-২০০০) (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন, ২০০১ খ্রী:), পৃ: ১৭৪।

৬৮. **মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ :** (১৮৭৬-১৯৪৮) ছিলেন একজন খ্যাতিমান আইনজীবি, রাজনীতিবীদ ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৭৬ সালে পাকিস্তানের রাজধানী করাচীতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৬ বছর বয়সে খ্রিষ্টান মিশনারী স্কুলে লেখা-পড়া শেষ করে তিনি বিলাত যান। লণ্ডনের লিঙ্কন্স-ইন থেকে বার,এ্যাট,ল ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরে বোম্বাই হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। বিলাতে থাকা কালে তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা দাদা ভাই নওরোজির রাজনৈতিক সচিব হিসেবে কাজ করেন। তখন ভারতের স্বাধীনতাই ছিল তাঁর রাজনীতির লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যে ১৯১২ সালে তিনি সর্বপ্রথম মুসলিম লীগের অধিবেশনে যোগ দেন। ১৯২০ সাল থেকে দীর্ঘদিন মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। ১৯২৮ সালে অন ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের অধিবেশনে ভারতীয় মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ও আইন সভায় আসন সংরক্ষণ এবং অখন্ড যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন সহ মুসলমান সমাজের স্বার্থে চৌদ্দদফা দাবী উপস্থাপন করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জিন্নাহ পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ সালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। রাজনৈতিক অঙ্গনে কর্মতৎপরতা ও নিষ্ঠার জন্য মহাত্মা গান্ধী তাঁকে কায়েদ-ই-আজম উপাধীতে ভূষিত করেন। পাকিস্তানে তিনি এই নামে পরিচিত।
দ্রঃ আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য, *শিশু বিশ্বকোষ,* ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৮।

৬৯ **মাওলানা আকরাম খাঁ :** (১৮৬৮-১৯৬৮) পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনার হাকিমপুর গ্রামে ১৮৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নাম আলহাজ্ব গাজী মাওলানা আব্দুল বারী ও মাতার নাম বেগম রাবেয়া খাতুন। শৈশবে গ্রামের মক্তবে শিক্ষা জীবন শুরু করেন। মাতা-পিতার নিকট কুর'আন শরীফ, বুস্তা ও গুলিস্তা অধ্যয়ন করেন। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি পিতার সাথে কলিকাতা ও পাটনায় প্রায় ৩ বছর কাটিয়ে হাকিমপুর প্রত্যাবর্তনের পর একই দিনে কলেরা রোগে পিতা-মাতাকে হারান। তারপর মাতামহের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করেন। ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি আশৈশব অনুরাগ বশতঃ ইংরেজী স্কুল ছেড়ে কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সংগে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করেন। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৫৪ সালে গণপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া হলে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে তিনি সরে দাড়ান। ১৯৬৮ খ্রী: ১৮ আগষ্ট তিনি ঢাকায় ইন্তিকাল করেন।
দ্রঃ আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য, *শিশু বিশ্বকোষ,* ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৭৬।

৭০. ড. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশের রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন* (১৭৫৭-২০০০), পৃ: ১৭৪।

হন। এ সময়ে বাংলায় চারটি মন্ত্রী সভার উল্লেখ পাওয়া যায়। ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রীসভা (১৯৩৭-১৯৪১ খ্রীঃ), ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রী সভা (১৯৪১-১৬৪৩ খ্রীঃ), সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রী সভা (১৯৪৬-১৯৪৭ খ্রীঃ) এবং নাজিমুদ্দীন মন্ত্রী সভা (১৯৪৩-১৯৪৫ খ্রীঃ)।[৭১] এ সকল নেতৃবৃন্দ উপমহাদেশের রাজনীতিতে দৃঢ় অবস্থান করে নিলেও মুসলমানদের স্বাধীন ভূখণ্ডের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা তীব্রভাবে অনুভব করতে থাকেন। ফলে পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনা বীজ বপন হয়। উপমহাদেশের মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির চিন্তা থেকে মূলতঃ পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনা। পাকিস্তান আন্দোলনের এ দাবী এক দিকে যেমন বৃটিশ সরকার মেনে নিতে পারেনি অপর দিকে হিন্দু নেতৃবৃন্দ শুধু মেনে নিতে অস্বীকার করেনি বরং সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বিরোধিতা করেছে। কারণ পাকিস্তান আন্দোলনের পিছনে আদর্শিক ও ইসলামী চেতনা সক্রিয় ও বলবৎ ছিল।[৭২] ১৯৪৩ সালে ২৩ মার্চ পাঞ্জাবের লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বাংলার মূখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) উপমহাদেশের স্বার্থ সম্বলিত একটি প্রস্তাব পেশ করেন। এ কাউন্সিলে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সভাপতিত্ব করেন। এ প্রস্তাবই ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব'[৭৩] বা পাকিস্তান প্রস্তাব নামে অভিহিত।[৭৪] উপমহাদেশে মুসলিম লীগের উত্থাপিত 'দ্বিজাতি তত্ত্বের'[৭৫] (Two Nation Theory) ভিত্তিতেই পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র

---

৭১. ড. আব্দুর রহীম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* পৃঃ ৪৯১-৫০০; কে. এম. মাহফুজুল করিম, *পীর মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার (রহঃ)-এর ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদান,*পৃঃ ৩।

৭২. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস,* পৃঃ ৪০৪।

৭৩. লাহোর প্রস্তাবে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবী জানানো হয়। জিন্নাহ বলেন, যে কোন সংগা অনুসারে ভারতীয় মুসলমানরা একটি জাতি এবং তাদের অবশ্যই একটি আবাসভূমি,ভূখণ্ড ও নিজস্ব রাষ্ট্র থাকতে হবে। এই প্রস্তাবে ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ এলাকা গুলিতে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবী ছিল। তাছাড়া আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন ও সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতির দাবীই ছিল এই প্রস্তাবের মূল ভিত্তি।
দ্রঃ ড. আব্দুর রহীম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* পৃঃ ৪৯৩; আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য, *শিশু বিশ্বকোষ,* ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৭; খানবাহাদুর আব্দুল হাকিম, *বাংলা বিশ্বকোষ* (ঢাকাঃ ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস, ১৯৭৬ খ্রীঃ), পৃঃ ৩৭০; সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব-বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা* (ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩ খ্রীঃ), পৃঃ ১০; ড. আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরুপ* (ঢাকাঃ অনন্যা,২০০৭ খ্রীঃ), পৃঃ ১১।

৭৪. ড. হারুন-অর-রশীদ, *বাংলাদেশের রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন* (১৭৫৭-২০০০), পৃঃ ১২৩ ।

৭৫. **দ্বীজাতি তত্ত্ব :** ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ফলাফল ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য এক সুদূরপ্রসারী দিক নির্দেশনা দেয়। এক দিকে যেমন দেখা যায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে অপর দিকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে হিন্দু সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। এ নির্বাচনের পর কংগ্রেস শাসিত প্রদেশ সমুহে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব নিয়ে মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, এর ফলে সমগ্র ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। যার ফলশ্রুতিতে মুসলিম নেতৃবৃন্দ দ্বিজাতির ভিত্তিতে দেশ বিভাগের প্রস্তাবনা পেশ করে যা দ্বিজাতী তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত দ্বিজাতি তত্ত্বের ব্যাখ্যায় জিন্নাহ বলেন, হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য গভীরে ও অমোচনীয় আমরা পৃথক জাতি আমাদের রয়েছে নিজস্ব স্বাতন্ত্র কৃষ্টি ও সভ্যতা, ভাষা ও সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্য, নাম ও নামকরণের পরিভাষা,প্রথা ও পঞ্জিকা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য,দৃষ্টিভঙ্গি ও আশা আকাঙ্খা।
দ্রঃ অধ্যাপক এস. এম. জয়নুল আবেদীন, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা (খ্রিষ্ট পূর্ব৬০০ থেকে ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ)* (ঢাকাঃ আলেয়া বুক ডিপো, ২০০৭ খ্রীঃ),পৃঃ ১৭৭; ড. আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের রাজনীতির স্বরূপ,* পৃঃ ১৫-১৬।

প্রতিষ্ঠার দাবী উত্থাপন করা হয়।[৭৬] যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগষ্ট ভারত বৃটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।[৭৭] স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু ছিল। এ সময় থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নিজস্ব আদর্শ নিয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।[৭৮] নিম্নে এ দলগুলোর কর্মকাণ্ডের একটি খন্ড চিত্র তুলে ধরা হলো:

আওয়ামী লীগ গঠনের প্রেক্ষাপট

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার কে. এস. দাস লেনের রোজ গার্ডেনে এক রাজনৈতিক সম্মেলনে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়।[৭৯] মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী[৮০] (১৮৮০-১৯৭৬) ছিলেন এ দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। এটি মুসলিম লীগের বিপরীতে নতুন রাজনৈতিক দল হিসেবে আবির্ভূত হয়।[৮১]

---

৭৬. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পৃ: ৪১৬।

৭৭. কে. এম. মাহফুজুল করিম, *পীর মাওলানা আব্দুল জব্বার (রহ:)-এর ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদান*, পৃ: ৩।

৭৮. তদেব।

৭৯. আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য, *শিশু বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৯৯৫ খ্রী:), পৃ: ৭৯; ড. মোহাম্মদ ইন্নাস আলী, *বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, পৃ: ৬০; সাঈদ-উর-রাহমান, *পূর্ব-বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা*, পৃ: ১৭; ড. হারুন-আর-রশিদ, *বাংলাদেশের রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন* (১৭৫৭-২০০০ খ্রী:), পৃ: ১৭৪।

৮০. **মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬)** : ছিলেন মানব দরদী একজন জননেতা। তার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ খান। আসামের ধুবড়ি জেলার ভাসানচরে বাঙ্গালী কৃষকদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করার সময় সেখানকার কৃষক সমাজ তাঁকে "ভাসানীর মাওলানা" বলে ডাকতে শুরু করলে তিনি ভাসানী নামে পরিচিত হয়ে উঠেন। সিরাজগঞ্জের ধানগড়া গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে ১৮৮০ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী শরাফত আলী খান। অল্প বয়সে পিতা ও মাতার মৃত্যু হলে ইব্রাহীম খান নামে তাঁর এক চাচার আশ্রয় থেকে মাদ্রাসায় পড়া লেখা করেন। মাদ্রাসা শিক্ষা শেষে টাঙ্গাঈল জেলার কাগমারীর এক প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ২২ বছর বয়সে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগদানের মধ্য দিয়ে ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। ১৯১৯ সালে তিনি ভারতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। এ সময় অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের অপরাধে দশমাস কারাভোগ করেন। ১৯২৪ সালে জমিদারদের বিপক্ষে অবস্থান নেয়ায় তাঁকে দেশ ছেড়ে আসামে পাড়ি জমাতে হয়। ১৯৩০ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৩৫ সালে আসামের স্থানীয় লোকেরা আসাম থেকে "বাঙ্গাল খেদা" আন্দোলনের ডাক দিলে তিনি এর বিরুদ্ধে পাল্টা আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি দেশে ফিরে এসে টাঙ্গাঈলের কাগমারিতে বসবাস শুরু করেন। পূর্ব-বাংলার ওপর মুসলিম লীগ সরকারের জোর জুলুম, শোষন দেখে তিনি ১৯৪৮ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনে যোগদানের কারণে তিনি গ্রেফতার হন। ১৯৫৪ এর নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠন করে ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করেন। পরবর্তীতে আওয়অমী লীগ নেতাদের সাথে তাঁর মতবিরোধ হলে তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ পার্টি গঠন করেন। ১৯৭১ সালে পাক-বাহিনীর অত্যাচারে তিনি ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ পর্বে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ আন্দোলন ছিল "ফারাক্কা মার্চ"। ভারতের ফারাক্কা বাঁধ নির্মানের বিরুদ্ধে তিনি এই পদ-যাত্রা মিছিলের ডাক দেন। ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর ৯৬ বছর বয়ছে তিনি ইন্তিকাল করেন। দেশের মানুষের নিকট মজলুম জননেতা হিসেবে তিনি পরিচিত হয়ে আছেন।

দ্র: আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য, *শিশুবিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৪০-২৪২ ।

৮১. ড. হারুন অর-রশিদ, *বাংলাদেশের রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রীক উন্নয়ন* (১৭৫৭-২০০০), পৃ: ১৭৬; ড. ইন্নাস আলী, *বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, পৃ:৬১।

পরবর্তী পর্যায়ে অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 'হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী'[৮২] দলের অন্যতম প্রধান নেতা হিসেবে যোগ দান করেন। দলটির সাংগঠনিক কাঠামো মজবুত ও সাধারণ মানুষের নিকট জনপ্রিয় করে গড়ে তুলতে মাওলানা ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে 'শেখ মুজিবর রহমান'[৮৩] প্রমূখ তরুণ রাজনীতিবিদ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকলের কাছে দলটির অধিক গ্রহণযোগ্য করার জন্য ১৯৫৫ খ্রীঃ ২১ থেকে ২৩ অক্টোবর ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত দলের তৃতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী মুসলিম লীগ এর 'মুসলিম' শব্দটি বিলুপ্ত করে পুরোপুরি ধর্ম নিরপেক্ষ দলে পরিণত করা হয়। ফলে ধর্মনিরপেক্ষ এই নতুন দলটি 'আওয়ামী লীগ' নামে

---

৮২. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী : (১৮৯২-১৯৬৩) একজন খ্যাতিমান আইনজীবি ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। ১৮৯২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর কলিকাতা মহানগরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম স্যার জোহাদুর রহীম জাহিদ। সোহরাওয়ার্দীর পিতা ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি, মাতা খুজিস্তা আখতার বানু ছিলেন একজন বিদুষী মহিলা। সোহরাওয়ার্দী কলিকাতা মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। ১৯২০ সালে দেশে ফিরে এসে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯২১ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন । ১৯২৩ সালে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটলে তিনি দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন পালের সহযোগিতায় ব্যাঙ্গল প্যাক্ট নামে হিন্দু মুসলিম চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে কাজ করেন। ১৯৩৬ সালে মুসলিম লীগে যোগদানের পূর্বে তিনি কলিকাতার প্রথম মুসলমান ডিপুটি মেয়র ছিলেন। ১৯৩৭ সালে নির্বাচনে তিনি কলিকাতার দুইটি আসন থেকে নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ সালে খাজা নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রী সভায় তিনি খাদ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৬ সালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ সমূহের সাধারণ নির্বাচনের পর তিনি মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানে ফিরে এসে মাওলানা ভাসানীর দলে যোগ দিয়ে ১৯৫৪ এর নির্বাচনে যুক্ত ফ্রন্টের বিজয়ের জন্য তিনি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়। এ বছরই তিনি পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৬০ সালে সরকার ছয় বছরের জন্য তাঁর রাজনীতি নিবিদ্ধ করেন এবং ১৯৬২ সালে ৩০ জানুয়ারী রাষ্ট্রদ্রোহীর অভিযোগে গ্রেফতার হন। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিতি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে ১৯৬৩ সালে ৫ ডিসেম্বর তিনি ইন্তিকাল করেন।

দ্রঃ আব্দুলাহ আল-মুতি ও অন্যান্য, *শিশু বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড (ঢাকাঃ বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৯৯৭ খ্রীঃ), পৃঃ ৩৪০-৩৪১।

৮৩. শেখ মুজিবর রহমান ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালে ১৭ মার্চ রোজ মঙ্গলবার রাত ৮ টায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম ছিল খোকা। পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান। তিনি একজন শেরেস্তাদার ছিলেন। মাতার নাম বেগম সাহেরা। শৈশবে তিনি নিজ এলাকায় ১৯৪২ সালে হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৪ সালে কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে আই, এ, পাশ করেন। ১৯৪৬ সালে বিশ্বযুদ্ধের কারণে বি,এ পাশ করতে পারেননি। ১৯৪৭ সালে তিনি বি. এ. পাশ করেন এবং কলিকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৭ সালে তাঁর রাজনীতিতে হাতে খড়ি হয়। বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রামের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য তিনি কয়েকবার গ্রেফতার হন। ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তিনি প্রথমে প্রধানমন্ত্রী এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়ক হন। ১৯৭৫ সালে ১৫ আগষ্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তিনি স্ব-পরিবারে নিহত হন।

দ্রঃ মেজর রফিকুল ইসলাম (পি.এস. সি.), *শেখ মুজিব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম* (ঢাকাঃ কাকুলী প্রকাশনী, ১৯৯৬ খ্রীঃ), পৃঃ ৯; সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বঙ্গবন্ধুঃ নেতা ও নেতৃত্ব* (ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০ খ্রীঃ), পৃঃ ৬৬৩; মোঃ শফিকুর রহমান, *জাতীয় রাজনীতি-শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু* (ঢাকাঃ বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ১৯৯৯ খ্রীঃ), পৃঃ ১৮৫; খালেদা এদিব চৌধুরী, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এক সমুদ্র জীবন* (ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯ খ্রীঃ), পৃঃ ১৬।

পরিচিতি লাভ করে।[৮৪] পাকিস্তানের উভয় অংশে এই দলের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-১৯৭১) পূর্ব-বাংলার অধিকার আদায়ের গণতান্ত্রিক আন্দোলন সমূহে আওয়ামী লীগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে পূর্ব-পাকিস্তানে দলটি ব্যাপক জন সমর্থন লাভে সামর্থ হয়। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক বিধান সভার নির্বাচনে শ্রমিক পার্টি, আওয়ামী লীগ এবং নেজামে ইসলাম পার্টির সম্মিলিত যুক্তফ্রন্ট বিজয় লাভ করে। এই বিজয়ের পিছনে আওয়ামী লীগের ভূমিকা ছিল প্রধান।[৮৫] পরবর্তীতে পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণ-স্বায়ত্ব শাসনের দাবীতে এ দলটি ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে এবং এ উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী দলের পক্ষ থেকে ঐতিহাসিক ছয় দফা[৮৬] দাবী পেশ করা হয়। যার ফলে দলটি পাকিস্তানের সামরিক শাসনের কোপানলে পড়ে। এ সময় দলের নেতা-কর্মীদের উপর সামরিক যান্তা ব্যাপক নির্যাতন পরিচালনা করে। ফলশ্রুতিতে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরংকুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে সক্ষম হয়।[৮৭] কিন্তু ১৯৭১ সালের ১ মার্চ পাকিস্তানের তৎকালীন

---

৮৪. ড. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশের রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন* (১৭৫৭-২০০০), পৃ: ১৭৬; ড. এমাজ উদ্দীন আহমদ, *রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কথা* (ঢাকা: বাংলা দেশ বুক কর্পোরেশন লি: পুনর্মুদ্রণ, ২০০৩ খ্রী:), পৃ: ৭৫১; ড. ইন্নাস আলী, *বাংলার সমাজ ও রজনীতি*, পৃ. ৬১।

৮৫. আব্দুল্লাহ্ আল-মুতি ও অন্যান্য, *শিশু বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড*, পৃ: ৭৯।

৮৬. ছয়টি দফা নিম্নরুপ:

ক. পাকিস্তানের সরকার হবে যুক্তরাষ্ট্রের ও সংসদীয়। কেন্দ্রীয় আইন সভার এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ইউনিটগুলোর আইন সভার নির্বাচন হবে প্রত্যক্ষ এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং কেন্দ্রীয় আইন সভার প্রতিনিধি হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে।

খ. যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হাতে থাকবে কেবলমাত্র দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রীয় বিষয় এবং তৃতীয় দফায় বর্ণিত শর্তাধীনে মুদ্রা।

গ. দেশের দুটি অংশের জন্য দুটি পৃথক এবং সহজ বিনিয়োগ যোগ্য মুদ্রা থাকবে অথবা ফিডারেল রিজার্ভ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রনে দু'অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। এই ব্যাংক গুলো এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সম্পদ হস্তান্তর এবং মূলধন পাচার বন্ধ থাকবে।

ঘ. রাজস্ব সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব এবং কর ধার্যের ক্ষমতা অংগরাজ্য গুলোর হাতে থাকবে। দেশ রক্ষা ও পররাষ্ট্র দফতর পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়া হবে। সংবিধানে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে নির্ধারিত হারে উক্ত রাজস্ব আদায়ের সাথে সাথে স্বয়ংক্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের তহবীলে জমা হবে। করনীতির ওপর অংগরাজ্য গুলোর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের প্রয়োজন মিটাবার নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা সংবিধানে থাকবে।

ঙ. যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত অংগরাজ্য গুলোর নিয়ন্ত্রণে প্রত্যেকটি ইউনিটের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পৃথক হিসাব রক্ষার শাসনতান্ত্রিক বিধান থাকবে। শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী ধার্য হারের ভিত্তিতে অংগরাজ্য গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মিটাবে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পররাষ্ট্র নীতির কাঠমোর মধ্যে আঞ্চলিক সরকার গুলোকে বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা এবং চুক্তির ক্ষমতা সংবিধানে দেয়া হবে।

চ. কার্যকর ভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার অংশ গ্রহণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অংগরাজ্য গুলোকে প্যারামিলিশিয়া বা আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দেয়া হবে।

দ্র: ড. এমাজ উদ্দীন আহমদ, *রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কথা*, পৃ: ৭৩৬-৭৩৭; ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, *বাংলাদেশ পরিক্রমা*, পৃ: ৮০-৮১।

৮৭. আব্দুল্লাহ্ আল-মুতি ও অন্যান্য, *শিশু বিশ্বকোষ, ১ম খন্ড*, পৃ: ৭৯; ড. এমাজ উদ্দীন আহমদ, *রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কথা*, পৃ: ৭৪২।

প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান[৮৮] ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মূলতবী ঘোষনা করলে এ দলের প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের আহবানে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ফলে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের উপর আক্রমন চালালে ২৬ মার্চ থেকে দেশকে শত্রু মুক্ত করার জন্য সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।[৮৯] ঐ রাতে শেখ মুজিবর রহমানকে বন্দী করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে পাক-বাহিনীর ব্যাপক গণহত্যা চলতে থাকে। যার কারণে ১৯৭১ সালে ১৭ এপ্রিল শেখ মুজিবর রহমানকে রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে[৯০] প্রধানমন্ত্রী করে 'মুজিব নগরে'[৯১] অস্থায়ী

---

৮৮. পাকিস্তানের সামরিক শাসক ও এক কালের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। তিনি ১৯১৭ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী পেশোয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বি. এ. পাশ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান পদে উন্নীত হন। ১৯৭৯ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তাঁর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন। ক্ষমতা প্রাপ্তির পর তিনি সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ তাঁরই নির্দেশে পাক-বাহিনী ঢাকায় ব্যাপক গণহত্যার পরিকল্পনা করে। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পাক-বাহিনীর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। অবশেষে ১৯৮০ সালের ১৪ আগষ্ট তিনি ইন্তিকাল করেন।
দ্র: অব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য, *শিশু বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৩৫।

৮৯ তদেব, পৃ: ৭৯।

৯০ তাজউদ্দীন আহমদ (১৯২৫-১৯৭৫) ছিলেন এক জন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গঠিত মুজিব নগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী। ১৯২৫ সালে তিনি গাজীপুর জেলায় কাপাসিয়া উপজেলার দরদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে তিনি সম্মানসহ এম, এ, পাশ করেন। ছাত্র জীবন থেকে তিনি সক্রিয় ভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৪৮ সালে পুর্ব-বাংলা ছাত্রলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উভয় কমিটির তিনি সদস্য ছিলেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন নিয়ে তিনি প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এ বছরই মে মাসে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ৯২-ক ধারা জারি করলে তিনি গ্রেফতার হন এবং ১৯৫৯ সালে মুক্তি পান। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশ নিয়ে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাক-বাহিনীর আক্রমনের মুখে তিনি ভারতে চলে যান এবং এ বছরই ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী মুজিব নগরে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারী তিনি প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং অর্থ ও পরিকল্পনা এবং রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রীর দায়িত্ব নেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তাজউদ্দীন গ্রেফতার হন এবং ৩ নভেম্বর তিনি এবং তাঁর অপর তিন রাজনৈতিক সহযোগির সাথে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটকাবস্থায় নিহত হন।
দ্র: আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য, *শিশু বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৯৯৭ খ্রী:),পৃ: ৭৩-৭৫।

৯১. মুজিব নগর বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময়ের একটি ঐতিহাসিক স্থান। বস্তুত: পক্ষে এটি "নগর" নয় বরং একটি গ্রাম। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচলনার জন্য এখানে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের এক ঘোষনার মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পাকিস্তান কারাগারে বন্দী শেখ মুজিবর রহমানকে অনুপস্থিত রেখেই নতুন সরকার প্রধান ঘোষনা করে এবং সে দিন এই অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়েছিল। ইতোপূর্বে মুজিব নগরেই ১০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীনতা ঘোষনা করে বলা হয় যে, এই ভূখণ্ড ২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল থেকে স্বাধীন হয়ে গেছে। এ গ্রামের নাম মূলত: ভবের পাড়া। এটি কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথ তলা ইউনিয়নের অনন্তর্গত। মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে এ গ্রামটি মুজিব নগর নামে অবহিত হয়ে আসছে।
দ্র: আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য, *শিশু বিশ্বকোষ*, ৪ খণ্ড, পৃ: ৩৪২-৩৪৩।

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়।[৯২] এই সরকারের নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস 'মুক্তিযুদ্ধের'[৯৩] পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' নামে একটি নতুন দেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে।[৯৪] এ সময় আওয়ামী লীগ সদ্য স্বাধীন দেশটির শাসন ভার গ্রহণ করে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠন করে।[৯৫] এ সময় জাতীয়তাবাদ[৯৬], সমাজতন্ত্র[৯৭], গণতন্ত্র[৯৮] ও ধর্মনিরপেক্ষতা[৯৯] এই চার

---

৯২. আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য, *শিশু বিশ্বকোষ*, ১ম খন্ড, পৃ: ৭৯।

৯৩. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে গৌরবোজ্জল অধ্যায়। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে হঠাৎ করে পাকিস্তানী সৈন্যরা ট্যাংক, কামান, রকেট, ভারী রাইফেল নিয়ে বাঙ্গালীদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং সারা দেশেই তারা একই সংগে এ অক্রমন পরিচালনা করে। প্রথম আক্রমনেই হাজার হাজার বাঙালী শহীদ হন। আক্রমন হঠাৎ হওয়ায় হতবুদ্ধি বাঙালী প্রথমে সাফল্যের সংগে প্রতিরোধ করতে না পারলেও পুলিশ ও তৎকালীন ই. পি. আর. এর সদস্যরা বীরত্বের সংগে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য ১৯৭১ সালে ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের ভবের পাড়া গ্রামে বর্তমান মুজিব নগরে অস্থায়ী ভাবে প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। সাথে সাথে জি. এ. উসমানীকে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ঘোষনা করা হয়। এ যুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীর লোকজন পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নেয়। জনগণের পাশা-পাশি ভারতও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর সরাসরি ভারত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। মুক্তি বাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমনের সাথে জনগণের সহযোগিতা যুক্ত হলে হানাদার বাহিনীর পরাজয় অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমার্পণের মাধ্যমে অপমানজনক পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়।
দ্র: আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য, *শিশু বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১০৫-১০৭।

৯৪. আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য, *শিশু বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭৯।

৯৫. তদেব।

৯৬. J. H.Hayes এর মতে 'Nationalism consists of modern emotional fusion and exggeration of two vere cold phenomena nationality and patriotism.' মোট কথা জাতীয়তাবাদ হলো এক নির্দিষ্ট জনসমষ্টির জাতিগত চেতনা। এই চেতনার সুনির্দিষ্ট কোন উৎস নেই এবং এর বিকাশেরও নেই কোন ধরা-বাধা-নিয়ম কিংবা সূত্র। কখনো এর ভিত্তি হতে পারে একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখার ভিতরে বসবাসকারী একটি অভিন্ন ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠি, কখনো অভিন্ন ধর্মবোধ বা ধর্মীয় পরিচিতি, কখনো অভিন্ন সাংস্কৃতিক বা নৃতাত্ত্বিক উৎস। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার সংঘাতে জাতীয়তাবাদের সূচনা হলেও বর্তমানে জাতীয়তাবাদের জনক ইটালীর দেশ প্রেমীক নেতা জুসেপ্প মাৎসিনিক।
দ্র: আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য, *শিশু বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৪; ডক্টর হাসান মোহম্মদ, *জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ* (চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র, ২০০১ খ্রী:), পৃ: ১৩।

৯৭. সমাজতন্ত্র শব্দটি ইংরেজী Socialism শব্দের পরিভাষা হিসেবে বাংলায় চালু রয়েছে। সমাজতন্ত্র হলো সমাজ, শ্রেণী, রাষ্ট্র ইত্যাদি বিষয়ে এক আদর্শগত ধারণা। উনিশ শতকের আগে এর জন্ম। সংক্ষেপে "সমাজতন্ত্র" অর্থ এমন এক সমাজ ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদন ও বন্টন হবে যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে এবং সাম্যবাদে যাওয়ার প্রথম ধাপ হচ্ছে সমাজতন্ত্র।
দ্র: আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য, *শিশু বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৯৯৭খ্রী:), পৃ: ২৫৪-২৫৫।

৯৮. গণতন্ত্রের সংগা: The rule of people by the people for the people, 'গণতন্ত্র' ইংরেজী Democracy শব্দের বাংলা। এর অর্থ জনগণের শাসন। গণতন্ত্র হলো সমাজ দর্শন ও রাষ্ট্রীয় দর্শনের একটি ধারণা। কিন্তু এ জাতীয় অন্য অনেক ধরণার মতো এটি তত্ত্ব মাত্র নয় বরং মানব সভ্যতায় দীর্ঘকাল যাবৎ এর প্রয়োগ চলে আসছে। গ্রীক নগর রাষ্ট্র গুলোতে সর্বপ্রথম গণতন্ত্রের উন্মেষ ঘটে। রোমক প্রজাতন্ত্রে দেশ শাসনে জনপ্রতিনিধির নীতি চালু ছিল। পিউরিট্যান আন্দোলন, মার্কিন স্বাধীনতা আন্দোলন ও ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে আধুনিক গণতন্ত্রের প্রসার ঘটে।
দ্র: আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য, *শিশু বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬৪; Muhammad kamaruzzaman, *Islam and democracy* (Dhaka: Al-Falah printing press, 2005), P.3.

৯৯. সংবিধানে গৃহীত ধারা বলে যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধীনে অপরের ধর্ম মতে কোন ধরণের বাধার সৃষ্টি না করে ধর্ম, বর্ণ গোত্র ও জাতি নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক তাদের স্ব-স্ব ধর্ম পালন করার অধিকার ভোগ করে থাকেন। তেমন ব্যবস্থা সম্পন্ন রাষ্ট্রকেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে। Secular থেকে Secularism শব্দের উৎপত্তি। যার অর্থ শিক্ষা ব্যবস্থাদি ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত ও পৃথক।
দ্র: খান বাহাদুর আব্দুল হাকিম, *বাংলা বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৩ খ্রী:), পৃ: ৩; আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য, *শিশু বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫২-৫৩।

মূলনীতির উপর ভিত্তি করে দেশের প্রথম রাষ্ট্রীয় সংবিধান প্রণীত হয়।[১০০] কিন্তু ১৯৭৫ সালের ২৪ জানুয়ারী তৎকালীন সরকার সংবিধান সংশোধন করে রাষ্ট্রপতি শাসিত একদলীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং নিজ দলসহ দেশের অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দলের বিলুপ্ত ঘোষনা করে একক রাজনৈতিক দল বাকশাল[১০১] গঠন করে। এ সময় দেশের সকল সংবাদ পত্র বিলোপ করে মাত্র চারটি সংবাদ পত্র বহাল রাখা হয়। একদলীয় শাসন ব্যবস্থা, ব্যাপক দুর্নীতি, সন্ত্রাস, অব্যবস্থাপনা প্রভৃতির ফলে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল 'জাসদ' নামে একটি নতুন দল গঠিত হয়।[১০২] সাথে সাথে অন্যান্য বামপন্থী দল গুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ অরাজকতার মুহূর্তে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান স্ব-পরিবারে নিহত হলে দেশে সামরিক শাসন জারি করা হয় এবং খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয়।[১০৩] মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান[১০৪] সামরিক শাসনকালে গণমূখী কর্মসূচী হাতে নিলে তিনি ব্যাপক জনসমর্থন লাভে সামর্থ হন।

---

১০০. আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য, *শিশু বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭৯-৮০।

১০১. 'বাকশাল' পুরো নাম 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ'। সংক্ষেপে বাকশাল বলা হয়। ১৯৭৫ সালের ২৪ জানুয়ারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বলে বহুদলীয় সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পরিবর্তে দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় এবং দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে এই একক রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। এ সময় বাকশালের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ছিলেন তৎকালীন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান। বাকশালে একীভুত হয়ে যাওয়া প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দল ছিল যথাক্রমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, মনি সিংহের নেতৃত্বধীন বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি ও অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। বাকশালের লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ কৃষক শ্রেণীর জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন করা এবং তাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সমবায় ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, শ্রমিক শ্রেণীর সক্রিয় অংশ গ্রহণ ও অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে কলকারখানা পরিচালনা করা। এসবের ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন ব্যবস্থার পুনর্গঠন, সরকারী প্রশাসন ও বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীয় করণ এবং পূণর্বিন্যাস সাধন। দূনীর্তি ও সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা কঠোর হস্তে দমন, জন সংখ্যা হ্রাসকরণ পরিকল্পনা জোরদার করণ। শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সমাজতন্ত্র কায়েম এবং শিল্প কলকারখানা সহ ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি জাতীয়করণ ও শিক্ষা ব্যবস্থার যুগোপযোগী সংস্কার সাধন করা।
দ্র: আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য, *শিশু বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১০১।

১০২. আব্দুল্লাহ আল-মুতি (সম্পা:), *শিশু বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮০।

১০৩. তদেব।

১০৪. মেজর জিয়াউর রহমান (১৯৩৬-১৯৮১) ছিলেন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। ১৯৩৬ সালের ১৯ জানুয়ারী তিনি বগুড়া জেলার বাগবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম-মনসুর রহমান এবং মাতার নাম-জাহানারা খাতুন। তাঁর ডাক নাম ছিল কমল। ১৯৫২ সালে করাচীর একাডেমী স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে মেট্রিক পাশ করার পর তিনি সেখানকার ডি. জি. কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫৩ সালে তিনি তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদেন, এবং ১৯৫৪ সালে তিনি কমিশন লাভ করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৫ সালে সংঘটিত পাক-ভারত যুদ্ধে তিনি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের খেমকারন সেক্টরে আলফা কোম্পানির একটি ব্যাটেলিয়ানের কমাণ্ডার হিসেবে ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। ১৯৬৬ সালে পাকিস্তান সামরিক একাডেমীর প্রশিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৭০ সালে তাঁকে চট্রগ্রামে বদলি করে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৮ম ব্যাটেলিয়ানের সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড-এর দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ রাতে পাক-বাহিনী বাঙ্গালীদের উপর ঝাপিয়ে পড়লে তিনি তাঁর অধিনস্ত বাঙ্গালী সৈন্যদের নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং ২৭ মার্চ কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষনা করেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বীর উত্তম উপাধীতে ভূষিত করেন। ১৯৭২ সালে কর্ণেল এবং ঐ বছর তিনি সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান হন। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী জনতার এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। এসময় সেনাবাহিনী প্রধানের পাশা-পাশি উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং ১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালে ৩০ মে চট্রগ্রাম সার্কিট হাউজে সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্যের হাতে নির্মম ভাবে নিহত হন। ঢাকায় শেরে বাংলা নগরে জাতীয় সংসদ ভবনের পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়।
দ্র: আব্দুল্লাহ আল-মুতি (সম্পা:), *শিশুবিশ্ব কোষ*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৯৯৬ খ্রী:), পৃ: ৩৫০-৫১।

পরে তিনি দেশের বরেণ্য রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, চিকিৎসক সহ বিভিন্ন পেশার মানুষের সমন্বয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সংক্ষেপে বিএনপি গঠন করেন।[১০৫] কালক্রমে বিএনপি দেশের বৃহত্তম দলে পরিণত হয়। অপর দিকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সত্তর দশকের শেষের দিকে বাকশালের নীতিমালা বর্জন করে পূর্ব- নীতিমালা ধারণ পূর্বক নতুন করে তাঁরা সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করে।[১০৬] আশির দশকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলেন দলটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৮৬ ও ১৯৯১ সালের জাতীয় নির্বাচনে দলটি অংশ গ্রহণ করে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে প্রধান বিরোধী দলের অবস্থান গ্রহণ করে।[১০৭] ১৯৯২ সালে দলটি তার পূর্বতন গঠনতন্ত্র সংশোধন করে দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনীতির ভিত্তি রচনার জন্য ব্যক্তি খাতকে উৎসাহ প্রদান এবং মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু করার কথা সংযোজন করে।[১০৮] ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়। উলেখ্য যে, শেখ মুজিবর রহমানের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ্য কন্যা শেখ হাসিনা[১০৯] দলের সভাপতি দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং অদ্যবধি তিনি এদলের সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন।

---

১০৫. ড. এমাজ উদ্দীন আহমেদ, *রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কথা*, পৃ; ৮৯৫।

১০৬. আব্দুল্লাহ আল-মুতি (সম্পা:), *শিশু বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮০।

১০৭. তদেব।

১০৮. তদেব।

১০৯. **শেখ হাসিনা :** তিনি ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গি পাড়ার শেখ বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ মুজিবর রহমান এবং মাতার নাম ফজিলাতুন নেসা। রাজনীতি নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকায় শেখ মুজিবর রহমান মেয়ের সেবা যত্ন ও দেখা-শুনা করার তেমন সুযোগ পেতেন না। বিধায় দাদা দাদীর স্নেহে তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। তাঁর ডাক নাম ছিল হাসু। পারিবারিক শিক্ষকের নিকট তাঁর লেখা-পড়ার হাতে খড়ি হয়। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য তাঁকে গ্রামের এক স্কুলে ভর্তি করা হয় কিন্তু ১৯৫৪ সালে তিনি গ্রাম ছেড়ে ঢাকায় চলে আসলে তাঁকে টিকাটুলির নারী শিক্ষা মন্দিরে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তাকে আজিমপুর গার্লস স্কুলে ভর্তি করা হয়। ১৯৬৫ সালে এ স্কুল থেকে সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাশ করার পর ১৯৬৬ সালে তিনি ঢাকা ইডেন কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৬৭ সালে আই. এ. পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অনার্সে ভর্তি হন। ১৯৬৭ সালে ১৭ নভেম্বর ড. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়ার সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। পিতার হাত ধরে মূলত: তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ছাত্র জীবন থেকে তিনি রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন এবং ছাত্রলীগের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে তিনি সরাসরি অংশ গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলন, এরশাদ বিরোধী আন্দোলন এবং কেয়ারটেকার আন্দোলনে তার ভূমিকা অনন্য।

১৯৭৫ সালে পিতা শেখ মুজিবর রহমান নিহত হওয়ার পর তিনি প্রবাস জীবন থেকে ফিরে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী মনোনীত হন। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর তিনি সংসদে বিরোধী দলের নেতা এবং ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পর তিনি বাংলাদেশের প্রাধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

দ্র: মিরাজ উদ্দীন আহমদ, *জননেত্রী শেখ হাসিনা* (ঢাকা: ভাস্কর প্রকাশনী, ২০০০ খ্রী:), পৃ: ২৪, ৩৩, ৩৫; ৩৭, ৩৯, ২৭২, ২৭৮, ২৮১।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

১৯৪১ সালে ২৫ আগষ্ট পাকিস্তানের লাহোর অধিবেশনে ৭৫ জন সদস্য নিয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী[১১০] জামায়াতে ইসলামী হিন্দ প্রতিষ্ঠা করেন।[১১১] মাওলানা মওদূদী (র:) শুধু জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না বরং তিনি আমৃত্যু জামায়াতের আন্দোলনের মূল পরিকল্পক, পরিচালক ও আধ্যাত্মিক নেতা ছিলেন।[১১২] প্রধানত: তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা জামায়াতের চিন্তাধারা হিসেবে প্রতিফলিত হয়।[১১৩] মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারার কিছু কিছু দিকের সংগে উপমহাদেশের উল্লেখযোগ্য কতিপয় মুসলিম ধর্মীয়

---

১১০. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : ১৯০৩ সাল মোতাবেক ১৩২১ হিজরী ৩ রজব হিন্দুস্তানের হায়দারাবাদ রাজ্যের (বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশ) আওরাঙ্গাবাদ শহরে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (র) জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম সাইয়েদ আহমদ হাসান এবং মাতার নাম রুকাইয়া বেগম। তিনি আল-হুসাইন ইবন আলী (রা)-এর বংশের বিয়াল্লিশতম পুরুষ। জন্মের পর পিতা আকুল আগ্রহে শিশু পুত্রের নাম রাখেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। তিনি প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন। মাত্র তিন বছর বয়সে তিনি বর্ণমালা শিখে ফেলেন। তার পিতা ছিলেন তাঁর প্রধান শিক্ষক। তাছাড়া বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাঁকে বিভিন্ন বিষয় শেখানোর জন্য গৃহশিক্ষক রাখা হয়। ১১ বছর বয়সে তাকে ৮ ম শ্রেণীতে ভর্তি করানো হয়। এ মাদ্রাসায় তিনি আরবী ভাষার সাথে সাথে গণিত, দার্থ, রাসায়নবিদ্যা ও ইতিহাস শিক্ষা লাভ করেন। ১৯১৬ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন মানের পরীক্ষায় পাশ করে হাদারবাদ কলেজে ভর্তি হন। এ সময় তাঁর আব্বা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলে চিকিৎসার জন্য ভূপালে যান। তখন তিনি তার মাতাকে নিয়ে ভূপালে চলে আসেন। যার কারণে তাঁর আর লেখাপড়া সম্ভব হয়নি। তিনি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাই অল্প বয়সেই সাহিত্য সাধানায় সিদ্ধহস্ত হয়েছিলেন। ১৯২১ সাল থেকে দিল্লিতে নিশ্চিন্ত মনে সংবাদ পত্র পরিচালনা ও অবসর সময়ে জ্ঞান অর্জনে মন দেন। তাছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ওলামায়ে-কেরামের নিকট 'আরবী ,সাহিত্য, হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ, মানতিক, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যয়নে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন। দ্বীন কায়েমের জন্য তিনি জামায়াতে ইসলামী নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৩ সালে 'কাদিয়ানী সমস্যা' নামে একখানা বই লেখেন। এই বই লেখার অপরাধে তৎকালীন সামরিক আদালত তাঁকে ফাঁসির আদেশ দেন। ফাঁসির মঞ্চে দাড়িয়ে তিনি বলেছিলেন,'জীবন মৃত্যুর ফয়সালা আসমানে হয়, জমীনে নয়'। অবশেষে তাঁর ফাঁসির আদেশ মওকুফ করতে সরকার বাধ্য হয়। তার অসাধারণ রাজনৈতিক দুরদর্শিতা ছিল। যার কারণে মুসলিম মিল্লাতের জন্য তিনি বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হন। তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফহীমুল কুর'আন বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছে। তিনি ১৯৭৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান সময় সন্ধ্যা পৌনে ছয় টায় ইন্তিকাল করেন।

দ্র: এ. কে. এম. নাজির আহমদ, *ইসলামী আন্দোলনের তিন প্রতিকৃত* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৩ খ্রী:), পৃ: ৫১,৭৪, ৯৫, ১৪২, মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব (সম্পা), *এ শতকের ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন* (বগুড়া : স্টুডেন্ট ওয়েল ফেয়ার প্রকশনী, ১৯৯৭ খ্রী:), পৃ: ১,৩,৪, আব্বাস আলী খান, *মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস* (ঢাকা: জামায়তে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, ২০০৩ খ্রী:), পৃ: ৩৩-৩৪,৪৭; আব্বাস আলী খান, *জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস* , ১ম খণ্ড (ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, প্রকাশনা বিভাগ, ১৯৯৬ খ্রী:), পৃ: ১৪।

১১১. ড. হাসান মোহাম্মদ, *জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ* (ঢাকা: একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯৩ খ্রী:), পৃ:৭।

১১২. Professer Ghalam Azam, *A Guide to Islamic Movement* (Dhaka, Azami Publdication, 1968), P. 28-32, আব্বাস আলী খান, *জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস* (ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রাকাশনা বিভাগ, ১৯৮৬ খ্রী:), পৃ: ৭৫, ড. হারুন-আর-রশিদ, *বাংলাদেশের রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন* (১৭৫৭-২০০৪), পৃ: ১৭৬, ড. হাসান মোহাম্মদ, *জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ*, পৃ: ৭।

১১৩. *জামায়াতে ইসলামী বাংলদেশের সদস্য সম্মেলনের প্রস্তাব* (ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৩ খ্রী:), পৃ: ১৫-১৬, ড. হাসান মোহাম্মদ, *জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতৃত্ব সংগঠন ও আদর্শ*, পৃ: ৭; Khurshid Ahmad and zafor Ishaq Ansari eds. *Islamic Perspecliue Studies in honour of Mawlana Abul Ala Mawdudi* (Leicester: U,K the Islamic Foundation, 1979), pp.3-10.

নেতাদের ভিন্নমত[১১৪] পোষন করা সত্ত্বেও জামায়াতের রাজনীতিতে মাওলানা মওদূদী (র:)-এর ব্যাপক প্রভাব ছিল এবং মৃত্যুর পরও তাঁর চিন্তাধারা জামায়াতের রাজনীতিকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করেছে। বাংলাদেশেও জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি এর ব্যতিক্রম নয়।[১১৫] ১৯৪৭ সালে এ উপমহাদেশ বিভক্তির পর পাকিস্তান ও ভারতে জামায়াতে ইসলামী পৃথক ভাবে কাজ শুরু করে এবং ১৯৫১ সালে মাওলানা আব্দুর রহীমের[১১৬] নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর শাখা গঠিত হয়।[১১৭] জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্র বিরোধী মতাদর্শে বিশ্বাসের কারণে মাওলানা মওদূদী (র) ও জামায়াতে ইসলামী হিন্দ কংগ্রেসের ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম লীগের পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করেছিল।[১১৮] কিন্ত ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মাওলানা মওদূদী (র) পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁর ধারণা পরিবর্তন

---

১১৪. নবীদের নিষ্পাপতা, মিয়ারে হক, তাকলীদ, তানকীদ ইত্যাদি প্রভৃতি ধর্মীয় প্রশ্নে মাওলানা মওদূদী (র)-এর মতের সংগে অনেক আলিম ভিন্নমত পোষণ করেন। ইসলামকে প্রধানত: আন্দোলন রূপে দেখা, একামতে দ্বীনের ধারণা, ইসলামের জন্য জামায়াত বা সংগঠনের অপরিহার্যতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য জামায়াতের ব্যাপক প্রচেষ্টা, ব্যক্তি সংস্কারের পরিবর্তে সামষ্টিক সংস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ ইত্যাদি প্রশ্নে মাওলানার মতামতের সংগে অনেক আলিমের ভিন্ন মত রয়েছে।

দ্র: মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, *জামায়াতে ইসলামীর বিরোধীতার অন্তরালে* (ঢাকা: খেলাফাত পাবলিকেশন্স, ৫ম প্রকাশ, ২০০৩ খ্রী:), পৃ: ১৮,২১,২৮।

১১৫. আববাস আলী খান বলেন, 'উপমহাদেশে তথা সমগ্র মুসলিম মিলাতের ন্য াওলানা ওদূদী য বদান রখেছেন তাঁর জন্য তাঁকে ইমাম বলে অবহিত করলে অত্যুক্তি হবে না'।

দ্র: *Introducing Jamat-e-Islami Bangladesh* (Dhaka: Publication Department, Jamat-e-Islami Banglasdesh, 1981), P.5; দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ২৯ জানুয়ারী, ১৯৮৯খ্রী:।

১১৬. মওলানা আব্দুর রহীম (১৯১৮-১৯৮৭) ১৯১৮ সালের ২৫ জানুয়ারী পিরোজপুর জেলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম হাজী খবির উদ্দীন এবং মাতার নাম আকলিমুন্নিছা। নিজ গ্রামে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর ছারছিনা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৩৮ সালে আলীম পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতপর কলিকাতা 'আলীয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৪০ সালে ফাজিল এবং ১৯৪২ সালে কামিল পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে মুমতাজুল মুহাদ্দিস উপাধিতে ভুষিত হন। ১৯৪৫ সালের শেষ দিকে স্বাধীন পেশা হিসেবে কাপড়ের ব্যবসার মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে শিক্ষকতায় যোগদান করে প্রথমে পিরোজপুরের কেউন্দিয়া মাদ্রাসায় এবং পরে রঘুনাথপুর সিনিয়র মাদ্রাসায় হেড মাওলানা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৫ সালের শেষ ভাগে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের মধ্য দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের কাজ শুরু করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি রুকুনিয়াত লাভ করেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকায় জামায়াতের সেক্রেটারী, ১৯৫৬ সালে আমীর হিসেবে এ অঞ্চলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ ১৩ বছর এক টানা পূর্ব-পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৬ সালে ইসলামী ডেমোক্রেটিক লীগের ভাইস চেয়ারম্যান এবং ১৯৭৭ সালে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে এম,পি নির্বাচিত হন এবং আই. ডি. এল.-এর সংসদীয় দলের প্রধান মনোনীত হন। ইসলামী আন্দোলনের এ বিশাল নেতা ১৯৮৭ সালের ১ অক্টোবর ইন্তিকাল করেন।

দ্র: অধ্যাপক মাযাহারুল ইসলাম, *বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপথিক যারা,* ১ম খণ্ড (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রী:), পৃ: ৩০-৩৭।

১১৭. ড. হারুন-অর-রশীদ, *বাংলাদেশের রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন* (১৭৫৭-২০০০), পৃ: ১৭৬।

১১৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *জামায়াতে ইসলামীর উনিশ বছর* (ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রচার বিভাগ, ১৯৮৭ খ্রী:), পৃ: ২৪-৩০।

করেন এবং ভারত থেকে পাকিস্তানে চলে এসে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।[১১৯] এদিকে অখন্ড পাকিস্তানে ইসলাম প্রতিষ্ঠার অধিকতর সম্ভাবনার প্রত্যয়ে "জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান" বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধীতা করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে জামায়াতে ইসলামী তা মেনে নেয়।[১২০] এ সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, '১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে এদেশে যারাই জামায়াতের সাথে জড়িত ছিল তারা বাস্তব সত্য হিসেবে বাংলাদেশকে একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র বলে মেনে নিয়েছে'।[১২১]

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ। এখানকার সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণ মুসলমান।[১২২] ধর্মের নামে পাকিস্তানী শাসকদের শাসন-শোষণ ও ধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকামী রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধীতা, নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ রুপে ধর্ম নিরপেক্ষতা গ্রহণ ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করণে অনুপ্রাণিত করেছিল।[১২৩] অতঃপর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের প্রণীত সংবিধান অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে গঠিত সরকার ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দল গুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করে। ১৯৭৬ সালের ৪ মে এক সামরিক অধ্যাদেশ দ্বারা ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে বাংলাদেশের মুসলিম আধুনিকতাবাদী গোষ্ঠি সমূহ "ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ" নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন।[১২৪] ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল প্রেসিডেন্টের সংবিধান সংশোধনী আদেশানুসারে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা অপসারিত হয় এবং ১৯৭৮ সালের রাজনৈতিক দল "অধ্যাদেশ" (১৯৭৬ সালে জারিকৃত) তুলে নেয়া হলে বিভিন্ন নামে আরো কয়েকটি ধর্মভিত্তিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে।[১২৫] এরই সুবাদে ১৯৭৯ সালের ২৫ থেকে ২৭ মে ঢাকার রমনাগ্রীনে অনুষ্ঠিত এক রুকন সম্মেলনের মাধ্যমে

---

১১৯. হামজা আলভী, *পাকিস্তান ও ইসলাম: জাতি সত্ত্বা মতার্দশ ও রাষ্ট্র,সমাজ নিরক্ষণ*, নভেম্বর সংখ্যা, ১৯৮৮ খ্রী:, পৃ: ৩৫-৩৬।

১২০. ড. হাসান মোহাম্মদ, *জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতৃত্ব,সংগঠন ও আদর্শ*, পৃ: ২০।

১২১. অধ্যাপক গোলাম আযম, *পলাশী থেকে বাংলাদেশ* (ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, ৯ম সং, ২০০২ খ্রী:), পৃ: ২০।

১২২. ১৯৮১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ৮,৭১,২০,০০০ জন। তন্মধ্যে মুসলমান সংখ্যা ৭,৫৪,৮৭,০০০ জন।
দ্র: *Statistical Pocket Book of Bangladesh, 1987* (Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, 1988), P.5.

১২৩. স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭১ সালের ৪ মে পর্যন্ত সাংবিধানিক বাধ্য বাধকতার কারণে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশসহ সকল ইসলামী দল এ দেশে নিষিদ্ধ ছিল।
দ্র: ড. হাসান মোহাম্মদ, *ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা ও বাংলাদেশের রাজনীতি* (১৯৭২-৮৬) (চট্রগ্রাম: চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, কলা, V-3, ১৯৮৭ খ্রী:), পৃ: ৪১-৪৬।

১২৪. ড. হাসান মোহাম্মদ, *জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ*, পৃ: ৮।

১২৫. মুহাম্মদ ইয়াহিয়া আখতার, *রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিকীকরণ: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ* (ঢাকা: নিবেদন প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিকেশন্স ১৯৮৯ খ্রী:), পৃ: ১৩২-১৩৩

ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকামী রাজনৈতিক সংগঠন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশ্য ভাবে তার কার্যক্রম শুরু করে।[১২৬] বাংলাদেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ইসলাম ধর্মের প্রভাব খুব বেশী।[১২৭] তবে ধর্মীয় রাজনীতির পরিবর্তে ধর্মের নামে রাজনীতির প্রশ্নের সাথে এ দেশের ইসলাম প্রিয় জনগণ ঐক্যমত পোষন করেন না। বাংলাদেশে ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সবচেয়ে শক্তিশালী, সু-শৃংখল ও সু-সংগঠিত সংগঠন হিসেবে সাম্প্রতিক কালে এ দেশের জন মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।[১২৮] মূলতঃ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোন ইসলামী দল খুব বেশী নতুন সদস্য ও সমর্থক তৈরী করতে সক্ষম হয়নি। অন্য দিকে জামায়াতে ইসলামীর সহযোগী সংগঠন হিসেবে "বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির"[১২৯] ও ....

---

১২৬. বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর জামায়াতে ইসলামীর নেতা কর্মীদের অনেকে যে যেখানে যে অবস্থানে ছিলেন সে অবস্থায় থেকে গোপনে সাংগঠনিক কাজ শুরু করেন। জুময়ার নামাজের পূর্বে অথবা নামাজ শেষে বক্তৃতা, মিলাদ মাহফিল, তাফসীর, ওয়াজ মাহফিল, দারস-ই-কুর'আন, দারস-ই-হাদীস ইত্যাদির মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ধীরে ধীরে তাঁর কার্যক্রম শুরু করে। ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মীরাও গোপনে তাদের কার্যক্রম চালাতে থাকে। এভাবে ১৯৭২-১৯৭৬ সাল অর্থাৎ "আই.ডি.এল." গঠন পর্যন্ত জামায়াতের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন সমুহ প্রধানতঃ গোপনে তাদের তৎপরতা পরিচালনা করে। সর্বপ্রথম ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী "পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘ" (১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত) নাম পরিবর্তন করে "বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির" নামে প্রকাশ্য ছাত্র সংগঠন হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে। এভাবে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পক্ষে ক্রমান্বয়ে অনুকূল পরিবেশ তৈরী হচ্ছে দেখে প্রকাশ্য সংগঠন হিসেবে পুনরায় জামায়াতের আত্মপ্রকাশের পক্ষে অনেক নেতা মত প্রকাশ করলে জামায়াত প্রকাশ্য ভাবে তার কার্যক্রম শুরু করে।
দ্রঃ ড. হাসান মোহাম্মদ, *জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ*, পৃঃ ৩০-৩১।

১২৭. L.W, Puy. *Political culture in International Encyclopedia of social sciences. vol-12* (USA: Macmillan company and the free Press: 1968) P. 218.

১২৮. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলাম তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে প্রায় ১০% ভোট পেয়ে ২য় বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ সহ অন্যান্য ইসলামী দলগুলো (জামায়াত বাদে) মিলিত ভাবে ৭.৮৫% ভোট পেয়েছিল। ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে জামায়াত, নেজামে ইসলাম ও খেলাফাতে রববানী পার্টির সমন্বয়ে গঠিত "আই.ডি.এল." মুসলিম লীগের সংগে জোটবদ্ধ হয়ে ২০ টি আসন লাভ করে। ১৯৮৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ একক ভাবে ১০টি আসন পায়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ২টি মহিলা পদ সহ মোট ২০টি আসন লাভ করে। এ নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে (১২-১৩%) জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশকে বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম দল এবং প্রাপ্ত আসনের ভিত্তিতে ৪র্থ বৃহত্তম দল বলে বিবেচনা করা হয়।
দ্রঃ ড. হাসান মোহাম্মদ, *জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ*, পৃঃ ৩১।

১২৯. স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ হওয়ায় ইসলামী ছাত্র-সংঘ প্রকাশ্য কাজ করতে না পারায় তারা গোপনে বিভিন্ন নামে বেনামে অর্থাৎ কখনো ইসলামী ছাত্র মিশণ, কখনো বা Young man Muslim association ইত্যাদি নামে সাংগঠনিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে থাকে। ইতিহাসের এক পর্যায়ে ১৯৭৬ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকার লক্ষী বাজারে সংঘের সংক্ষেপে ICS এর বৈঠকে নতুন ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে চুল-চেরা বিশ্লেষণ হয়। দীর্ঘ আলোচনা শেষে ঐ বছরের ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে ইসলাম পন্থী দায়িত্বশীল ছাত্রদের একটি কনভেনশন ডাকবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৭৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমন্ত্রণ প্রাপ্ত ২২১ জন ছাত্র প্রতিনিধি বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এ কনভেনশনে যোগ দান করেন। সারা দেশে সংগঠনের তৎপরতার রিপোর্ট পেশ এবং একটি প্রকাশ্য নতুন ছাত্র সংগঠন গঠনের লক্ষ্যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এবং সর্বাধিক সংখ্যক প্রতিনিধির মতামত অনুযায়ী এ নতুন সংগঠনের নাম "ইসলামী ছাত্রশিবির" হিসেবে গৃহীত হয়। একই সময়ে পরবর্তী নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য চূড়ান্ত নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। অধ্যাপক নাজির আহমদ নির্বাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৬ ডিসেম্বর সন্ধার পর এ নতুন সংগঠনের সভাপতি মীর কাশেম আলীর নাম ঘোষনা করা হয়। এবং মুহাম্মদ আব্দুল বারী ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল মনোনীত হন। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৬ সালের অক্টোবরের ঐ বৈঠকেই ৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ থেকেই এই সংগঠন তার আনুষ্ঠানিক ঘোষনার মাধ্যমে একটি প্রকাশ্য সংগঠন হিসেবে তৎপরতা শুর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের মিম্বরের পাশে বসেই বিদায়ী সভাপতি আ,ন,ম আব্দুজ্জাহের বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের নাম আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষনা করেন।
দ্রঃ মুঃ নূরুল ইসলাম (সম্পাঃ), *২৫ বছর পূর্তি স্মারক প্রেরণার মিছিল* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির প্রকাশনা বিভাগ, ২০০২ খ্রীঃ), পৃঃ ২০০।

"ইসলামী ছাত্রী সংস্থা"[১৩০]-এর মাধ্যমে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের এক উল্লেখযোগ্য অংশকে জামায়াত তার আন্দোলনের সমর্থক তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে।[১৩১] এছাড়া জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বিভিন্ন পেশার মানুষকে এ সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য আরো অনেক গুলো অংগ ও সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে সাংগঠনিক তৎপরতা পরিচালনা করছে।[১৩২] তবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এ দেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পর্যায়ে না এলেও এর ক্রমবর্ধমান শক্তিকে আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারছে না। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস", ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে "রাষ্ট্র ধর্ম" ঘোষনা এদেশের রাজনীতিতে ধর্মের প্রাধান্যের কথাই প্রমান করে। তাছাড়া ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ের জন্য বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে নানা ভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের অনুসারী দলগুলোও এর বাইরে থাকতে পারেনি।[১৩৩] বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকামী সংগঠন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশকে আশাবাদী করে তুলতে সহায়ক করেছে। পাশা-পাশি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরোধী শক্তিসমুহ ইসলামী রাজনীতির অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করার জন্য সদা তৎপর রয়েছে।[১৩৪] এদিকে রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহার করে সুবিধা লাভ করতে এমন সংগঠনও মৌলবাদ বিরোধীতার কারণ দেখিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশকে প্রতিহত করতে চেয়েছে।[১৩৫] এ দেশের আলিম সমাজের একটি অংশও এখনো জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের বিরোধী।[১৩৬] প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতও বাংলাদেশে ইসলামী শক্তির উত্থানে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।[১৩৭] আবার জামায়াত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে জামায়াত তোষনের অভিযোগও

---

১৩০. **ইসলামী ছাত্রী সংস্থা :** ইসলামী আদর্শবাদী একক ছাত্রী সংগঠন। ১৯৭৮ সালের ১৫ জুলাই এ সংগঠন যাত্রা শুরু করে। মূলতঃ বাংলাদেশের ছাত্রী সমাজকে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী গঠন করে তাদেরকে আদর্শ মুসলিম নারী হিসেবে তৈরী করা এবং দ্বীন ইসলামের সঠিক দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে গড়ে তোলা এ সংগঠনেরক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারা সংগঠন গড়ে তুলেছে ।
দ্রঃ পরিচিতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা, সেপ্টেম্বর, ২০০৬ খ্রীঃ।

১৩১. ড. হাসান মোহাম্মদ, *জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতৃত্ব,সংগঠন ও আদর্শ*, পৃঃ ৯।

১৩২. তদেব

১৩৩. ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *ধর্মের নামে নির্বাচন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, এপ্রিল -১১, ১৯৯১ খ্রীঃ, পৃঃ ২১-২৩।

১৩৪. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, নভেম্বর-১১, ১৯৮৮ খ্রীঃ, পৃঃ ২১-৩৪।

১৩৫. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, অক্টোবর-১১,১৯৮৭ খ্রীঃ, পৃঃ ১১-১৩।

১৩৬. মাওলানা আব্দুল আওয়াল, *জামায়াতে ইসলামীর ধর্ম ব্যবসা, সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, নভেম্বর-১১, ১৯৯৮৮ খ্রীঃ, পৃঃ ৪০-৪৩; আসিফ নজরুল, *জামাতে ইসলামীর ধর্ম ব্যবসা : বিশিষ্ট আলেমদের অভিমত*, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, জানুয়ারী -১৩, ১৯৮৯ খ্রীঃ, পৃঃ ৩৪-৩৯।

১৩৭. ভারতের প্রাক্তন মন্ত্রী নরসীমা রাও বাংলাদেশে ইসলামী শক্তির উত্থানে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রফেসর সমর গুহকে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন । যে চিঠিটি হুবহু দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় ছাপা হয় ।
দ্রঃ দৈনিক সংগ্রাম, ডিসেম্বর-২৯, ১৯৮৮ খ্রীঃ ।

তুলেছে।[১৩৮] এতদসত্ত্বেও সূফী-দরবেশদের প্রভাবের কারণে বাংলাদেশের মুসলমানদের সরলতা ও ধর্মীয় উদারতা, পশ্চিমা শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশ কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধীতা, মৌলবাদী রাজনীতির[১৩৯] উগ্ররূপ সম্পর্কিত ভয়-ভিতি ইত্যাদি বিষয়ে এদেশে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাফল্যের পথে অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে বড় ধরণের অন্তরায় বলে মনে করা হয়।[১৪০] তবে জামায়াতে ইসলামীর মতে এ পৃথিবীসহ বাংলাদেশের সার্বিক অশান্তির মূলে রয়েছে আল্লাহ ও পরকাল বিষয়ে মানুষের ঔদাসীন্য এবং রাসূল (সা:)-এর নেতৃত্বের প্রতি বিদ্রোহ।[১৪১] একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই কেবল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের উদ্দেশ্য নয় বরং মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশিত বিপ্লব সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য।

---

১৩৮. ১৯৭৩ সালে শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক জামায়াতে ইসলামীকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষনা করা, ১৯৭৬ সালে জিয়াউর রহমান কর্তৃক ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগঠনের অনুমতি প্রদান, ১৯৮৩-৯১ পর্যন্ত ১৫ দল, ৫ দল, ৭ দল এবং জামায়াতে ইসলামী যুগপৎ এরশাদ বিরোধী আন্দোলন, ১৯৮৬ সালে জামায়াতে ইসলামী ও আওয়ামী লীগের সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ, এরশাদ সরকার কর্তৃক ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষনা, ১৯৯১ সালে জামায়াতে ইসলামীর নিশর্ত সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জামায়াতের সমর্থন লাভের জন্য গোলাম আযমের সমর্থন চাওয়া, জামায়াতের সাথে একই মঞ্চে বিএনপি-এর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পরস্পরের বিরুদ্ধে জামায়াত তোষনের অভিযোগ এনে থাকেন। কলিকাতার দৈনিক স্টেটসম্যানকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এরশাদ বলেন, "জামায়াতে ইসলামীকে প্রতিহত করার জন্য ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ঘোষনা করা হয়েছে। তাঁর মতে সরকার বিরোধী আন্দোলনে জামায়াতকে অংশিদার করে বিরোধীদল সমূহ জামায়াতে ইসলামীকে পুনর্বাসিত করেছে"।

দ্রঃ The Bangladesh Observer, Dhaka, July-21,1989, P.10; সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১১ নভেম্বর, ১৯৮৮ খ্রী:, পৃ: ৩৪; সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১১ অক্টোবর, ১৯৮৭ খ্রী:, পৃ: ১২-১৩; বেগম খালেদা জিয়ার সাক্ষাৎকার, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২১ জুলাই, ১৯৮৯ খ্রী:, পৃ: ২৫-২৬।

১৩৯. খ্রীষ্ট ধর্মের আদি রূপের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যুক্তরাষ্ট্রে যে খ্রীষ্টীয় মৌলবাদী আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তার সাথে তুলনা করে বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম প্রধান দেশের ইসলামী শাসন পুণঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে ইসলামী মৌলবাদী আন্দোলন বলে অভিহিত করার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন লেখক পাশ্চত্য সভ্যতা বিরোধীতার কারণে ইসলামের পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলনকে "নব মৌলবাদী" বলে অভিহিত করতে চান। নব মৌলবাদ পাশ্চত্য প্রভাবিত আধুনিকতার বিরোধীতা করলেও আধুনিকতাবাদী আন্দোলনের নানা দিক দ্বারা বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিতও হয়। আবার পাশ্চত্য জগতে ধর্মান্ধতা ও ধর্মোন্মাদনার সমার্থক অর্থে মৌলবাদকে ব্যবহার করা হয়। বিধায় বর্তমান বিশ্বের ইসলামী পুনর্জাগরণকে কোন কোন লেখক "মৌলবাদ" বলে চিহ্নিত করতে চান না। বর্তমান যুগের অধিকাংশ ইসলামী আন্দোলন খ্রীষ্টীয় মৌলবাদী আন্দোলনের ন্যায় যুগ বাদীকে অস্বীকার করে না। এ সব আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা পাশ্চত্য অর্থে নিজেদেরকে মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত করতে চান না। ইসলামের মূল স্তম্ভগুলোকে অবিকৃত রেখে যুগ চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য এ সব আন্দোলনের নেতাদের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

দ্রঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *ইসলামী মৌলবাদ : শৌল বিতর্ক,ত্রৈমাসিক সুন্দরাম*, শীত সংখ্যা, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৪৮-৫৫; *Encyclopaedia Britannica, vol-9* (Chicago: Encyclopaedia Britannica Inc,1966), PP.1009-11; Dilip Hiro, *Islamic Fundamentalism* (London: Paladin Grafton Books,1988), P._; Fazlur Rahman, Roots of Islamic Neo Fundamentalism in P.H.D stoddard ed, change in the Muslim Word (New York: Syracuse University Oress,1981), PP. 23-33 .

১৪০. ড. হাসান মোহম্মদ, *জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতৃত্ব,সংগঠন ও আদর্শ*, পৃ: ১১।

১৪১. *নির্বাচনী এশতেহার: জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান* (চট্রগ্রাম: জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান, চট্রগ্রাম শাখা প্রকাশিত, ১৯৭০ খ্রী:), পৃ: ১।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন এ কারণেই তাঁর নবীগণকে পৃথিবীতে পঠিয়েছেন এবং ইসলাম প্রচার, প্রসার এবং প্রতিষ্ঠার জন্য আম্বিয়া-কেরামের নেতৃত্বে "উম্মতে মুসলিমা" নামে একটি দল গড়ে উঠেছে।[১৪২] জামায়াতে ইসলামীর ঘোষনা অনুযায়ী জামায়াত শুধু একটি রাজনৈতিক দল কিংবা একটি সংস্কারবাদী সংগঠন নয় বরং ব্যাপক অর্থে একটি ইসলামী আদর্শবাদী সংগঠন। এ দল মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় সংকল্প।[১৪৩] তবে ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনে নেতৃত্বের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জামায়াতে ইসলামীর ধারণায় ইসলামী আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থা মূলতঃ নেতাকেন্দ্রীক ।[১৪৪] তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে নেতৃত্ব ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায় সে নেতৃত্ব অনুসরণ করার জন্য জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ আহবান জানায়।[১৪৫] জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের বর্তমান আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, 'ইসলামী সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের বিকল্প। হাদিসে রাসূলের আলোকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য রাসূলের আনুগত্যেরই শামিল।[১৪৬] এ সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নায়েবে রাসূলের মর্যাদার অধিকারী। অধঃস্তন সংগঠনের নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতিনিধি হওয়ার কারণে সর্ব পর্যায়ের নেতৃত্বই পরোক্ষভাবে নায়েবে রাসূলের মর্যাদার দাবী রাখে।[১৪৭] মূলতঃ ইসলামী সংগঠনের সিদ্ধান্ত কোরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী না হলে সে সিদ্ধান্তকে কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশেরই মর্যাদা দিতে হবে।[১৪৮] তাই জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বকে অবশ্যই কুর'আন ও সুন্নাহর গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। ধর্মীয় বিধি নিষেধ মেনে চলার ক্ষেত্রে সকলের চেয়ে অগ্রসর হতে হবে এবং নেতৃত্বের জীবনে কোন অবস্থাতেই আল্লাহ ও রাসূলের শিক্ষার দৃষ্টিতে সঠিক মানের চেয়ে নিম্ন মানের হতে পারবে না।[১৪৯] ইসলামকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার যে লক্ষ্য নিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কাজ করছে বলে দাবী করে থাকে সে লক্ষ্যের সংগে তার সংগঠন সম্পর্কিত ধারণাও সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া স্বাভাবিক'। মাওলানা নিজামীর মতে, 'মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একীভূত রুপের অনুকরণে কিছু সংখ্যক মানুষের নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য

---

১৪২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী* (ঢাকা: মাওলানা আব্দর রহীম কতৃক প্রকাশিত, ১৯৬৩ খ্রী:), পৃ: ৩৭।

১৪৩. *মেনিফেস্টো: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ* (ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৯ খ্রী:), পৃ: ৫।

১৪৪. মতিউর রহমান নিজামী, *ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন* (ঢাকা: আল এহসান প্রকাশনী , ১৯৮৬ খ্রী:), পৃ: ৬০।

১৪৫. *মেনিফেষ্টো, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ*, পৃ: ১২।

১৪৬. عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطاعنى فقد أطاع الله من عصاني فقد عصى الله ومن يطع الامير فقد اطاعنى ومن يعص الامير فقد عصاني.

দ্র: ইমাম নববী, *রিয়াদুস সালেহীন*, আব্দুল মান্নান তালিব সম্পাদিত (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৪ খ্রী:), পৃ: ১৬০।

১৪৭. মতিউর রহমান নিজামী, *ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন*, পৃ: ৫৭।

১৪৮. তদেব ।

১৪৯. আববাস আলী খান, *জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস* (ঢাকা: আবু নুমান মো: মাসউদুয্-যামান প্রকাশিত, ১৯৮৬ খ্রী:), পৃ: ২৭৩-৭৪।

এক দেহ, এক প্রাণরূপ কাজ করার সামষ্টিক কাঠামোকেই বলা হয় সংগঠন। এ জন্যই হাদীসে এ জনসমষ্টিকে একটি দেহের সাথে তুলনা করা হয়েছে।[১৫০] নেতৃত্বের ন্যায় সংগঠনকেও জামায়াতে ইসলামী ধর্মীয় মর্যাদার অধিকারী মনে করে'। এ সম্পর্কে আববাস আলী খান বলেন, 'জামায়াতে ইসলামী তার সংগঠনকে শরীয়তের মর্যাদা দিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ এ সংগঠনের নিয়ম শৃংখলা মেনে চলা কর্মীদের শারয়ী ফরজ বলে গণ্য করা হয়। এর আনুগত্যকে সৎ কাজের আদেশ (আমর বিল মা'রুফ)-এর শর্তাধীন করে তাকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ করা হয়েছে। ফলে জামায়াতে ইসলামীর প্রত্যেক কর্মী তার প্রতিটি কাজকে দ্বীনি প্রয়োজন, সওয়াবের কাজ এবং অপরিহার্য মনে করে। যেহেতু জামায়াতে ইসলামীর সংগ্রাম দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, সে জন্য তার প্রত্যেকটি কাজই জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর কাজ, সে জন্য তা সর্বোত্তম এবাদতের মধ্যে গণ্য।[১৫১] ইসলামী রাষ্ট্র মূলতঃ একটি সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্র। মানুষের জীবনের সকল দিককে এ রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। এতদসত্ত্বেও ইসলাম ব্যক্তি স্বাধীনতা অনুমোদন করে এবং একনায়কতন্ত্রের বিরোধীতা করে।[১৫২] ইসলাম ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্রের বিরোধী।[১৫৩] ধর্মনিরপেক্ষতা ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলাম চায় খোদার বন্দেগী, বিশ্বমানবতা, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও জনগণের খেলাফাত ।[১৫৪]

সমাজ জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী বিপ্লব আবশ্যক। জামায়াতে ইসলামীর মতে, ইসলামী বিপ্লবের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে

ক. ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের আন্দোলন

খ. শক্তিশালী ও সু-সংগঠিত সংগঠন

গ. ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে অনুকূল জনমত গঠন

ঘ. মান সম্মত, দক্ষ ও ত্যাগী কর্মী বাহিনী তৈরী ও পরিচালনা

ঙ. যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি

চ. প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধের শক্তি অর্জন

ছ. ইসলামী বিপ্লবের সাফল্য ধরে রাখার ক্ষমতা অর্জন

জ. ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যের জন্য আল্লাহর সাহায্য লাভ ।[১৫৫]

---

১৫০. মতিউর রহমান নিজামী, *ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন*, পৃ: ৪৩-৪৪।

১৫১. আববাস আলী খান, *জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস*, পৃ: ২৭৫-৭৬।

১৫২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৫ খ্রী:), পৃ: ৪০।

১৫৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী বিপ্লবের পথ* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৭ খ্রী:), পৃ: ৮-১১।

১৫৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী*, পৃ: ৪৮-৪৯।

১৫৫. মতিউর রহমান নিজামী, *ইসলামী সমাজ বিপ্লব* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৮খ্রী:), পৃ: ১১-১৩; অধ্যাপক ইউসুফ আলী, *ইসলামী বিপ্লব সংগঠন ও পরিকল্পনা* (ঢাকা: শহীদ স্মৃতি প্রকাশনী, ১৯৮৮খ্রী:), পৃ: ৫০-৫৪।

সুতরাং বলা যায়, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জুলুম অত্যাচারের পথ অবলম্বন করে তাদের সোনালী আশখ্যাত পাট থেকে অর্জিত অর্থ পশ্চিম-পাকিস্তানে ব্যয় করে। ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীগণ নানাভাবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ে। উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করায় পূর্ব-পাকিস্তানের জন সাধারণ তাদের মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়েছে বলে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার জোরালো দাবী উত্থাপন করে। সরকারী অফিস গুলোতে পূর্ব-পাকিস্তানের লোকদের নিয়োগ না দেওয়ায় তারা স্বাভাবিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ্ হয়। এ সকল বৈষম্যের কারণে পূর্ব-পাকিস্তানের জন সাধারণ প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী হয়ে উঠে।[১৫৬] এ ছাড়া পাকিস্তান কেন্দ্রীয় পরিষদে নিরংকুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেলেও ক্ষমতা হস্ত ান্তরের ব্যাপারে পাক-বাহিনী ও পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা "জুলফিকার আলী ভূট্রো"[১৫৭] ষড়যন্ত্র শুরু করে। ইয়াহিয়া খান, ভূট্রো ও পাকিস্তানের ক্ষমতালিপ্সু সামরিক অফিসারগণ একত্রে মিলে বাঙ্গালী কোন ব্যক্তিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে দিবেন না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাই তারা পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণকে ধোকা দেয়ার জন্য এক নীল নকশা প্রণয়ন করেন। তাতে প্রকাশ্যে দেখানো হয় যে, তারা পূর্ব-পাকিস্তানের নেতা শেখ মুজিবের সাথে একটা সমঝোতায় আসতে চায়। কিন্তু পারত পক্ষে তাঁরা এর বিপরীত পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন।[১৫৮] যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব-পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হামলা পরিচালনা করে। পূর্ব-পাকিস্তানীরা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললে শুরু হয় বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম।[১৫৯] এ সময় মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ২৬ মার্চ

---

১৫৬. ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, *বাংলাদেশ পরিক্রমা*, পৃ: ৭৩ ; ড. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশের রাজনীতি সরকার ও* শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৯৫৭-২০০০), পৃ: ৩৫৩।

১৫৭. জুলফিকার আলী ভূট্রো : (১৯২৮-১৯৭৯) একজন বিশিষ্ট রাজনিতিবীদ ও আইনজীবি ছিলেন। তিনি ১৯২৮ সালের ৫ জানুয়ারী সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজ থেকে উচ্চ-শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৫৮-১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি আইয়ুব খানের মন্ত্রী সভায় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২ সালে তিনি পাকিস্তান মুসলিম লীগের সংসদীয় সভার ডেপুটি লিডার নিযুক্ত হন। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর ১৯৬৬ সালের জানুয়ারীতে স্বাক্ষরিত তাশখন্দ চুক্তির প্রতিবাদে তিনি আইয়ুব খানের মন্ত্রী সভা থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৬৭ সালে নভেম্বরে ভূট্রো "পাকিস্তান পিপলস" পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে ১৯৬৮ সালের ১৩ নভেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সাধরণ নির্বাচনে পি. পি. পি. বিজয়ী হয়। কিন্তু এ নির্বাচনে নিরপেক্ষ না হওয়ার ধোয়া তুলে বড় বড় শহর গুলোতে গোলযোগ সৃষ্টি হয়। এ সুযোগে পাকিস্তানের সামরিক নেতৃবৃন্দ ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে ক্ষমতা দখল করে। এরপর ভূট্রো কর্তৃক একজন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হত্যার নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগে সামরিক আদালত তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে ১৯৭৯ সালে ৪ঠা এপ্রিল ফাঁসিতে তাঁর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করে। দ্র: আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য, *শিশু বিশ্বকোষ, ৪র্থ খন্ড*, পৃ: ২৪৯।

১৫৮. ড. ইন্নাস আলী ও অন্যান্য, *বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, পৃ: ৭০।

১৫৯. তদেব, পৃ: ৭০-৭১

(১৯৭১ সালে) চট্টগ্রামের কালূর ঘাট বেতার কেন্দ্র হতে স্বাধীনতার ঘোষনা দেন।[১৬০] ১০ এপ্রিল প্রবাসী সরকার গঠন করা হয় এবং এ সরকার আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনা করেন। ১১ এপ্রিল সরকারের পক্ষ থেকে বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানানো হয়। অন্য দিকে ১৭ এপ্রিল কর্নেল মুহাম্মদ আতাউল গনি উসমানীর নেতৃত্বে দেশ প্রেমিক সামরিক অফিসাররা সিলেটের তালিয়াপাড়া চা বাগানে গোপন বৈঠকে মিলিত হন এবং মুক্তি যুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের রণকৌশল প্রণয়ন করেন।[১৬১] তারা সারা দেশের লড়াইকে এগারটি[১৬২] সেক্টরে বিভক্ত করে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করেন।[১৬৩] সম্মিলিত ভাবে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করার পর ১৬ ডিসেম্বর তারা পরাজয় মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করলে "বাংলাদেশ" নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বিশ্বের মানচিত্রে আত্ম প্রকাশ করে।[১৬৪]

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর এদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু সংখ্যক নেতা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু দেশ প্রেমিক ও ইসলাম প্রিয় জনতা তা মেনে নেয়নি।[১৬৫] এ সময় মেজর

---

১৬০. ডা. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন* (১৭৫৭-২০০০), পৃ: ৩৫৩; ড. ইন্নাস আলী, *বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, পৃ: ৭২।

১৬১. ড. ইন্নাস আলী, *বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, পৃ: ৭৩

১৬২. সেক্টর গুলোর বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১নং সেক্টর: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ফেনী পর্যন্ত।

২নং সেক্টর: নোয়াখালী জেলা, কুমিল্লা জেলার আখাউড়া-ভৈরব রেল-লাইন পর্যন্ত এবং ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ।

৩নং সেক্টর: সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা, কিশোরগঞ্জ, আখাউড়া-ভৈরব রেল লাইন থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে কুমিল্লা জেলা এবং ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ।

৪নং সেক্টর: সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল এবং খোয়াই শায়েস্তাগঞ্জ রেল লাইন বাদে পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট ডাউকি সড়ক পর্যন্ত।

৫নং সেক্টর: সিলেট ডাউকি সড়ক থেকে সিলেট জেলার সমগ্র উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চল।

৬নং সেক্টর: সমগ্র রংপুর জেলা এবং দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাও মহকুমা।

৭নং সেক্টর: সমগ্র কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা, ফরিদপুরের অধিকাংশ এলাকা এবং দৌলতপুর সাতক্ষীরা সড়কের উত্তরাংশ।

৮নং সেক্টর: দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল, বগুড়া, রাজশাহী এবং পাবনা জেলা।

৯নং সেক্টর: দৌলতপুর সাতক্ষীরা সড়ক থেকে খুলনার দক্ষিণাঞ্চল এবং সমগ্র বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা।

১০নং সেক্টর: উপকূল ভাগ ও অভ্যন্তরীণ জলপথ।

১১নং সেক্টর: সমগ্র ময়মনসিং ও টাঙ্গাইল জেলা এবং নগরবাড়ী আরিচা থেকে ফুলবাড়ী বাহাদুরাবাদ পর্যন্ত যমুনা নদী ও তীর অঞ্চল।

দ্র: ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, *বাংলাদেশ পরিক্রমা*, পৃ: ৮৬; ড. এমাজ উদ্দীন আহমদ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা*, পৃ: ৭৪৮।

১৬৩. ড. ইন্নাস আলী, *বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, পৃ: ৭৩; মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, *বাংলাদেশ পরিক্রমা*, পৃ: ৮৫।

১৬৪. ড. এমাজ উদ্দীন আহমদ, *বাংলাদেশ ঃ রাজনীতির গতিধারা* (ঢাকা: ঝিনুক প্রকাশ, ২০০০ খ্রী:), পৃ: ৯৮৫।

১৬৫. কে. এম. মাহফুজুল করিম, *পীর মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার (র:)-এর ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের অবদান*, পৃ: ৫।

জেনারেল জিয়াউর রহমান বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বিএনপি নামক একটি নুতন রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং এ দলের ঊনিশ দফা[১৬৬] উন্নয়ন কর্মসূচী ঘোষনা করে দেশকে সুসংহত করেন।[১৬৭] তিনি সংবিধানে "বিসমিল্লাহ" সংযোজন করেন এবং বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন।[১৬৮] ১৯৮১ সালে ৩০ মে এক রাজনৈতিক সামরিক ষড়যন্ত্রে তিনি নিহত হলে এর অব্যবহতি পর অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দলীয় ভাইস চেয়ারম্যান বিচারপতি আব্দুস সাত্তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।[১৬৯] কিন্তু ১৯৮২ সালে ২৪ মার্চ তাঁকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করে লে. জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে দেশে ঘরোয়া রাজনীতি চালু হলে "বেগম

---

১৬৬. ঊনিশ দফা নিম্নরূপ :

(i) সর্বোতভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখন্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।
(ii) সংবিধানের চারটি মূলনীতিকে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলন করা।
(iii) সর্ব উপায়ে নিজেদেরকে একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে তোলা।
(iv) প্রশাসনের সর্বস্তরে উন্নয়ন কার্যক্রমে এবং আইন শৃংখলা রক্ষার সকল ক্ষেত্রে জন সাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
(v) সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে প্রাণবন্ত করা।
(vi) দেশে কাপড় উৎপাদন বৃদ্ধি করে সকলের জন্য কাপড়ের সরবরাহ নিশ্চিত করা।
(vii) কোন নাগরিক যেন গৃহহীন না থাকে তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা।
(viii) নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করা।
(ix) সমাজে নারীদের যথাযোগ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা।
(x) সকলের জন্য যথাসম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
(xi) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারী চেষ্টায় উৎসাহ দান করা।
(xii) শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি বিধান করা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে শ্রমিক ও মালিকদের সম্পর্ক উন্নতি করা।
(xiii) সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে জনসেবা ও দেশ গঠনের মনোভাব গড়ে তোলা।
(xiv) জনসংখ্যা বিস্ফোরণ প্রতিরোধ করা।
(xv) সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা।
(xvi) প্রশাসন ও উন্নয়ন ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীয় করণ এবং স্থানীয় পর্যায়ের সরকার গুলোকে শক্তিশালী করা।
(xvii) দুর্নীতিমুক্ত এবং ন্যায় ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা।
(xviii) ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ করা।

দ্র: ড. এমাজ উদ্দীন আহমদ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা*, পৃ: ৮৯৪।

১৬৭. তদেব, পৃ: ৮৯৫।

১৬৮. বাংলাদেশ সংবিধান (সংশোধন) আদেশ ১৯৭৭। এতে বলা হয়েছে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের পর থেকে বিভিন্ন ঘোষনার মাধ্যমে শাসন কাঠামোর অনেক পরিবর্তন আনায়ন করা হয়েছে। এ প্রসংগে ১৯৭৫ সালের ২০ আগষ্ট, ১৯৭৫ সালের ৮ নভেম্বর ও ১৯৭৫ সালের ২৯ নভেম্বরের ঘোষনা উল্লেখযোগ্য। এসব ঘোষনায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি এক ঘোষনা কালে বাংলাদেশ সংবিধানে কিছু সংশোধনী সংযোজন করে ১৯৭৭ সালের সংশোধনী আদেশ জারী করেন। এ আদেশ সংবিধানে কয়েকটি মৌল পরিবর্তন সূচিত করে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন হলো-বাংলাদেশ সংবিধানের চারটি মৌল নীতির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে সংযোজিত হয় আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা। আল্লাহই সকল কর্মের মূল হিসেবে স্বীকৃত হয়। তাই সংবিধান শুরু করা হয়েছে আল্লাহর নামে "বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম বলে।"

দ্র: *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়, ১৯৯৮ খ্রী: পৃ: ৫; মুহম্মদ ইয়াহিয়া আখতার, *রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিকীকরণ: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ*, পৃ: ১৩২-৩৩।

১৬৯. আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য, *শিশু বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯২; ড. এমাজ উদ্দীন আহমদ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা*, পৃ: ৯১৩।

জিয়া"[১৭০] বিএনপি-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে দলটির ব্যাপক ভূমিকা ছিল।[১৭১] ১৯৯১ সালে সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করলে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়।[১৭২] কিন্তু দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও দলীয় করণের কারণে জনরোষে পতিত হলে দলটি ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হয় এবং সংসদে বিরোধী দলের অবস্থান গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, অদ্যবধি বেগম খালেদা জিয়া এ দলের চেয়ারপার্সনের দায়িত্বে রত আছেন।

তাঁছাড়া উপরোক্ত দলগুলোর পাশা-পাশি সেমসয় (১৯০০-১৯৯৯ খ্রী:) নিজামে ইসলাম (১৯৫৩ খ্রী:), কমিউনিষ্ট পার্টি (১৯৪৮ খ্রী:), গণতন্ত্রদল ও (১৯৫৩ খ্রী:) স্ব-স্ব আদর্শে দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে।[১৭৩]

---

১৭০. ১৯৪৫ সালে ১৫ আগষ্ট দিনাজপুর জেলায় বেগম খালেদা জিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ইস্কান্দার মজুমদার। ব্যবসা উপলক্ষ্যে মূলত: তিনি দিনাজপুরে বসবাস করেন। তাঁর আদি নিবাস ফেনী জেলার ফুলগাজী থানায়। দিনাজপুর মিশনারী স্কুল থেকে বেগম জিয়া প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে ১৯৬০ সালে তিনি দিনাজপুর গার্লস স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ঐ বছরই তৎকালীন ক্যাপ্টেন এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সংগে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি ১৯৯১, ১৯৯৬ (আংশিক) এবং ২০০১ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

দ্র: সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলা পিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ,* ৩য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রী:), পৃ: ৭৮।

১৭১. আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য, *শিশু বিশ্বকোষ,* ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯২।

১৭২. তদেব।

১৭৩. ড. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশের রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন*(১৭৫৭-২০০০), পৃ: ১৮১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আব্বাস আলী খানের জীবন পরিক্রমা

বংশ পরিচয়
জন্ম
নামকরণ
বাল্য জীবন
শিক্ষা জীবন
বৈবাহিক অবস্থা
কর্ম জীবন
জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান
বিদেশ সফর
কারাবরণ
রচনাবলী
চরিত্র মাধুর্য
সমাজ সেবামূলক কর্মকাণ্ড
ইন্তিকাল
শোকসভা ও দু'আর মাহফিল
আব্বাস আলী খান সম্পর্কে সুধীজনের মন্তব্য

দ্বিতীয় অধ্যায়

আব্বাস আলী খান-এর জীবন পরিক্রমা

বংশ পরিচয়

আব্বাস আলী খান একজন খোদাভীরু 'আলিমে দ্বীন ও সমাজসেবক ছিলেন।[১] তাঁর পূর্ব পুরুষগণ আফগানিস্তানের পাঠান বা পাখতুন বংশোদ্ভুত ছিলেন বলে জানা যায়। পাঠান মূলক থেকে তাঁরা এদেশে এসেছিলেন। পাঠান আমলে দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাটে এক দশ হাজারী মুনসেবদার বসবাস করতেন। হযরত খানজাহান আলী (র)[২] (মৃত ১৪৫১ খ্রী:) একজন মুনসেবদার ছিলেন। মূলতঃ তাঁদের সমসাময়িক সময় খান সাহেবের পূর্ব পুরুষেরা এদেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।[৩] তাঁর পিতার নাম ছিল আব্দুল আজিজ খান এবং মাতার নাম ছবিরন নেসা। তাঁর মাতা একজন ধর্মপ্রাণ, পরহেজগার ও পর্দানশীন মহিলা ছিলেন বলে জানা যায়। খান সাহেবের দাদার নাম ছিল সুবিদ আলী খান, পিতামহের নাম রকিমুদ্দীন খান এবং তদীয় পিতার নাম মুছা খান যা তাঁর বংশ তালিকা[৪] থেকে পাওয়া যায়।[৫]

---

১. অধ্যক্ষ আ. ন. ম. আবদুশ শাকুর, *বাংলা ভাষায় মাওলানা মওদূদী (র:) চর্চা ও আব্বাস আলী খানের অবদান* (চট্রগ্রাম: আল-আকাবা প্রকাশনী, ১৯৯৯ খ্রী:), পৃ: ৭।

২. হযরত খানজাহান আলী (র) একজন বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক ও শাসক ছিলেন। সুলতানী আমলে তিনি বাংলাদেশে আসেন। প্রথমে যশোর অঞ্চলে ধর্ম-প্রচার ও নানাবিধ জনহিতকর কাজ শুরু করেন এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এরপর তিনি বৃহত্তর খুলনা জেলার বাগেরহাট অঞ্চলে আস্তানা স্থাপন করেন। সেখানেও তিনি ইসলাম প্রচার ও জনকল্যাণ মূলক কাজ যেমন-রাস্তাঘাট, মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, জলাশয় খনন প্রভৃতি কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যশোর, খুলনাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর সে সব কীর্তির চিহ্ন এখনো বিদ্যমান। হযরত খানজাহান আলী (র)-এর অমর কীর্তি বাগেরহাট ষাট গুম্বজ মসজিদ। নামে ষাট গুম্বজ হলেও এই মসজিদে ৭৭টি গুম্বজ রয়েছে। এই মহান সাধক "খাঞ্জালী পীর" নামে এখনো স্থানীয় জনগণের নিকট প্রিয়। ১৪৫১ সালের ২৫ অক্টোবর তিনি ইন্তিকাল করেন। মসজিদের অদূরে তাঁর মাজার অবস্থিত। দ্র: আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য সম্পাদিত, *শিশু বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৯৯৬ খ্রী:), পৃ: ১৪৯।

৩. আবদুস শহীদ নাসিম (সম্পা:), *আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃ: ১১; আব্বাস আলী খান, *স্মৃতি সাগরের ঢেউ* (ঢাকা: বই বিতান প্রকাশনী, ২য় সং, ১৯৮৮ খ্রী:), পৃ: ১৯; নাজমুস সায়াদাত (সম্পা:), *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম* (ঢাকা: প্রফেসর্স পাবলিকেশন্স, ২০০৬ খ্রী:), পৃ: ৩৬; অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, *স্মৃতির পাতায় জননেতা আব্বাস আলী খান* (ঢাকা: আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ২০০২ খ্রী:), পৃ: ৯; অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, *বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপথিক যারা*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রী:), পৃ:১৮।

৪. আব্বাস আলী খানের বংশ তালিকায় যাদের নাম পাওয়া যায় তারা হলো:
আব্বাস আলী খান ইব্ন আব্দুল আজিজ খান, ইব্ন সুবিদ আলী খান ইব্ন রকিমুদ্দীন খান ইব্ন মুছা খান। মাতার নাম: ছবিরন নেসা।
তার সহধর্মীনীর নাম: মোছাম্মদ খাদিজা খাতুন বিন্ত সুফী সায়েম উদ্দীন আহমদ।
কন্যার নাম: বেগম জেবউন্নেছা, চাচার নাম: রায়চাঁদ খান এবং আব্দুল কাদের খান, বোনদের নাম: হাজেরা খাতুন, সালেহা খাতুন, জোবেদা খাতুন, সাজেরান বিবি (জীবিত), বাকী দু'জনের নাম জানা যায় না।
দ্র: নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৩৬।

৫. তদেব।

জন্ম

বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মনীষী আব্বাস আলী খান ১৯১৪ খ্রী: মোতাবেক ১৩২১ বঙ্গাব্দের ফালগুন মাসের শেষ সপ্তাহে সোমবার বেলা ৯.০০ ঘটিকায় জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার পারুলিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ধর্মপ্রাণ মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৬]

নামকরণ

জন্মের পর আববাস আলী খানের নামকরণ নিয়ে অনেক আলোচনা পর্যালোচনা হয়।[৭] অবশেষে হযরত মুহাম্মদ[৮] (সা)-এর সুন্নাত[৯] অনুযায়ী স্বীয় দাদা গরু খাশি জবেহ করে তাঁর আকিকাহ[১০] সম্পন্ন করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাস[১১] (রা)-এর নাম অনুসারে তাঁর নাম রাখেন আব্বাস।[১২]

---

৬. আব্বাস আলী খান, *স্মৃতি সাগরের ঢেউ*, পৃ: ১৮; আবদুস শহীদ নাসিম (সম্পা:), *আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃ: ১১; অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, *স্মৃতির পাতায় জননেতা আব্বাস আলী খান*, পৃ: ৯; নাজমুস সায়াদাত (সম্পা:), *আব্বাস আলী খানের জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৩৫; অধ্যক্ষ আ. ন. ম. আবদুশ শাকুর, *বাংলা ভাষায় মওদূদী (র:) চর্চা ও আব্বাস আলী খানের অবদান*, পৃ: ৮; অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, *বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপথিক যারা*, *১ম খন্ড*, পৃ: ১৮; আব্দুল কাইয়ুম ও অন্যান্য, *সফল যারা কেমন তারা* (ঢাকা: সম্প্রীতি পাবলিকেশন্স, ২০০২ খ্রী:), পৃ: ২৭।

৭. স্মৃতি সাগরের ঢেউ গ্রন্থে খান সাহেব নিজের নামকরণ সম্পর্কে বলেন, আমার নাম নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা হলো। কতেক মুরুব্বি আবুল কাশেম রাখতে বল্লে তা দাদার মনপুত হলো না। এ সময় বাড়ীতে থাকা মৌলভী সাহেবকে বললেন, মৌলভী সাহেব আপনি খুৎবায় যে নাম গুলো পড়েন তার মধ্যে আব্বাস নামটি আমার পছন্দ। এতে মৌলভী সাহেব মত দিলে দাদা আমার নাম আব্বাস রাখার ব্যাপারে স্থীর করলেন এবং আকিকাহ্ সম্পন্নও করলেন।
দ্র: আব্বাস আলী খান, *স্মৃতি সাগরের ঢেউ*, পৃ: ১৮।

৮. নবীকূলের শিরমনি হযরত মুহাম্মদ (সা) ৫৭০ খ্রী: ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার সুবহি সাদিকের সময় প্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশের হাশেমী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পূর্বে পিতা আব্দুল্লাহ্ ইন্তিকাল করেন। জন্মের পর মাত্র সাতদিন নিজ মায়ের দুধ পান করেন। এরপর ধাত্রী মাতা হালিমা সায়াদীয়া (রা)-এর দুধ ২ বছর পান করেন এবং ৫ বছর পর্যন্ত তিনি হালিমা (রা)-এর গৃহে অবস্থান করেন। ৬ বছর বয়সে মাতা আমিনা ইন্তিকাল করলে দাদা আব্দুল মোত্তালিবের নিকট তিনি লালিত পালিত হন। ৫৭৮ খ্রী: দাদার মৃত্যু হলে চাচা আবু তালিব তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১২ বছর বয়সে তিনি চাচা আবু তালিবের সাথে সিরিয়ায় বানিজ্যে যান। ১৪ বছর বয়সে তিনি ফিজারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং "হিলফুল ফুজুল" নামে জনসেবা মূলক একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। ২৫ বছর বয়সে খাদীজা (রা)-কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। ৩৫ বছর বয়সে কাবা ঘর পূণঃনির্মাণের কাজে অংশগ্রহণ করেন এবং হাজরে আসওয়াদ নিজ হাতে যথা স্থানে স্থাপন করে এক রক্তক্ষয়ী বিবাদের মিমাংসা করেন। ২৭ রজব সোমবার ১ ফেব্রুয়ারী ৬১০ খ্রী: ৪০ বছর বয়সে হিরা গুহায় তিনি নবুওয়াত লাভ করেন। ৬২১ খ্রী: তিনি স্বশরীরে মিরাজে গমন করেন। ৬২২ খ্রী: আল্লাহর নির্দেশে সাহাবীদের নিয়ে মক্কা থেকে মদীনায় হিযরত করেন। ৬৩১ খ্রী: ১ লাখ ১৪ হাজার সাহাবীসহ তিনি বিদায় হজ্জ পালন করেন এবং আরাফার ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। ৬৩২ খ্রী: ২৮ সফর বুধবার তিনি মাথা ব্যাথা এবং জ্বরে আক্রান্ত হন। ১৪ দিন জ্বরে আক্রান্ত থাকার পর ৬৩২ খ্রী: ১৮ জুন ১২ রবিউল আওয়াল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে হযরত 'আয়শা (রা) এর ঘরে মহানবী (সা) ইন্তিকাল করেন।
দ্র: ইসমাঈল হোসেন, *বিশ্ব নবীর পরিচয়* (ঢাকা: রশিদ বুক হাউজ, ১৯৯১ খ্রী:), পৃ: ১৪৭-৫২; খান মোসলে উদ্দীন আহমদ, *মহানবীর সীরাত কোষ* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৪ খ্রী:), পৃ:২৭-৩০; অধ্যাপক আবু জাফর, *মহানবীর (সা) মহাজীবন* (ঢাকা: পালাবদল পাবলিকেশন্স, ২০০২ খ্রী:), পৃ: ২১৭; আকরাম ফারুক (অনুদিত), *সীরাতে ইবনে হিশাম* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০২ খ্রী:), পৃ: ৩৮-৩৯; মাওলানা মো: ফজলুর রহমান আশরাফী, *বিশ্বের মুসলিম মনীষীদের কথা*, *১ম খণ্ড* (ঢাকা: আর. আই. এস. পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯ খ্রী:), পৃ: ১১-১২।

৯. সুন্নাত 'আরবী শব্দ। হাদীসের অপর নাম সুন্নাত। সুন্নাহ এর শাব্দিক অর্থ চলার পথ বা রাস্তা। যেমন বলা হয়, سَنَنْتُ الشَّيْءَ بِالْمِسَنِّ -'আমি বস্তুটিকে ভারী পাথর দ্বারা চিহ্নিত করলাম।' কর্মের নীতি ও পন্থা-পদ্ধতি, রীতি-নীতি, নিয়ম-প্রক্রিয়া, জীবন-চরিত স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদি। যেমন নবী করীম (স) বলেছেন,

مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ

-'যে ব্যক্তি কোন নিকৃষ্ট পদ্ধতি প্রচলন করল, তার পাপ তার ওপর আপতিত হবে। আর কিয়ামত পর্যন্ত যে কোন ব্যক্তি ঐ নিকৃষ্ট কাজটি করতে থাকবে তার পাপও তারই (প্রথম প্রচলন কারীর) ওপর আপতিত হতে থাকবে।'
'আল্লামা রাগিব ইস্পাহানী (র) (মৃত ৫০২ হিজরী) বলেন, سُنَّةُ النَّبِيِّ: طَرِيْقَتُهُ الَّتِيْ كَانَ يَتَحَرَّاهَا
-'নবী করীম (স)-এর সুন্নাত বলতে তাঁর এমন রীতি-নীতিকে বুঝায় যা তিনি বেছে নিতেন এবং অবলম্বন করে চলতেন।'
ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় সুন্নাহ বলা হয়, নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখনিসৃত বাণী, কার্যপ্রণালী এবং তাঁর মৌনসম্মতি ব্যাপকার্থে সাহাবী ও তাবি'ঈগণের কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকেও সুন্নাহ বলা হয়ে থাকে।

বাল্য জীবন

আববাস আলী খানের বাল্য জীবন ছিল অত্যন্ত বিনয়ী, ধৈর্য্যশীল এবং সততার মনোভাব। তাঁর চরিত্রের মাঝে এতোই মাধুর্যতা ছিল যে এলাকার অন্যান্য ছেলেরা তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকে সঙ্গ দিত না।[১৩]

শিক্ষা জীবন

খান সাহেব শৈশবে নিজ বাড়ীর এক মৌলভী সাহেবের নিকট পবিত্র কুর'আন[১৪] শরীফের সবক গ্রহণের

দ্র: ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *উলুমুল হাদীস* (রাজশাহী: সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ২০০০ খ্রী:), পৃ:৪১-৪২; ড. মুস্তাফা আস্-সুবা'ঈ, *আস সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহু ফীত তাশরী'ঈল ইসলামী* (বৈরুত: আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫ খ্রী:), পৃ: ৮; ড. মুহাম্মদ রাওয়াস কাজালী, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* (করাচী: ইরাদাতুল কুর'আন ওয়ার উলুমিল ইসলামিয়্যাহ,তা:বি:),পৃ: ২৪০; সা'দী আবূ জাইয়্যেব, *আল-কামুসুল ফিকহী* (করাচী: ইরাদাতুল কুর'আন ওয়ার উলুমিল ইসলামিয়্যাহ,তা:বি:), পৃ: ১৮৩; Fazlur Rahman, *Islamic Methedology in History* (Karachi: Centeral institute of Islamic Research, 1965), PP. 27-30; Mawlana Muhammad Ali, *The Religion of Islam* (Lahor: The Ahmediyyahh Anjuman Ishaat Islam, 1930), P. 58.

১০ শিশু জন্মের পর ৭ দিবসে নামকরণ ও কেশ মণ্ডুন উপলক্ষ্যে পশু কুরবানীর নাম আকীকাহ। ইসলামের বিধান অনুযায়ী সে দিন নব জাতকের নাম রাখা, তার চুলকাটা ও কুরবানী করা সুন্নাত। ৭ দিবসে আকীকাহ করা না হলে শিশু বয়স্ক হলে নিজেও তা করতে পারে। প্রাচীনতম আলিমদের মতে, আকীকাহ করা ওয়াজীব। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র) ইহাকে মুসতাহাব বলে বিবেচনা করেছেন। Doughty-এর মতে, 'আকীকাহ হলো 'আরব মরুভূমিতে সর্বাধিক অনুষ্ঠিত উৎসব সমূহের অন্যতম'।
দ্র: আ. ফ. ম. আব্দুল হক ফরিদী ও অন্যান্য (সম্পা), *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ খ্রী:), পৃ: ৪।

১১. হযরত আব্বাস (রা)-এর প্রকৃত নাম আবুল ফজল আব্বাস, পিতার নাম আব্দুল মুত্তালিব এবং মাতার নাম নাতিলা মতান্তরে নামিলা বিনতে খাব্বাব। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আপন চাচা। ঐতিহাসিকদের ধারণা অনুযায়ী সম্ভবত: তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুই বা তিন বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন। জাহেলীযুগে তিনি একজন প্রত্যাপশালী রঈস ছিলেন। পুরুষানুক্রমে খানায়ে কাবার রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব পান তিনি। মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি স্ব-পরিবারে মদিনায় হিযরত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাজির হয়ে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন এবং স্থায়ীভাবে মদিনায় বসবাস শুরু করেন। তিনি মক্কা বিজয় ও হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল, অতিথি পরায়ন ও দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন। হযরত সা'দ ইব্‌ন আবি অক্কাস (রা) বলেন, 'আব্বাস ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে দারাজহস্ত, ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অধিক মনোযোগী ব্যক্তি। ৩২ হিজরী মোতাবেক ৬৫৫ খ্রী: রজব/মোহাররম মাসের ১২ তারিখ ৮৮ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। তৃতীয় খলীফা হযরত 'ওসমান (রা) তাঁর জানাযার নামাজের ইমামতি করেন।
দ্র: মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯ খ্রী:), পৃ: ১০৮-১১; মু: সেলিম উদ্দীন (সম্পা:), *ছাত্র সংবাদ* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির দাওয়াতী কার্যক্রম বিভাগ, ২ নভেম্বর সংখ্যা, ২০০৩ খ্রী:), পৃ: ২৯।

১২. আব্বাস আলী খান, *স্মৃতি সাগরের ঢেউ*, পৃ: ১৮; নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৩৭; অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, *বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপথিক যারা, ১ম খন্ড*, পৃ: ১৮।

১৩. আব্দুল কাইয়ুম ও অন্যান্য, *সফল যারা কেমন তারা*, পৃ: ২৭।

১৪. 'আলিমগণ আল-কুর'আন (القرآن) শব্দের বিশ্লেষণে কয়েকটি মত প্রদান করেছেন। কারও কারও মতে, আল-কুরআন শব্দ مَهْمُوْز (হামযা যুক্ত)। আবার কারও কারও মতে, তা مَهْمُوْز নয়। ইমাম শাফিঈ (র) قرأت শব্দকে হামযা বিশিষ্ট বলেন। কিন্তু কুর'আনকে হামযা বিশিষ্ট বলেন না। তার মতে, এটি হামযা বিশিষ্ট নয়। বরং তা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের একটি নাম।' আল-লিহ্‌য়ানী-এর মতে 'কুর'আন শব্দটি মাসদার, হামযাযুক্ত, আল-গুফরান-এর ওযনে গঠিত এবং قَرَأَ থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ পাঠ করেছে। মাসদারকে مفعول অর্থে গ্রহণ করতঃ এখানে কুর'আনকে مقروء অর্থাৎ পঠিত অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে।' পরিভাষায় আহমদ মোল্লাজিওন বলেন,
اَمَّا الْكِتَابُ فَالْقُرْآنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَكْتُوْبُ فِيْ الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلاً مُتَوَاتِراً بِلاَ شُبْهَةٍ.
-'কিতাব বলতে এমন কুর'আনকে বুঝায়, যা রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করা হয়েছে। এটি মাসহাফ সমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর এটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে নিঃসন্দেহ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।'
দ্র: ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *'উলুমুল-কুর'আন*, ১ম খণ্ড (রাজশাহী: আল মাকতাবাতুশ শাফিয়্যাহ, ২০০১ খ্রী:), পৃ: ৮-১১; হাফিজ মাওলানা শহিদুল ইসলাম, *আল-কুর'আন সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা: আর. আই. এস. পাবলিকেশন্স, ২০০০ খ্রী:), পৃ: ২৩-২৪; মোল্লা জীওয়ান, *নূরুল আনোয়ার* (দেওবন্দ: কুতুব খানাহ রহীমিয়্যাহ, তা: বি:), পৃ:৭-৮; নবাব সিদ্দিক হাসান, *হুসুলুল মামুল* (কুস্তানতুনীয়া: মাতবা'আতুল জাওয়াহির,১২৭৬ খ্রী:),পৃ: ৩৮-৩৯; *আল-কামুসুল ফিকহী*, পৃ: ২৯৮; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *'উলুমুল হাদীছ*, পৃ: ৩৩।

মধ্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন।[১৫] মাত্র ৭ বছর বয়সে ১৯২১ সালে তিনি জুপুরহাটে নিজ বাড়ী থেকে দেড় মাইল দূরে হানাইল মাদ্রাসায় ২য় শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত তিনি অত্র মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন।[১৬] উল্লেখ্য যে, কুর'আন শরীফের সবক নেওয়ার আগেই তিনি আযানের শব্দ গুলো মুখস্ত করেন। তাছাড়া তিনি বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, বাংলা ও আরবী ব্যকরণ এবং উর্দু ও ফার্সী ভাষা অধ্যয়ন করেন। তিনি যখন ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র তখন তিনি শেখ সা'দী (র)-এর গুলেস্তা কিতাব রপ্ত করেন।[১৭]

হুগলী মাদ্রাসায় অধ্যয়ন

কৃতিত্বের সাথে ৫ম শ্রেণী পাশ করার পর খান সাহেব নিজ বাড়ী থেকে দু'শত মাইল দূরে তাঁর দূর-সম্পর্কীয় এক মামার তত্ত্বাবধানে হুগলী নিউস্কিম মাদ্রাসায় ৬ষ্ট শ্রেণীতে ভর্তি হন। ৬ষ্ট শ্রেণীতে জুনিয়ার ফাইনাল পরীক্ষা হত। এ বছর অসুস্থ্যতার কারণে "সিকবেডে" পরীক্ষা দিয়েও তিনি কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন এবং এক বছর স্থায়ী গভর্নমেন্ট স্কলারশীপ ও চার বছর স্থায়ী মুহসীন স্কলারশীপের গৌরব অর্জন করেন।[১৮] ত্রিশের দশকে মাদ্রাসা গুলো বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারী এডুকেশন ঢাকা-এর অধীনে পরিচালিত হত। এ বোর্ডের অধীনে হুগলী মাদ্রাসা থেকে ১৯৩০ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে মেট্রিক পাশ করেন।[১৯]

---

১৫. অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, *স্মৃতির পাতায় জননেতা আব্বাস আলী খান*, পৃ: ৯; আব্বাস আলী খান, *স্মৃতি সাগরের ঢেউ*, পৃ: ১৮; নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৩৮।

১৬. আব্বাস আলী খান তাঁর স্মৃতি সাগরের ঢেউ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন , আমাদের বাড়ীতে একজন মৌলভী সাহেব থাকতেন তাঁর বাড়ী ছিল জলপাই গুড়িতে। তাঁর কাছে আমরা উর্দু শিখেছিলাম। ছোট চাচা শিখাতেন অংক। ১৯২১ সালে দাদা আমাকে গ্রামের দেড় মাইল উত্তরে এক মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দেন। উস্তাদ মাওলানা আরেফ উদ্দীন খান আমাকে পরীক্ষা করে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করে নেন। ক্লাসের মধ্যে আমি ছোট ও হাবা ছিলাম। তারপরেও ১ম হয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠলাম। এখানে আরবী ও ফার্সীর বিরাট বোঝা। সাথে ইংরেজী তালিকার দিকে তাকালে মনে হতো বার হাত ফল তের হাত বিচি। বাংলা, অংক, ইংরেজী, ইতিহাস, তার উপর ফার্সি। উস্তাদের মারের ভয়ে না বুঝে তোতা পাখির মত সব কিছু রপ্ত করতাম।
দ্রঃ আব্বাস আলী খান, *স্মৃতি সাগরের ঢেউ*, পৃ: ২১-২৩।

১৭. তদেব।

১৮. নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৩৯; আব্বাস আলী খান, *স্মৃতি সাগরের ঢেউ*, পৃ: ২১-২৩; অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, *স্মৃতির পাতায় জননেতা আব্বাস আলী খান*, পৃ: ৯; অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, *বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপথিক যারা*, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৮।

১৯. আবদুস শহীদ নাসিম, *আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃ: ১২; আব্বাস আলী খান, *স্মৃতি সাগরের ঢেউ*, পৃ: ২৪; নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৪২; অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, *স্মৃতির পাতায় জননেতা আব্বাস আলী খান*, পৃ: ৯।

রাজশাহী সরকারী কলেজে অধ্যয়ন

সেকেণ্ডারী পাশের পর খান সাহেব ১৯৩১ সালে রাজশাহী সরকারী কলেজে[২০] ভর্তি হন। রাজশাহী সরকারী কলেজ তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল। এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে হলে যেমন ভিসা লাগত তেমনি এক বোর্ড থেকে অন্য বোর্ডে বা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হতে হলে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট লাগত। তাই রাজশাহী সরকারী কলেজে ভর্তির জন্য উক্ত ঢাকা বোর্ডের মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট ছিল অপরিহার্য। কিন্তু খান সাহেবের মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট না থাকায় কেরানী বাবু ভর্তি করতে অপারগতা প্রকাশ করলে তৎকালীন ইংরেজ প্রিন্সিপাল টি. টি. উইলিয়ামস মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট পরে দেয়ার শর্তে তাঁকে ভর্তি হওয়ার অনুমতি দেন।[২১] ভর্তি হয়ে তিনি ফুলার হোস্টেলে থাকতেন। নতুন কলেজ জীবনের এক অভূতপূর্ব আনন্দের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতিটা দিন অতিবাহিত হচ্ছিল। ইতোমধ্যে ভারত বর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। সারা ভারতের শহরের কলেজ গুলোতে মাঝে মাঝে হৈ, চৈ, সভা-সমাবেশ, ক্লাস বর্জনসহ বিভিন্ন কর্মসূচী চলছিল। এরই ধারাবাহিকতায় রাজশাহী সরকারী কলেজে ক্লাস বর্জন কর্মসূচী ঘোষণা করা হলো।[২২]

---

২০. রাজশাহী সরকারী কলেজ যার নাম বর্তমান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। হযরত শাহ মাখদুম (র)-এর পূর্ণময় স্মৃতি বিজড়িত পদ্মা বিধৌত রাজশাহী শহরের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত উত্তর বঙ্গের শ্রেষ্ঠ মেধা বিকাশের প্রাণ কেন্দ্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। ১৮২৮ সালে রাজশাহীর কিছু শিক্ষা দরদী মানুষের নেহায়েত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয় "বুয়ালিয়া ইংলিশ স্কুল" বর্তমানে কলেজিয়েট হাই স্কুল। এই স্কুলটি ১৮৩৬ সালে সরকারী স্কুল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে যা পরবর্তীতে জেলা স্কুল হিসেবে ঘোষিত হয়। ১৮৭২ সালে দুবলহাটির রাজা প্রদত্ত ৫০০০/= টাকা বার্ষিক আয়ের একটি জমিদারী সম্পত্তির অর্থানুকুল্যে প্রদান করে। ১৮৭৩ সালে ১ এপ্রিল রাজশাহী জেলা স্কুলে এফ. এ. ক্লাশ চালু করা হয়। ১ জন মুসলিম ছাত্রসহ মাত্র ৬ জন ছাত্র নিয়ে 'বুয়ালিয়া হাই স্কুল' নামে ঐ দিন একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের মর্যাদায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের যাত্রা শুরু হয়। ১৮৭৮ সালে কলেজটি প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা লাভ করে এবং ডিগ্রি কলেজে উন্নীত হয়। একই সাথে এখানে অনার্স কোর্স চালু করা হয়। ১৮৮১ সালে কলেজটিতে আইন এবং ১৮৯১ সালে এম. এ. পড়ানো শুরু হয়। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যায়ের অধীনে ছিল এবং ১৯৫১ সাল পর্যন্ত অনার্স পড়ানো বন্ধ ছিল। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আবার সেগুলো চালু করা হয়। ১৯৫৩ সালের ১ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কার্যকর হলে ঐদিন থেকে কলেজটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়। বর্তমান কলেজটিতে ১৯টি বিষয় অনার্সসহ ২১টি বিষয়ে মাষ্টার্স কোর্স চালু রয়েছে।
দ্রঃ গ্রন্থনায়ঃ মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, *ছাত্র সংবাদ*, ক্যাম্পাস পরিচিতি, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ সংখ্যা, ১৯৯৭ খ্রীঃ ।

২১. নাজমুস সায়াদাত, আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম, পৃঃ ৪২।

২২. ক্লাস বর্জন সম্পর্কে আব্বাস আলী খান তাঁর স্মৃতি সাগরের ঢেউ গ্রন্থে বলেছেন, 'সারা ভারতে তখন ভয়ানক রাজনৈতিক উত্তাপ চলছিল। স্বাধীনতা আন্দোলন বলতে গেলে টেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা, অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি। এ সময় বড় বড় শহরগুলোর কলেজেও এর ছোঁয়া লাগে। যার কারণে মাঝে মাঝে কলেজ গুলোতে হৈ চৈ ধর্মঘট, সমাবেশ চলতে থাকে। এরই অংশ হিসেবে রাজশাহী কলেজে ক্লাস বর্জন ঘোষণা করা হলো। এর এক পর্যায়ে ছাত্র নেতারা ক্লাস রুমের দরজায় শুয়ে পড়লেন যাতে ছাত্রবিহীন ক্লাসে শিক্ষকরা ঢুকতে না পারেন। চাকুরীর খাতিরে দর্শনের অধ্যাপক কৌশিক স্যার শায়িত ছাত্রদের উপর দিয়ে ক্লাসে ঢুকলে ছাত্ররা ক্ষিপ্ত হয়ে সারা কলেজে হৈ হুল্লা শুরু করে। এর পর ক্লাস বন্ধ হয়ে যায়'।
দ্রঃ আব্বাস আলী খান, *স্মৃতি সাগরের ঢেউ*, পৃঃ ২১-২৩।

রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যয়ন

রাজশাহী সরকারী কলেজের অবিরাম ক্লাস বর্জন এবং ছাত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে খান সাহেব বছরের শেষের দিকে টি. সি. নিয়ে রংপুর কারমাইকেল কলেজে[২৩] ভর্তি হন।[২৪] ১৯৩২ সালে তাঁর আই, এ পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু রংপুরের আবহাওয়া তাঁর শরীরের সাথে খাপ নাখাওয়ায় এবং দু' মাস ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত থাকায় ক্লাসে উপস্থিতি এত কম ছিল যে, তিনি নন-কলেজিয়েট হয়ে যান। টেষ্ট পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করার পর ফাইনাল পরীক্ষায় একটা ভাল ফলাফলের আশায় পরীক্ষা দেওয়ার উপায় খুঁজতে থাকেন এবং কলেজিয়েট হওয়ার জন্য কলেজ প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করেও শেষটায় পরীক্ষা দিতে তিনি ব্যর্থ হন।[২৫] পরের সেশনে আই. এ. পরীক্ষার টেষ্টে আববাস আলী খান ভাল রেজাল্ট করলেন। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসের ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তিনি সফলতার সথে আই. এ. পাশ করেন।[২৬] পরবর্তীতে ১৯৩৫ সালে তিনি রংপর কারমাইকেল কলেজ থেকে ইতিহাসে ডিষ্টিংশন সহ বি. এ. পাশ করেন।[২৭] এর পর কিছু দিন তিনি বি. টি. পড়ার সুযোগ পান।

---

২৩. রংপুর কারমাইকেল কলেজ যার বর্তমান নাম রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। উনবিংশ শতাব্দির ত্রিশের দশকে ইংরেজী শিক্ষার সূচনা হিসেবে স্থাপিত হয়েছিল রংপুর জমিদার্স স্কুল। ১৮৩২ সালে যার উদ্বোধন করেছিলেন ভারতের তদানীন্তন বড় লার্ট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক। ১৮৩৬ সালে কুন্ডির জমিদার রাজমোহন রায় চৌধুরীর চেষ্টায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬২ সালে রংপুর জমিদার্স স্কুল সরকার অধীগ্রহণ করেন এবং এটি রংপুর জেলা স্কুল নামে রুপান্তরিত হয়। মাত্র ৯ জন ছাত্র নিয়ে ১৮৭৭ সালের ১ জানুয়ারী রংপুর জেলা স্কুলে কলেজ সেকশন খোলা হয়। কিন্তু ছাত্র/ছাত্রীর অভাবে ১৮৮০ সালে তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৮৩ সালে সরকারী উদ্যোগে রাজশাহীতে এবং ১৮৮৭ সালে কুচবিহারে মহারাজার উদ্যোগে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অবস্থায় কুন্ডির জমিদার মৃত্যূজয় রায় চৌধুরী রংপুরে একটি কলেজ স্থাপনের জন্য ২৫ বিঘা জমি দান করেন। ১৯১৩ সালে তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল রংপুরে এলে তাকে একটি নাগরিক সম্বর্ধনা দেয়ার মাধ্যমে রংপুরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুরোধ জানানো হয়। তিনি রাজি হয়ে শর্ত হিসেবে তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহের আহবান জানান। ১৯১৬ সালের মধ্যে চার লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয় এবং এ বছরের ১০ নভেম্বর কলেজটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন অবিভক্ত বাংলার গভর্ণর লর্ড টমাস ডেভিড ব্যারণ কারমাইকেল। তাঁরই নামানুসারে উক্ত কলেজের নামকরণ করা হয় কারমাইকেল কলেজ। ১৯৪৭-৫৩ সাল পর্যন্ত কলেজটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৯৫৩ সালে কলেজটি সরকারী করেন। বর্তমান কলেজটি ১৪টি বিষয় অনার্স সহ মোট ১৫ টি বিষয়ে মাষ্টার্স কোর্স চালু রয়েছে।

দ্রঃ মুঃ শফিকুল ইসলাম মাসুদ(সম্পাঃ) , *ছাত্র সাংবাদ*, জুলাই ,২০০৪, পৃঃ ৩৩-৩৪।

২৪. নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃঃ ৪৩।

২৫. তদেব।

২৬. তদেব।

২৭. আব্দুস শহীদ নাসিম (সম্পাঃ), *আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃঃ ১২; অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, *স্মৃতির পাতায় জননেতা আব্বাস আলী খান*, পৃঃ ৯।

বৈবাহিক অবস্থা

১৯৩৭ সালে আব্বাস আলী খান ফুরফুরা শরীফের পীর আব্দুল হাই সিদ্দিকী[২৮] (র) এর সিলসিলার খলিফা হযরত শাহ সুফী আলহাজ্ব সায়েম উদ্দীন[২৯] আহমদ-এর একমাত্র কন্যা খাদিজা খাতুন[৩০] কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন।[৩১] তাঁর শশুর বাড়ী জয়পুরহাট শহর থেকে দুই মাইল পশ্চিমে খনজনপুর নামক গ্রামে অবস্থিত।[৩২] খান সাহেবের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। একমাত্র কন্যা খান জেবুউন্নেছা চৌধুরী আজও জীবিত আছেন।

---

২৮. **আব্দুল হাই সিদ্দিকী (র): (১৯০৩-১৯৭৭)** একজন 'আলিম, পীর ও সমাজকর্মী ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবু নসর মুহাম্মদ আব্দুল হাই। পশ্চীম বঙ্গের হুগলী জেলার ফুফুরায় তাঁর জন্ম। পিতার নাম শাহ সুফী আবু কবর সিদ্দিকী (র)। তিনি হযরত আবু বকর (রা) এর বংশধর ছিলেন বলে জানা যায়। আব্দুল হাই কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ ছাড়াও বিভিন্ন মাওলানার নিকট ইসলাম ধর্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং কঠোর সাধনা দ্বারা কামালিয়াত ও খেলাফাত লাভ করেন। পিতার মৃত্যুর (১৯৩৯) পর তিনি ফুরফুরা পীরের গদীনশীন হন। বড় হুজুর নামে তিনি সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন।
দ্র: সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলা পিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, ১ খণ্ড (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রী:), পৃ: ১৯৬।

২৯. **সূফী সায়েম উদ্দিন আহমদ:** তিনি ১৮৯৩ সালে বগুড়া জেলার ক্ষেতলাল থানার অন্তর্গত বিনাই গ্রামে এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে আরবী শিক্ষা করেন। এর পর তিনি বাংলা শিক্ষার জন্য একটি পাঠশালায় ভর্তি হন। কিছু দিন পর গোপীনাথপুর মধ্য ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন। যথা সময়ে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি রংপুর নর্মাল স্কুলে ভর্তি হয়। নর্মাল শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর বিধ্যানুরাগ, ভাষার পান্ডিত্য, শিক্ষা প্রদানে সহজ ও সুন্দর প্রণালী দেখে গভর্ণমেন্ট তাঁকে ইন্সপেকটিং পন্ডিতের পদে নিযুক্ত করে খুলনা জেলায় প্রেরণ করেন। কিন্তু খুলনার আবহওয়া তাঁর স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হওয়ায় তিনি চাকুরী থেকে ইস্তফা দিয়ে রংপুর জেলার হারাগাছা মাদ্রাসায় চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯৩৩ সালে পীরের অনুমতি নিয়ে হজ্ব পালন করেন এবং প্রত্যাবর্তন কালে দিল্লী, আগ্রা, আজমীর শরীফ প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন ওয়ালী দরবেশদের মাজার জিয়ারাত করেন। পীর সাহেব তাঁকে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ইসলামী তাবলীগ করার নির্দেশ দিলে তিনি চাকুরী থেকে অবসর নেন। শৈশবকাল থেকে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন এবং কোন ঘুষখোর লোকের বাড়ীতে আহারও করতেন না। ১৯৩৭ সালে ২য় বার এবং ১৯৪৭ সালে ৩য় বারের মত হজ্ব পালন করেন। ১৯৪৮ সালে রাত ৯ টায় ৬৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।
দ্র: নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৫০-৫৪।

৩০. আব্বাস আলী খানের সহ-ধর্মীনী বেগম খাদিজা খাতুন পর্দানশীন ও পরহেজগার মহিলা ছিলেন। তিনি প্রতিদিন অনেক রাত জেগে নামাজ পড়তেন, কুর'আন শরীফ তেলাওয়াত করতেন এবং হাদিস পড়তেন বলে জানা যায়। তিনি একাধারে প্রায় দশ বছর যাবৎ প্যারালাইসিসে ভুগছিলেন। ১৯৯৫ সালের ৯ এপ্রিল রোববার সকাল ৯টা ১১মি: তিনি ইন্তিকাল করেন। তা'লীমুল ইসলাম একাডেমী মাঠে জানাযা শেষে খান সাহেবের পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।
দ্র: আব্দুস শহীদ নাসিম (সম্পা:), *আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃ: ১৪৮; নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ১৭৬।

৩১. অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, *স্মৃতির পাতায় জননেতা আব্বাস আলী খান*, পৃ: ৯।

৩২. এস, এম, আনসার আলী, *বাড়ীর পাশে আরশী নগর*, জয়পুরহাট, ১৯৯৯ খ্রী:, পৃ: ২৭; নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৫০।

কর্ম জীবন

রংপুর জেলার দারোয়ানী স্কুলে হেড মাষ্টার হিসাবে যোগদান

আববাস আলী খানের কর্মজীবন শুরু হয় মহান শিক্ষাকতার মধ্য দিয়ে । ১৯৩৫ সালে বি. এ. পাশ করার পর সর্বপ্রথম এক বন্ধুর অনুরোধে রংপুর জেলার দারোয়ানী স্কুলে তিনি হেডমাষ্টার পদে যোগদান করেন।[৩৩] কিন্তু বেশী দিন তিনি এ পদে চাকুরী করার সুযোগ পাননি। কারণ চাকুরী গ্রহণের মাত্র ৪৫ দিন পর বাড়ী থেকে চিঠি পেলেন। যে চিঠিতে লেখা ছিল পত্র পাওয়া মাত্র চাকুরী ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে চলে যেতে হবে। তিনি সেই মোতাবেক যথারীতি স্কুল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে চাকুরী থেকে ইস্তফা দিয়ে বাড়ীতে চলে আসেন।[৩৪]

ইবি আর অফিসে চাকুরী

খান সাহেব বি. এ. পাশ করার পর আরো উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করার জন্য কলিকাতা গমন করেন।[৩৫] কিন্তু বাড়ী থেকে গার্জিয়ান সাফ জানিয়ে দেন তাঁকে লেখা-পড়ার কোন খরচ বাড়ী হতে দিতে পারবেন না বরং চাকুরী করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়। নির্দেশ অনুযায়ী পড়া-শুনা বাদ দিয়ে খান সাহেব চাকুরীর জন্য এ অফিস ও অফিস ঘোরা-ঘুরি শুরু করেন।[৩৬] কিন্তু সে সময় চাকুরী পাওয়া খুবই কঠিন ছিল। ঘুরতে ঘুরতে একদিন তিনি কয়লাঘাট ই. বি. আর অফিসে "আই এ আব্বাসী" লেখা একটি নেম প্লেট দেখে ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁর দর্শন লাভের আশায় থাকলেন। অবশেষে ভিজিটিং স্লিপ ফেরত এল। তাতে লেখা রয়েছে "সরি! নো ভ্যাকান্সি"। নৈরাশ্য আর দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন হয়ত মুসলমান বলেই তাকে "আই এ আব্বাসী" সাহেব চাকুরীটা দিলেন না। কিন্তু এতে তিনি ধৈর্য্য হারা হননি। বরং অন্য আরেক দিন এক নেম প্লেট দেখলেন "জে. সি. মোস্তাফী"। ভাগ্যের পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন। তার সাথে সাক্ষাৎ হলো। চার দিন পর সত্যি সত্যিই তিনি ই. বি. আর অ্যাকাউন্টস অফিসে চাকুরী পেয়ে গেলেন। যথা সময় তিনি মোস্তাফী সাহেবের নিকট থেকে নিয়োগপত্র নিয়ে অফিসের বড় বাবু হেডক্লার্কের নিকট জমা দিয়ে চাকুরীতে যোগদান করেন।[৩৭] কিন্তু এ চাকুরীতেও তিনি

---

৩৩. আব্বাস আলী খান, *স্মৃতির সাগরের ঢেউ*, পৃঃ ১১৫।

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৫-১১৭।

৩৫. আব্দুস শহীদ নাসিম (সম্পাঃ), *আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃঃ ১২।

৩৬. নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃঃ ৪৬।

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৭।

বেশী দিন স্থায়ী হতে পারেননি। কারণ এ অফিসের বড় বাবুটি ছিল ভীষন খাট্টা প্রকৃতির লোক। তাঁর অধীনে খান সাহেবের চাকুরী করা সম্ভব ছিল না বিধায় তিনি এ চাকুরী থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন।[৩৮]

বন বিভাগে চাকুরী

ই. বি. আর অ্যাকাউন্টস অফিসের চাকুরী থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর খান সাহেব বি. টি. পড়ার জন্য ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হন। বি. টি. পড়াকালীন সময় তিনি চাকুরী খালির বিজ্ঞাপন দেখলেই দরখস্ত করতেন। বি. টি. পরীক্ষার কয়েক মাস আগে ১৯৩৬ সালের শেষের দিকে ভাগ্যক্রমে বন বিভাগের হেড অফিসে একটা চাকুরীর সুযোগ হলো। বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের পরামর্শে তিনি বি. টি. পড়া বাদ দিয়ে বন বিভাগের চাকুরীতে যোগদান করেন।[৩৯] ফরেষ্ট অফিসে প্রবেশ করেই তিনি জানতে পারলেন ফরেষ্ট অফিসার বি. টি. মিকর জোন আই. এফ. এস. এর গোটা অফিসটি দার্জিলিং এ ট্রান্সফার করেছেন। বাধ্য হয়ে তিনি দার্জিলিং-এ চলে এলেন।[৪০] শুধু চাকুরী করার উদ্দেশ্যে তিনি দার্জিলিং এ আসেন নি। তাই মাত্র ছয় মাস চাকুরী করার পর ১৯৩৭ সালের ১০ আগষ্ট তিনি এ চাকুরী থেকে ইস্তফা দিয়ে দার্জিলিং ত্যাগ করেন।[৪১]

বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে চাকুরী

১৯৩৭ সালে দার্জিলিং থেকে প্রত্যাবর্তনের পর খান সাহেব মিলিটারী সার্ভে অব ইণ্ডিয়া অফিসে এক বছর চাকুরী করে বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে যোগদান করেন। এ সময় বাংলার গভর্ণর জন আর্থার হার্বাট এবং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক।[৪২] ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি এ সরকারী চাকুরীতে কর্মরত ছিলেন। সে সুবাদে তিনি অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হকের ব্যক্তিগত সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন।[৪৩] দেশ বিভাগের সময় ১৯৪৭ সালে ১৪ ই আগষ্ট তিনি সহ

---

৩৮. তদেব।

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৯।

৪০. তদেব।

৪১. দার্জিলিং ত্যাগ করা প্রসংগে খান সাহেব তাঁর স্মৃতি সাগরের ঢেউ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন দার্জিলিং এসেছিলাম ঠিক চাকুরীর উদ্দেশ্যে নয়। আর এখানে টিকে থাকাও বড় কঠিন ছিল। বন বিভাগের ১১টি ফরেস্ট ডিভিশনে মুসলমান কর্মচারী ছিল মাত্র একজন অ্যাকাউন্টেন্ট, ১ জন টাইপিষ্ট। অ্যাকাউন্ট শেকসনে সাময়িক ভাবে ৫ জন লোক নেয়া হলো তাদের মধ্যে ৩ জন বি. এ. এবং ২ জন এম. এ.। শেষের ২ জনের মধ্যে ১ জন অমুসলিম। তাছাড়া সব সময় বড় অসদাচরণ ও খিচ-মিচ সহ্য করতে হতো। তাই বাধ্য হয়ে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে দার্জিলিং ত্যাগ করলাম। দ্র: আব্বাস আলী খান, *স্মৃতি সাগরের ঢেউ*, পৃ: ৩৭; নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৬২।

৪২. নাজমুস সায়াদাত , *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৬৩; আব্বাস আলী খান, *স্মৃতি সাগরের ঢেউ*, পৃ: ৫৬।

৪৩. আব্দুস শহীদ নাসিম (সম্পা:) , *আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃ: ১২।

১৪ জন অফিসার ঢাকায় চলে আসেন। এ সময় তাঁকে সার্কেল অফিসার পদে নিয়োগ দেয়া হলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে চাকুরী থেকে ইস্তফা দেন।[৪৪]

জয়পুরহাট হাই স্কুলে চাকুরী

১৯৫২ সালের শেষের দিকে খান সাহেব জয়পুরহাট সরকারী হাই স্কুলে হেড মাষ্টার পদে যোগদান করেন। স্কুলটির বর্তমান নাম জয়পুরহাট রামদেও বাজলা সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সংক্ষেপে আর. বি. সরকারী হাই স্কুল। ১৯৭৭ সালের ১ জুন এটি জাতীয়করণ করা হয়।[৪৫] খান সাহেবের পূর্বে এ স্কুলটিতে আরো চারজন হেড মাষ্টার চাকুরী করেছেন। তিনি ছিলেন ৫তম হেড মাষ্টার। তাঁর যোগদানের পূর্বে স্কুলটির অবস্থা অত্যন্ত সোচনীয় ছিল। কারণ বছরের মাঝা-মাঝি সময় হেড মাষ্টার মশাই স্কুল ফাণ্ডের মোটা অংকের টাকা মেরে সীমান্ত পার হয়ে চলে যান। বাধ্য হয়ে স্কুল কমিটি খান সাহেবকে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলে তিনি দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করেন। কিন্তু কমিটির সভাপতি তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুরোধে তিনি হেড মাষ্টারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৪৬] দায়িত্ব গ্রহণের পর খান সাহেব নিজের মেধা, যোগ্যতা এবং সহ-কর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতায় স্কুলটিকে সর্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৫৩ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় শতকরা ৭৮ জন ছাত্র পাশ করার গৌরব অর্জন করে।[৪৭] দীর্ঘ ৫ বছর হেড মাষ্টারী চাকুরী করার পর ১৯৫৬ সালের শেষে নিজ সংগঠন জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে চাকুরী ছাড়ার নির্দেশ হলে তিনি স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা, মেট্রিক টেষ্ট পরীক্ষাসহ যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে কাউকে কিছু না জানিয়ে চাকুরী থেকে ইস্তফা দেন। স্কুলের ম্যানিজিং কমিটির সেক্রেটারী ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ একমাস ধরে অনেক অনুনয়-বিনয় করেও ইস্তফা পত্র প্রত্যাহার করাতে না পেরে অবশেষে তা গ্রহণ করেন।[৪৮]

---

৪৪. চাকুরী থেকে ইস্তফা দেয়ার খবর তাঁর শশুরের নিকট পৌছালে প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন এতদিন তো মানুষের চাকুরী করলে, এখন খোদার চাকুরীতে যোগ দাও।
দ্রঃ আববাস আলী খান, *স্মৃতি সাগরের ঢেউ*, পৃঃ ১০৩; অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, *স্মৃতির পাতায় জননেতা আব্বাস আলী খান*, পৃঃ ১১।

৪৫. নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃঃ ৬৮।

৪৬. তদেব।

৪৭. আববাস আলী খান, *স্মৃতি সাগরের ঢেউ*, পৃঃ ১১৭।

৪৮. খান সাহেব বলেন, ইস্তফা পত্র বিবেচনার জন্য ম্যানেজিং কমিটির পক্ষ থেকে আমাকে অনুরোধ করা হলো। কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকায় বাধ্য হয়ে তারা আমার ইস্তফা পত্র মঞ্জুর করেন।
দ্রঃ আববাস আলী খান, *স্মৃতি সাগরের ঢেউ* ,পৃঃ ১৩৩।

হিলি স্কুলে হেড মাষ্টার হিসেবে যোগদান

১৯৫৮ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খান সামরিক আইন জারীর মাধ্যমে সংবিধান বাতিল ও মন্ত্রীসভা বিলুপ্ত ঘোষণা করে সকল রাজনৈতিক দলের প্রকাশ্য কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেন।[৪৯] যার কারণে খান সাহেব স্রেফ বেকার জীবন কাটাচ্ছিলেন। ১৯৫৯ সালের শেষের দিকে তৎকালীন দিনাজপুর জেলার হিলি হাই স্কুলের সেক্রেটারী তাঁর স্কুলে হেড মাষ্টর হিসেবে যোগদান করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধে খান সাহেব হিলি হাই স্কুলে যোগদান করেন।[৫০] ১৯৬২ সালে ১৫ জুলাই জাতীয় পরিষদে "Political parties act" পাশের ফলে সকল নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল গুলো পুণরায় কার্যক্রম শুরু করেন। এ সময় খান সাহেব হাই স্কুলের হেড মাষ্টারীর চাকুরী ছেড়ে দিয়ে পুনরায় সাংগঠনিক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন।[৫১] মৃত্যু পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত তিনি আর কোন চাকুরী করেননি।

জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান

বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের চাকুরী থেকে ইস্তফা দেয়ার পর তিনি ফুরফুরা শরীফের পীর আব্দুল হাই সিদ্দিকের সান্নিধ্যে আসেন। পরবর্তীতে জয়পুরহাট হাই স্কুলে চাকুরী করার পাশা-পাশি তিনি পীরের নিকট থেকে নিয়মিত সবক নিতেন। সত্যকে জানার জন্য এবং সত্যকে মানার আগ্রহ থেকে তিনি এক পর্যায় ইলমে তাসাউফের প্রতি আকৃষ্ট হন।[৫২] তারপরও তাঁর মনের মাঝে একটা শূন্যতা সর্বদা বিরাজ করত। ইসলাম সম্পর্কে জানার তাঁর অদম্য আগ্রহ সব সময় ছিল। তাই তিনি উর্দুতে লেখা বিভিন্ন বই কিনে পড়তেন। ফলে তাঁর জ্ঞানের জগত সমৃদ্ধ হতে থাকে। এ সময় "কুর'আনের আলো" নামে এক খানা বই তিনি লিখেছিলেন।[৫৩] ১৯৫৪ সালে ডিসেম্বরে কড়ই 'আলিয়া মাদ্রাসায় এক "ইসলামী জলসায়" তিনি তৎকালীন রংপুর কারমাইকেল কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক গোলাম আযমের আলোচনা শোনেন। সে দিন অধ্যাপক গোলাম আযম কলেমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যা করছিলেন। গোলাম আযমের মুখে কলেমা তাইয়্যেবার আলোচনা শুনে খান সাহেব দারুন ভাবে প্রভাবিত হন। এ আলোচনাই মুলতঃ খান সাহেবের জীবনে আমূল পরিবর্তন আনে।[৫৪] আলোচনা শেষে তিনি গোলাম আযম সাহেবের সাথে

---

৪৯. নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৮৪।

৫০. তদেব, পৃ: ৮৫।

৫১. আববাস আলী খান, *স্মৃতি সাগরের ঢেউ*, পৃ: ২৪৭; নাজমুস সায়াদাত, আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম, পৃ: ৯৪।

৫২. নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৯৪।

৫৩. অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, *স্মৃতির পাতায় জননেতা আব্বাস আলী খান*, পৃ: ১২; নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৬৮।

৫৪. নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৬৯; আব্দুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত, *আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃ: ১২।

ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করেন। এ সময় তিনি খান সাহেবকে জামায়াতে ইসলামীর[৫৫] দাওয়াত[৫৬] দেন এবং সাথে মাওলানা মওদূদী (র)-এর লিখিত কিছু বই তাঁকে পড়তে দেন। সেই সাথে তৎকালীন বগুড়া শহরের জামায়াতের আমীর[৫৭] শায়েখ আমিন উদ্দীনের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন। কিছু দিন পর খান সাহেব শায়েখ আমিন উদ্দীনের সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি তাঁকে জামায়াতে ইসলামীর একটি মুত্তাফিক[৫৮] ফরম দিয়ে তা পুরণ করে তাঁর নিকট পৌছার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি যথারীতি ফরম নিয়ে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৯৫৫ সালে ১ জানুয়ারী শুক্রবার বাদ ফজর কুর'আন তেলাওয়াতের পর উক্ত মোত্তাফিক ফরমটি পূরন করে তিনি ডাক যোগে শায়েখ আমিন উদ্দীনের নিকট

---

৫৫. আল্লাহর জমীনে আল্লাহর প্রেরিত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন আল-ইসলামকে পরিপূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে পরিচালিত যে আন্দোলন, চেষ্টা চরিত্র, সাধনা ও সংগ্রাম করার জন্য যে জামায়াত বা দল তাই জামায়াতে ইসলামী। জামায়াত একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন। বাতিল মতবাদ, চিন্তাধারা ও জীবন বিধান খতম করে এবং তার অন্তঃসারশূন্যতা ও অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করে তার পরিবর্তে মানব জাতির জন্য আল্লাহর দেয়া একমাত্র জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই ইসলামী আন্দোলন এবং এ আন্দোলনের পতাকাবাহী জামায়াতে ইসলামী। প্রকৃত পক্ষে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। বরং এ ছিল মাওলানা মওদূদী (র)-এর দীর্ঘ বাইশ বছরের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, গভীর অধ্যয়ন ও চিন্তা গবেষণার ফসল। যা পরিকল্পনার রূপ ধারণ করে এবং সে পরিকল্পনার ভিত্তিতে ১৯৪১ সালে ৭৫ জন 'আলিমের সমন্বয় জামায়াতে ইসলামী গঠিত হয়।

দ্রঃ আব্বাস আলী খান, *জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, ১৯৯৬ খ্রীঃ), পৃঃ ১১, ৭১।

৫৬. দা'ওয়াত 'আরবী শব্দ। যার অর্থ আহবান করা, ডাকা, নিমন্ত্রণ করা। আল কুর'আনে দা'ওয়াত শব্দটি কয়েকটি মৌলিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,

ক. মানুষের প্রযোজন পূরনের জন্য আল্লাহর নিকট আহবান।

যেমনঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী, هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

-'সেখানে দাড়িয়ে হযরত যাকারিয়া (আ) দু'আ করলেন, হে আমার প্রভূ! তোমার পক্ষ থেকে আমাকে একটি পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয় তুমি দো'য়া শ্রবনকারী'।

দ্রঃ সূরা আলে-'ইমরানঃ ৩ :৩৮।

খ. 'ইবাদত করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ

দ্রঃ সূরা আল আন-আন'আমঃ ৬ : ৫২।

গ. আল্লাহর দিকে ডাকা। আল্লাহ তা'আলার বাণী,

যেমন, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

-'তার কথার চাইতে আর কার কথা উত্তম হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করে, ভাল কাজ করে এবং নিজ ঘোষণা করে আমি একজন মুসলমান'।

দ্রঃ সূরা হা-মীম আস-সিজদাঃ ৪১ : ৩৩।

পরিভাষায়ঃ দা'ওয়াতের অর্থ আল্লাহর প্রেরীত রিসালাতের দিকে মানুষকে আহবান জানানো।

দ্রঃ ডঃ আবুল কালাম পাটওয়ারী, *রাসুল (সা)-এর দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম* (কুষ্টিয়াঃ আল-হেলাল প্রিন্টিং প্রেস, ২০০২ খ্রীঃ), পৃঃ ১-২।

৫৭. আমীর একটি মর্যাদা সূচক উপাধি। মুঘল বা মুঘল পূর্ব যুগে এ উপাধি মুসলিম রাষ্ট্রের একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাকে দেয়া হতো। মুসলিম অভিযাত সমাজে আমীর উপাধি সিপাহসালার এবং মালিকের অবস্থানে ছিল। সে অনুযায়ী জামায়াতে ইসলামীর প্রধান পদ যিনি দখল করেন তাকে আমীর বলা হয়।

দ্রঃ সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলা পিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, ৩য় খণ্ড, পৃঃ২৩৭।

৫৮. মুত্তাফিক শব্দটি 'আরবী। যার অর্থ সমর্থন বা সহযোগী। যদি কোন মানুষ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মসূচী ও কর্মনীতির সাথে একমত ঘোষণা করেন তখন তাকে একটি ফরম পূরণ করতে হয়। এ ফরমকে 'আরবীতে মুত্তাফিক ফরম বলে। আর যিনি পূরণ করেন তাকে মুত্তাফিক বলে।

পাঠিয়ে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থক হিসেবে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন।[৫৯] খান সাহেব এ খবর তাঁর আধ্যাত্মিক পীর আব্দুল হাই সিদ্দিকী (র)-কে অবহিত করেন এবং এ সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, দাওয়াত ও কর্মসূচী সম্পর্কেও তাঁকে অবহিত করেন। পীর সাহেব তাঁর বক্তব্য ধৈর্য্যসহকারে শোনার পর বললেন, বাবা এটাই তো আসল কাজ, আমি এ উদ্দেশ্যেই লোক তৈরী করছি। তুমি জান-মাল দিয়ে এ কাজ করে যাও।[৬০]

বিদেশ সফর

আব্বাস আলী খান আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন[৬১] ও সংস্থার আহবানে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অনেক গুলো দেশ সফর করেছেন। এর মধ্যে ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, জাপান, প্যারিস, ফ্রান্স, লিবিয়া, সৌদি আরব, কুয়েত, ভারত ও পাকিস্তান অন্যতম।[৬২] এ সময় তিনি বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দর্শণীয় ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ বিশেষ করে বৃটিশ মিউজিয়াম ও বৃটিশ লাইব্রেরী,[৬৩] বৃটিশ পার্লামেন্ট ভবন,[৬৪] নিউইয়ার্ক শহর,[৬৫] ....

---

৫৯. আব্দুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত, *আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃঃ ১৩; আববাস আলী খান, *স্মৃতি সাগরের ঢেউ*, পৃঃ ১৩৩।

৬০. তদেব।

৬১. সংগঠন-এর 'আরবী রুপ হলো "جماعة" ; বিশেষ উদ্দেশ্যে একদল লোকের ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও সুশৃংখল উপায়ে ঐ উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টায় নিয়জিত থাকাকে সংগঠন বলে। যেমনঃ হাজার হাজার লোক আলাদা ভাবে একই জায়গায় নামাজ পড়লেও এর নাম জামায়াত নয় বরং একই নামাজ একদল লোক এক ইমামের পিছনে সুশৃংখল ভাবে আদায় করলেই তাকে জামা'য়াত বলে গন্য করা হবে।
দ্রঃ অধ্যাপক গোলাম আযম, *স্টাডি সার্কেল* (ঢাকাঃ আধুনকি প্রকাশনী, ১৯৯৩ খ্রীঃ), পৃঃ ১১৪।

৬২. অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপথিক যারা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪।

৬৩. ১৯৮৪ সালের ১৭ ই জুলাই আব্বাস আলী খান পৃথিবীর বৃহত্তম যাদুঘর বৃটিশ মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দিতে এ বৃহত্তর যাদু ঘরটি নির্মিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাচীনতম ধ্বংসাবশেষ এখানে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। প্রাচীন কালের বর্ণলিপির মধ্যে হযরত 'ওসমান (রা)-এর অনুমোদিত আল-কুর'আনের একখানা কপিও সংরক্ষিত আছে। বৃটিশ মিউজিয়ামের উল্লেখযোগ্য অংশ হলো বৃটিশ লাইব্রেরী। পৃথিবীর বৃহত্তম লাইব্রেরীর মধ্যে এটা অন্যতম। এ লাইব্রেরীতে মোট ৭টি বিভাগ রয়েছে। ক. রেফারেন্স বিভাগ খ. ছাপানো গ্রন্থ বিভাগ গ. পাণ্ডু লিপি বিভাগ ঘ. প্রাচ্যের পাণ্ডুলিপি ও ছাপানো গ্রন্থ বিভাগ ঙ. ইণ্ডিয়া অফিস, লাইব্রেরী ও রেকর্ড চ. বিজ্ঞানের রিফারেন্স বিভাগ ছ. নির্বাচিত গ্রন্থ বিবরণী বিভাগ। ১৭৫৩ সালে বৃটিশ মিউজিয়াম এ্যাক্ট অনুসারে এ লাইব্রেরীটি নির্মিত হয়। অনেক দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ, পান্ডুলিপি, ম্যাপ এখানে রক্ষিত আছে। বর্তমানে লাইব্রেরীতে এক কোটির বেশী বই রয়েছে।
দ্রঃ আব্বাস আলী খান, *যুক্তরাজ্যে একুশ দিন* (ঢাকাঃ আল ইহসান প্রকাশনী, ১৯৮৫ খ্রীঃ), পৃঃ ৩১; নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃঃ ১৩৮-১৪০।

৬৪. লণ্ডন শহরের উপর দিয়ে প্রবাহিত ল্যাম্বেথ ব্রীজ এবং তার পূর্ব দিকে একটু দূরে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ব্রীজ। এ দু'টি ব্রীজের মধ্যবর্তী স্থানে নদীর দক্ষিণ ধারে ল্যাম্বেথ প্যালেস এবং উত্তর ধারে পার্লামেন্ট হাউজ। হাউস অব কমান্সের একটু খানি উত্তর পশ্চিমে হাউস অব লর্ডস অবস্থিত। লর্ডস সভা ও কমন্স সভার সমন্বয়ে বৃটেনের পার্লামেন্ট গঠিত।
দ্রঃ ড. এমাজ উদ্দীন আহম্মদ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা*, পৃঃ ৫২৬-৫২৭; আব্বাস আলী খান, *যুক্তরাজ্যে একুশ দিন*, পৃঃ ৪৯-৫০।

৬৫. নিউয়ার্ক শহর পরিদর্শনের সময় জনাব খান ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে সন্ত্রাসী হামলায় ধ্বংস প্রাপ্ত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এর ১২০ তলায় ওঠেন এবং ১২০০ ফুট ওপর থেকে গোটা নিউইয়ার্ক শহর উপভোগ করেন।
দ্রঃ আব্বাস আলী খান, *বিদেশে পঞ্চাশ দিন* (ঢাকাঃ শৌমী প্রকাশনী, ২য় সং, ১৯৯৭ খ্রীঃ), পৃঃ ২১।

ওয়াশিংটন শহর,[৬৬] গ্লাসগো শহর,[৬৭] এবং নায়গ্রা জলপ্রপাত[৬৮] প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন।[৬৯] এছাড়া তিনি একাধিকবার হজ্ব[৭০] ও 'ওমরাহ[৭১] পালন করেন।[৭২]

কারাবরণ

১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারী তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার আববাস আলী খানকে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করেন। দীর্ঘ ৬৭৯ দিন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তিনি কারাজীবন অতিবাহিত করেন।[৭৩] ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে জামায়াতের নেতা-কর্মীদের উপর স্বাধীনতাত্তোর বিভিন্ন নির্যাতন ও জেল জুলুমের অংশ হিসেবে তাঁকে এ কারাবরণ করতে

---

৬৬. আমেরিকার ওয়াশিংটন শহরে বাংলাদেশীদের পক্ষ থেকে খান সাহেবকে সম্বোর্ধনা দেয়া হয়। এ সময় তিনি বাংলাদেশীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। সম্বোর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে তিনি পুরা ওয়াশিংটন শহরের মনোরম দৃশ্যাবলী স্বচক্ষে অবলোকন করেন।
দ্রঃ নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃঃ ১৫৯।

৬৭. স্কটল্যান্ডের একটি বড় শহর গ্লাসগো শহর। লণ্ডনের পরে যুক্তরাজ্যের তৃতীয় বা চতুর্থ বৃহত্তম শহর গ্লাসগো। এ শহরে পৌছে খান সাহেব বিশ্ব বিখ্যাতহ্রদ, লেক-ক্যান্টিন পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি গ্লাসগোর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ঘুরে দেখেন।
দ্রঃ আব্বাস আলী খান, *যুক্তরাজ্যে একুশ দিন*, পৃঃ ৩১।

৬৮. কানাডায় সফর কালে আব্বাস আলী খান বিশ্ববিখ্যাত নায়াগ্রা জল প্রপাত পরিদর্শন করেন। এটি নায়াগ্রা নদীর এক কিনারায় অবস্থিত।
দ্রঃ আব্বাস আলী খান, *বিদেশে পঞ্চাশ দিন*, পৃঃ ৩৫; নাজমুস সায়াদাত , *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃঃ ১৬৪।

৬৯. তদেব, পৃঃ ১৭১-১৭২।

৭০. 'হজ্জ' শব্দের আভিধানিক অর্থ সংকল্প করা, কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা করা। ইসলামী বিধান মতে হিযরী সনের যিলহজ্জ মাসের নির্দিষ্ট তারিখে আরাফার ময়দানে অবস্থান, মক্কায় অবস্থিত কাবা ঘর প্রদক্ষিণ ও অন্যান্য কতিপয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করাকে হজ্জ বলা হয়। হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সময়ে হজ্জ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। যা এখনো চালু আছে। সমগ্র মুসলিম বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মুসলমান প্রতি বছর হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় সমবেত হন। হজ্জ বিশ্বমুসলিমের জন্য এক মহা মিলন কেন্দ্র। হজ্জের সময় তারা পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় ও শুভেচ্ছা আদান প্রদানের সুযোগ পান। ঐক্য ও আত্ম বিশ্বাসের চেতনায় উজ্জিবিত হন। বিত্তমান সকল মুসলমানের ওপর হজ্জ করা ফরজ।
দ্রঃ আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য (সম্পাঃ), *শিশু বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড (ঢাকাঃ বাংলাদেশ শিশু একাডেমী , ১৯৯৭ খ্রীঃ), পৃঃ ৪৮; মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী, *আসান ফেকাহ*, ২য় খণ্ড (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রীঃ), পৃঃ১৪৯-১৫০; আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ, *ইসলামে হজ্জ ও 'ওমরা* (ঢাকাঃ কামিয়াব প্রকাশন, ২০০৪ খ্রীঃ), পৃঃ ৫৯, ৬১; আব্দুর রহমান আল জাযায়েরী, *কিতাবুল ফিকহে আলা-মাযাহিবিল 'আরবা*, ১ম খণ্ড (কায়রোঃ আল মাকতাবাতুস সাকাফী, ২০০০ খ্রীঃ), পৃঃ ৪৮১।

৭১. 'ওমরাহ শব্দের অর্থ প্রতিষ্ঠিত গৃহের যিয়ারাত করা এবং শরী'আতের পরিভাষায় 'ওমরাহ অর্থ ছোট হজ্জ যা সবসময় হতে পারে। তার জন্য কোন মাস ও কোন দিন নির্ধারিত নেই। যখনই মন চাইবে ইহরাম বেধে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে, সা'য়ী করবে এবং মস্তক মুণ্ডন বা চুল কেটে ইহরাম খুলবে। ওমরাহ হজ্জের সাথে করা যায় এবং আলাদা করা যায়।
দ্রঃ মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী, *আসান ফেকাহ*, ২য় খণ্ড , পৃঃ ২০৯।

৭২. অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, *বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপথিক যারা*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২।

৭৩. তদেব।

হয়।[৭৪] জেল খানায় যে সেলে খান সাহেব থাকতেন সে সেলের বর্ণনায় "শিকল পরা দিনগুলো" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে "সেল এ্যারিয়ার সেলে তখন থাকতেন পাকিস্তানের এক সময়ের এ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের স্পীকার মুসলিম লীগ নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরী। সাত সেল ও পুরানো বিশ সেল সহ মিলে সেল এ্যারিয়া। তখন এ সেল গুলোতে থাকতেন মুসলিম লীগ নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আব্দুস সবুর খান, পাবনার আব্দুল মতিন, পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ডেপুটি স্পীকার, আব্বাস আলী খান, মাওলানা এ. কে. এম. ইউসুফ সহ আরো অনেকে।[৭৫] এছাড়া আশির দশকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে রাজনৈতিক ময়দানে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে আপোষহীন ও বলিষ্ট ভূমিকা পালন করার কারণে তৎকালীন সরকার[৭৬] তাঁকে একাধিকবার গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করেন।[৭৭]

রচনাবলী

খান সাহেব ইসলামের মৌলিক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। পাশা-পাশি তিনি একজন ইতিহাসবিদ ও সুদক্ষ লেখক ছিলেন। তিনি ইসলামের মৌলিক বিষয়ের উপর অনেক গুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দারুণভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তিনি নিজে লিখতেন, তদুপরি অন্য ভাষার মূল্যবান গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতেও তাঁর আগ্রহ ছিল। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২০টি।[৭৮] এ ছাড়া চারটি ছোট-খাট পুস্তিকা রচনা করেন বলে জানা যায়। তাঁর রচিত গ্রন্থ গুলির শ্রেণী বিভাজনে দেখা যায়,

১. ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন সংক্রান্ত - ৭ টি।
২. জামায়াতে ইসলামী সংক্রান্ত -২ টি।
৩. স্মৃতিচারণ ও ভ্রমন কাহিনী সংক্রান্ত -৪ টি।
৪. মাওলানা মওদূদী (র)-কে নিয়ে লেখা -৪ টি।
৫. ইতিহাস সংক্রান্ত -১ টি।
৬. অন্যান্য -২ টি ।

---

৭৪. তদেব ।

৭৫. এ. বি.এম. খালেক মুজুমদার, *শিকল পরা দিনগুলো*, পৃঃ ৭৬-৭৭।

৭৬. এ সময় প্রেসিডেন্ট ছিলেন লে. জে. (অব) হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ।

৭৭. নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃঃ ১৭৩।

৭৮. অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, *স্মৃতির পাতায় জননেতা আব্বাস আলী খান*, পৃঃ ২০; আব্দুল কাইয়ুম ও অন্যান্য, *সফল যারা কেমন তারা*, পৃঃ ৩০; আব্দুস শহীদ নাসিম , *আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃঃ ২১-১৮০; অধ্যক্ষ আ. ন. ম. আব্দুস শাকুর, *বাংলা ভাষায় মাওলানা মওদূদী চর্চা ও আব্বাস আলী খানের অবদান*, পৃঃ ৮-৯; নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃঃ ২৯৩-৯৪।

এ পর্যায়ে বিষয় ভিত্তিক তাঁর গ্রন্থগুলোর তালিকা নিম্নে উল্লেখ করলাম,

ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন সংক্রান্ত

১. ঈমানের দাবী।
২. মৃত্যু যবনিকার ওপারে।
৩. ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিনন্তন দ্বন্দ্ব।
৪. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাংখিত মান।
৫. একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারন: তার থেকে বাঁচার উপায়।
৬. ইসলামী বিপ্লব একটি পরিপূর্ণ নৈতিক বিপ্লব।
৭. ইসলামী আন্দোলন ও তাঁর দাবী।

জামায়াতে ইসলামী সংক্রান্ত

১. জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস।
২. জামায়াতে ইসলামীর ইতহিাস (সংক্ষিপ্ত)

মাওলানা মওদূদীকে নিয়ে লেখা

১. মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস।
২. আলেমে দ্বীন মাওলানা মওদূদী।
৩. মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান।
৪. বিশ্বের মনীষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী।

স্মৃতিচারণ ও ভ্রমণ কাহিনী সংক্রান্ত

১. স্মৃতি সাগরের ঢেউ।
২. বিদেশে পঞ্চাশ দিন।
৩. যুক্তরাষ্ট্রে একুশ দিন।
৪. দেশের বাইরে কিছু দিন।

ইতিহাস সংক্রান্ত

১. বাংলার মুসলামদের ইতিহাস।

অন্যান্য

৮. মুসলিম উম্মাহ।
৯. সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক।

এছাড়াও তিনি আরো চারটি পুস্তিকা লিখেছিলেন তা হলো:

১. কুর'আনের আলো।
২. সুফী সাহেবের জীবনী।
৩. পাক বর্ণমালা।
৪. তালিমে তরিকাত।

আববাস আলী খান একজন দক্ষ অনুবাদক হিসেবে বিভিন্ন ভাষায় অনেকগুলো গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন তা হলোঃ

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
১.	পর্দা ও ইসলাম	মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী (র)
২.	সীরাতে সরওয়ারে আলম	"
৩.	সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং	"
৪.	বিকালের আসর	"
৫.	আদর্শ মানব	"
৬.	ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার	"
৭.	জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তি	"
৮.	ইসলামী অর্থনীতি	"
৯.	ইসরা ও মিরাজের মর্মকথা	"
১০.	মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী	"
১১.	পর্দার বিধান	"
১২.	একটি ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার	"
১৩.	ইসলামের পূর্ণাঙ্গরূপ	মাওলানা সদর উদ্দীন ইসলাহী
১৪.	আসান ফিকাহ (১ম খণ্ড)	মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী
১৫.	তাসাউফ ও মাওলানা মওদূদী	মাওলানা আবু মনজুর শায়েখ আহমদ

লেখালেখির সূচনা

খান সাহেব কলেজ পড়াকালীন মোঘল সম্রাট আকবর ও আওরঙ্গজেবের উপর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তবে এর পূর্বে "কুর'আনের আলো" নামক একটি পুস্তিকা রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্য রচনার সূচনা হয়। তাঁর একমাত্র কন্যা জেবউন্নেছা বলেন, "সুদীর্ঘ কর্মজীবনে আব্বা কখনো লেখা-পড়া কোনটাই ত্যাগ করেননি"।[৭৯]

দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক আবুল আসাদ বলেন, খান সাহেব ছিলেন ব্যস্ত রাজনীতিক। এর মধ্যেও তিনি লেখা পাঠাতেন। সেটি ছদ্ম নামে ছাপা হতো। তাঁর লেখা ছিল সুযোগ মত নয় বরং প্রয়োজন অনুসারে। দেখা গেছে এমন সব বিষয় তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতো যা অনেকেরই দৃষ্টিতে পড়তো না। তিনি এমন সব কথা লিখতেন যা অন্য কেহ এভাবে লিখত না। তাঁর সর্বশেষ লেখাটা ছিল শাসকদের এক যুলুমের ঘটনা। যে যুলুম, যে অনাচার কোন মানুষের সহনীয় বিষয় ছিলনা। এ বিষয়ের উপর অনেকে লিখেছেন, মন্তব্য করেছেন কিন্তু তাঁর লেখা ছিল ব্যতিক্রম। লেখার শেষ অনুচ্ছেদটা ছিল "এ সরকার তো এই অপরাধীদের কোন বিচার করবে না। থানায় এ সবের বিরুদ্ধে কোন মামলা করা যাবে না। কারণ

৭৯. তদেব, পৃঃ ২৯১।

অপরাধীরা সরকারী দলের লোক ও সরকার সমর্থক। কিন্তু খোদার আদালতে তো মামলা দায়ের হয়ে গেছে। হতভাগা-হতভাগিনীদের বুকফাটা হাহাকার আর্তনাদ বিফলে যাবে না"।[৮০] এ অনুচ্ছেদটি পড়লে বুঝা যায় যে, লেখাটা শুধু লেখার জন্য লেখা নয়। একান্ত হৃদয় থেকে উৎসারিত। যার ঠিকানা কোন থানা নয়, কিংবা প্রধানমন্ত্রীর দফতর নয়। তার ঠিকানা আরশুল আজিমের মালিক আল্লাহ। যার দরবারে মাজলুমের কোন ফরিয়াদ বৃথা যায় না।[৮১]

চরিত্র মাধুর্য

আব্বাস আলী খান আকর্ষণীয় চরিত্র ও অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল বিশাল। বিনয়ী, ধৈর্য্যশীল, উদার, সৎ ও সত্যনিষ্ঠ, সদালাপী, নির্লোভ, অমায়িক ব্যবহার, সুরসিক বাচন ভঙ্গি, মিতব্যয়িতা ও গতিশীল নেতৃত্ব প্রভৃতি গুণাবলী তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।[৮২] ইসলামী আন্দোলনে তিনি নিজকে উৎসর্গ করেছিলেন। সক্রিয় অংশগ্রহণ ও কলমের লেখনির মাধ্যমে তিনি ইসলামী আন্দোলনে খেদমত করেছেন। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি তাকওয়া, এখলাস, 'আদল, ইহ্সান ও 'ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে রাসূলের সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন।[৮৩] ইকামতে দ্বীনের আন্দোলনের ময়দানে তিনি সবর, ইস্তেকামাত, ত্যাগ-কুরবানী ও ইত্মীনানে কলবের দিক থেকেও তিনি অগ্রগামী ছিলেন।[৮৪] নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করতেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদসহ নফল নামাজ গুরুত্বের সাথে আদায় করতেন। ৮৫ বছর বয়সেও তিনি বিশ রাকাত তারাবীহ নামাজ আদায় করতেন। তিনি মাঝে মাঝে নফল রোজা রাখতেন এবং প্রতি সপ্তাহে একটি রোজা রাখার অভ্যাস করেছিলেন।[৮৫] সর্বদা সত্য কথা বলতেন। কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। তিনি কখনো কথাকে না ঘুরিয়ে, না পেচিয়ে সরাসরি সহজ ভাবে বলতেন। এমনকি কৃত্রিম কথাও বলতেন না। ওয়াদা ভংগ করতেন না এবং কাউকে মন্দ কথা ও কটুকথা বলতেন না। বক্তৃতা কিংবা ব্যক্তিগত আলাপ চারিতায় কখনো কারো ব্যাপারে অশালীন ও রুচীহীন কথা উচ্চারণ করতেন না। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে গালি গালাজ করা তাঁর স্বভার বিরোধী ছিল। কখনো কারো মর্যাদাহানীকর বা মানহানীকর কথা বলতেন না। সবাইকে সম্মানজনক সম্বোধন করতেন।[৮৬] তিনি খুবই বলিষ্ট ও স্পষ্ট ভাষায় বক্তব্য দিতে পারতেন। সর্বদা কম কথা বলতেন। বেশী সময় নিরব থাকতেন। অর্থবহ কথা বলার চেষ্টা করতেন। তাঁর আলোচনা ছিল হৃদয়গ্রাহী, জ্ঞান-গর্ভ ও শিক্ষণীয়।[৮৭] ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুবই

---

৮০. নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃঃ ২৯৫।

৮১. তদেব।

৮২. আব্দুস শহীদ নাসিম, *আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃঃ ১৭৮।

৮৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮-১৯।

৮৪. তদেব।

৮৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯।

৮৬. তদেব।

৮৭. তদেব।

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সুশৃংখল ছিলেন। ভদ্র, মার্জিত ও পরিপাটি জীবন-যাপনে অভ্যস্থ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত রুচিশীল ব্যক্তি ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও নিজের কাপড়-চোপড় নিজেই ধুতেন এবং নিজেই ইস্ত্রী করতেন। তিনি সকল কাজে নিয়মতান্ত্রিক ছিলেন। সময়ানুবর্তীতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আপোষহীন।[৮৮] তাঁর আকীদাহ ও বিশ্বাস ছিল একমুখী। তিনি আল্লাহকে রব, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একমাত্র আদর্শ মনে করতেন। ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ও গভীর ধারণা ছিল। দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতকে সবসময় অগ্রাধিকার দিতেন। তিনি ইসলাম বিদ্বেষী বড় বড় শাসক, নেতা ও রাজনীতিবিদদের নির্ভয়ে কঠোর সমালোচনা করতেন।[৮৯] ইসলামী আন্দোলনে তিনি সবর্দা সক্রিয় ছিলেন, কখনো নিস্ক্রিয় ভাব তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। তিনি আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী ছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। ছোট বেলায় মুখস্ত কৃত অনেক কবিতা[৯০] হুবহু বলে দিতে পারতেন। তিনি সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। হাফিজদের মত কুর'আন তেলাওয়াত করতে পারতেন। তিনি এ্যারাবিয়ান স্টাইলে কুর'আন তেলাওয়াত করতেন।[৯১] তাঁর হাতের লেখা ছিল চমৎকার। বলপেন দিয়ে প্রতিটা অক্ষর স্পষ্টভাবে লিখতেন।[৯২] তিনি ছিলেন কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রম প্রিয়। কোন কজে তিনি ক্লান্তিবোধ করতেন না।[৯৩]

সমাজসেবা ও সমাজ কল্যাণ মূলক কর্মকাণ্ড

আব্বাস আলী খান সমাজসেবা মূলক কর্মকাণ্ডে নিজকে নিমজ্জিত রাখতেন। জনগণের কল্যাণ সাধনে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ। নিম্নে তাঁর সমাজসেবার কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করা হলো:

তা'লীমুল ইসলাম ট্রাস্ট গঠন

আব্বাস আলী খান ১৯৮১ সালে নিজ জেলা জয়পুরহাটে "তা'লীমুল ইসলাম ট্রাস্ট"[৯৪] নামক একটি জনকল্যাণ মূলক সংস্থা গঠন করেন। তিনি ছিলেন এ ট্রাস্টের সভাপতি।[৯৫] এ ট্রাস্টের অধীনে "জয়পুরহাট

৮৮. তদেব।

৮৯. নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৪৩১।

৯০. পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৩৩।

৯১. পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৩৪।

৯২. আব্দুস শহীদ নাসিম, *আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃ: ১৯।

৯৩. আব্বাস আলী খান, *স্মৃতি সাগরের ঢেউ*, পৃ: ১০; নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ২২৪

৯৪. প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা এ দেশের জনগণের আশা-আকাংখার প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে মুসলমানদের, যারা এ দেশের অধিবাসীর শতকারা ৮৫ জন। এ শিক্ষা ব্যবস্থা যে দায়িত্বশীল ও আস্থাভাজন নাগরিক তৈরী করতে শুধু ব্যর্থ হয়েছে তা নয় বরং এ শিক্ষা ব্যবস্থা এমন কিছু লোক তৈরী করেছে যারা জাতির জন্যে ক্যান্সার ব্যাধি স্বরূপ হয়ে পড়েছে। তার কারণ এই যে, শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থি এবং এর মধ্যে এমন কিছু নেই যার দ্বারা শিক্ষার্থীদের প্রকৃত চরিত্র তৈরী হতে পারে এবং তারা রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল নাগরিকে পরিণত হতে পারে। তাই শিশু এবং যুবকদেরকে আধুনিক শিক্ষার সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষাদান এবং তাদের সত্যিকার চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে "তা'লীমুল ইসলাম ট্রাস্ট"গঠন করা হয় এবং বাংলাদেশ সরকারের জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর অধীনে রেজিষ্ট্রি করা হয়। এ ট্রাস্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরী করা। যাতে করে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষার সাথে সাথে চরিত্রবান করে গড়ে তোলা যায়।
দ্র: নাজমুস সায়াদাত, *আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ১১৯; *Prospectus*, Taleemul Islam Trust, Jaipurhat,1984.

৯৫. নাজমুস সায়াদাত, *আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ১১৬।

আদর্শ শিক্ষায়তন"[৯৬] নামে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়। যা পরবর্তীতে "তা'লীমুল ইসলাম একাডেমী এণ্ড কলেজ"[৯৭] নামে পরিচয় লাভ করে।[৯৮]

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (র) ফাউণ্ডেশন ও পাঠাগার স্থাপন

উন্নত চরিত্র গঠনের জন্য নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে পাঠের কোন বিকল্প নেই। সেই প্রত্যাশায় আব্বাস আলী খান নিজ উদ্যোগে তাঁর বাসভবনের পাশে প্রতিষ্ঠা করেছেন শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ পাঠাগার ও ফাউণ্ডেশন। নিজ বাড়ীর আঙ্গিনায় প্রতিষ্ঠিত এ সমৃদ্ধশালী পাঠাগারে জ্ঞান অর্জনের জন্য এমন অনেক বই বিদ্যমান যা পাঠের মাধ্যমে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি নিজে এ পাঠাগারের সকল কাজকর্ম তদারকি করতেন।[৯৯]

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ছিলেন উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম সিপাহ্সালার। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামী যখন এ দেশে কাজ করতে আরম্ভ করলো তখন বিরোধী শক্তি এর প্রচন্ড বিরোধীতা করতে থাকে। ফলে ইসলামী আন্দোলন বিজয়ী শক্তি হিসেবে দাঁড় করাতে গিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশকে চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর সাহিত্য ও জীবনকে এ দেশের মানুষের নিকট পরিচিত করে তুলে ধরতে আব্বাস আলী খান অন্যতম ভূমিকা পালন করেন। তাঁর এই ভূমিকার ফলশ্রুতিতে ১৯৮৯ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) রিসার্চ একাডেমী। এ একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি অমূল্য অবদান রেখে গেছেন।[১০০] সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) রিসার্চ একাডেমী ঢাকা এর সার্বিক পরিচিতি ও কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলো:[১০১]

1. Objective of the Academy

---

৯৬. সর্বপ্রথম জয়পুরহাট শহরের বুকে দু'বিঘা জমি খরিদ করে একটি প্রাইমারী স্কুল শুরু করার জন্য ঘর নির্মাণ করা হয়। ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে নিয়মিত ক্লাস শুরু হয়। প্রথম দু'টি কেজি শ্রেণী এবং মডেল প্রথম এবং মডেল দ্বিতীয় শ্রেণী খোলা হয়। পরবর্তীতে এটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।
দ্রঃ নাজমুস সায়াদাত, *আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ১১৯।

৯৭. তা'লীমুল ইসলাম কর্তৃক ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রতিষ্ঠিত আদর্শ শিক্ষায়তন, জয়পুরহাট নামক একটি প্রাইমারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার যাত্রা শুরু করে পরে এটি "আদর্শ স্কুল, জয়পুরহাট " নামে নাম করণ করা হয়। তারও পরবর্তীতে এটি "তা'লীমুল ইসলাম একাডেমী ,জয়পুরহাট" নামে নাম করণ করা হয়।
দ্রঃ নাজমুস সায়াদাত, *আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ১২১।

৯৮. নাজমুস সায়াদাত, *আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ১১৬; *প্রসপেকটাস*, তা'লীমুল ইসলাম ট্রাস্ট, জয়পুরহাট, ১৯৮৪ খ্রী: ।

৯৯. নাজমুস সায়াদাত, *আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ১৮১, ১৩৬।

১০০. পূর্বোক্ত, পৃ: ১১১।

১০১. নাজমুস সায়াদাত, *আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৩০০-৩০২।

- To spread and present Islam as a complete code of life through all possible means, particularly through literatures of Sayeed Abul A'la maudoodi and other eminent Islamic scholars and thinkers.
- To conduct research for practical implementation of Islam in all spheres of human life.
- To disseminate the correct interpretetion of Qumran and Sunnah as invisaged by maulana Maudoodi.
- To prepare and publish books, Magazines and periodicals etc, conducive to the cause of Islamic DAWAH.
- To do such other things as may be necessary the attainment of the above objectives
- To do works of charity for the cause of Islam.

3. Works Undertaken by the Academy

- long-term and short-term research of Sayeed Maudoodi's thoughts, having its manifestation in his famous Tafheemul Quraan and other works, covering various aspects of human life.
- Collection of writings and speeches of Sayeed Maudoodi from all available sources.
- Preparation of Documents on Sayeed Maudoodi's life, literatures and activities.
- Translation of the "Tafheemul Quran" into easy Bangla, suitable for common people.
- Translation of all works of Sayeed Maudoodi (books, speeches articles, interviews etc) into Bangla.
- Organising seminars, symposia, workshops and discussion meeting etc. On Sayeed maudoodi's thoughts and literatures.
- Publication of books and documents.
- Collection of historic information on Sayeed Maudoodi's thoughts and activities.
- Organising literary activities on Sayeed Maudoodi's thoughts and activities.

4. Works done so for by the Academy

The Academy started its activities in mid-1983. the following is a short account of 18ts achievements during the last few years:

a. Translation of Sayeed Maudoodi's works into Bangla:

- translation and publication of : Tafheemul Quraan into easy and lucid Bangla, suitable for common people.
- Translation and publication of 'Seerat-e-Alam' (life and character of Propher Muhammed PBUH).
- Translation of 39 other books, total number of pages translated by the Academy being 14642.

b. Seven new books have been written and published.

c. Publication of books:

- The Academy has so far published 38 books directly and a lot of others through other publishers.
- 3 audio cassettes of Sayeed Maudoodi's speeches have been edited and published.
- A list of Sayeed Maudoodi's books far translated into Bangla has been published, having subject-wise index and original urdu title.

d. Seminars, symposia, Workshops and Conferences:

e. Essay competitions on the thoughts and activities of Sayeed Maudoodi were held on different occasions, participated by the students of colleges, Madrasas and Universities.

f. A 16-pint-questionaire, titled "As I saw Sayeed Maudoodi" Have been circulated among eminent persons haveing past relationship with Sayeed Maudoodi for compilion the findings into a publication.

g. Library:

5. Management and control

6. Membership

a. He is a practising Muslim.

b. He believes in the subscribes to the objectives of the Academy.

c. He agrees to abide by the rules of the Academy.

d. He pays normal subscriptions.

e. His application for membership in the prescribed form is accepted by the EC of the Academy.

7. The executive Committe

1.	Janab Abbas Ali Khan.	Chairman
2.	Maulana Motiur Rahman Nizami	Vice Chairman.
3.	Janab Abdus Shaheed Naseem	Director

4.	Prof. A. K. M. Nazir Ahmad.	Member
5.	Janab Mohd. Qamaruzzaman	Member
6.	Janab Abdul Qader Mollah	Member
7.	Principal Mohd. Abdur Rab	Member
8.	Dr. Choudhury Mahmood Hasan	Member
9.	Janab Mohd. Nurul Islam	Member

দৈনিক সংগ্রাম প্রকাশে ভূমিকা

এ দেশের তৌহিদী জনতার মুখপত্র হিসেবে দৈনিক সংগ্রাম নামক একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। যা ইসলামী আন্দোলনের জন্য একটি মাইল ফলক। আব্বাস আলী খান এই প্রকাশনার সূচনালগ্নের একজন স্বপ্নদ্রষ্টা। তিনি এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক মেধা ও শ্রম দিয়েছেন। যার ফলে দৈনিক সংগ্রাম আজ ইসলামী আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে।[১০২]

জয়পুরহাট ঈদগাহ্ ময়দান প্রতিষ্ঠা

আব্বাস আলী খান তাঁর নিজ এলাকায় একটি ঈদগাহ ময়দান প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বছর দূর-দূরান্ত থেকে উক্ত ঈদগাহ ময়দানে বহুলোক এসে নামাজ আদায় করেন। তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত এই ঈদগাহে ঈদের নামাযের ইমামতি ও খুৎবা প্রদান করেছেন।[১০৩]

বিধ্বস্তঃ জগন্নাথ হল পরিদর্শন

আববাস আলী খান ছিলেন অসহায় মানুষের পরম বন্ধু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাদ ধ্বসে পড়লে সেদিন যে হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল তা দেখতে তিনি রাতেই ছুটে গিয়েছিলেন জগন্নাথ হলে। শোকার্ত ছাত্র-শিক্ষকদের পাশে গিয়ে দাড়িয়েছিলেন এবং হৃদয় নিঙড়ানো সমবেদনা জানিয়েছিলেন তিনি।[১০৪] শুধু তাই নয়, ভারতে মুসলিম হত্যার জন্য ঢাকায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিলে আব্বাস আলী খান ছুটে গিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনে এবং সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে তিনি আশ্বস্ত করেছিলেন।[১০৫]

১০২. নাজমুস সায়াদাত, *আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃঃ ৪৩৬।

১০৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩৭।

১০৪. আদুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত, *আববাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃঃ ৫১।

১০৫. তদেব।

বন্যাদুর্গতদের পাশে আব্বাস আলী খান

১৯৮৪ সাল সন্দ্বীপের উড়িরচরে ভয়াবহ জলোচ্ছাস, ১৯৮৭ সাল, ১৯৮৮ সাল এবং ১৯৯১ সালে দেশব্যাপী বন্যা ও ঘুর্ণিঝড়ে এদেশের অধিকাংশ জনপদ প্লাবিত হয়ে বিধ্বস্তঃ নগরীতে পরিণত হয়। এতে অসংখ্য মানুষ মারা যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়লে আব্বাস আলী খান ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক উদ্যোগ নিয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিটি দূর্গত এলাকায় অসহায় মানুষের পাশে দাড়ান এবং তাদের হাতে রিলিফ অনুদান তুলে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।[১০৬] ব্যারিস্টার হামিদ হুসাইন আজাদ বলেন, ১৯৮৪ সালের সন্দ্বীপের উড়িরচরে ইতিহাসের ভয়াবহ জলোচ্ছাসের পর জনাব আববাস আলী খানের নেতৃত্বে রিলিফ ওয়ার্ক করতে গিয়েছিলাম। প্রায় পুরো সন্দ্বীপে এবং উড়িরচর ছিল বিধবস্তঃ জনপদ। থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত সেখানে কল্পনা করা ছিল কঠিন। রাত দিন বিপর্যস্ত মানুষের সেবায় কাটাতে হয়েছে। মাঝে মাঝে মাইলের পর মাইল কাদাযুক্ত রাস্তায় হাটতে হয়েছে। এ কঠিন সময়ে প্রায় সত্তর বছর বয়স্ক খান সাহেব ক্লান্তীহীন ভাবে দুঃস্থদের মাঝে রিলিফ বিতরণের কাজ করেছেন। কাজের সময় ক্লান্তির ছাপ তাঁর মাঝে দেখা যায়নি।[১০৭]

ইন্তিকাল

আব্বাস আলী খান ৮৫ বছর বয়সেও অত্যন্ত কর্মচঞ্চল একজন মানুষ ছিলেন। কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে তিনি দিন অতিবাহিত করতেন। ছোট খাট রোগ-ব্যাধিতে তাঁর কর্মচাঞ্চল্যতাকে বাঁধাগ্রস্থ করতে পারেনি। তিনি লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হয়েও দ্বীনি খেদমতে কখনো পিছপা হননি। তাঁর অসুখের মাত্রা হঠাৎ করে বেড়ে যায়। ফলে চিকিৎসার জন্য (২১ জুলাই-১৯৯৯ খ্রীঃ) ইবনে সিনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[১০৮] দীর্ঘ ৭২ দিন মৃত্যুর[১০৯] সাথে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে ১৯৯৯ সনের ৩ অক্টোবর রোজ রবিবার মোতাবেক ১৮ আশ্বিন ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, দুপুর ১.১৫ মিনিটে তিনি এ ক্ষনস্থায়ী দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে

---

১০৬. তদেব।

১০৭. আব্দুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত, *আববাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃঃ ১৭৬।

১০৮. নাজমুস সায়াদাত (সম্পাঃ), *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃঃ১৮২; আব্দুস শহীদ নাসিম (সম্পাঃ) , *আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃঃ ১৬।

১০৯. মৃত্যু অবশ্যই অনিবার্য। দু'রকম মৃত্যু বড়ই বেদনা দায়ক । তার একটি হলো হঠাৎ মৃত্যু। যার এ মৃত্যু হয় তিনি তার কোন দায়িত্ব কাউকে বুঝিয়ে দেবার সুযোগ পান না। বিশেষ করে দেনা থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ পান না। হঠাৎ মৃত্যু হলে উত্তরাধীকারীদের অসিয়াত করা থেকেও বঞ্চিত হয়। আর এক প্রকার বেদনা-দায়ক মৃত্যু হলো দীর্ঘকাল শয্যাগত থাকা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ দু'রকম বেদনা দায়ক মৃত্যু থেকেই আল্লাহর নিকট আশ্রয় চেয়েছেন। খান সাহেবের মৃত্যু সম্পর্কে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, খান সাহেবের মৃত্যু কতই না সুন্দর! হঠাৎ মৃত্যু হলো না। আবার দীর্ঘ কাল বিছানায় পড়ে থাকতে হলো না। কতই প্রশান্ত অবস্থায় নীরবে আপন প্রভূর নিকট ফিরে গেলেন।
দ্রঃ আবদুস শহীদ নাসিম (সম্পাঃ), *আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃঃ ২৮।

অসংখ্য ভক্ত-অনুরক্তকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে মহান প্রভূর ডাকে সাড়া দিয়ে পর-পারে চলে যান। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।[১১০] ঐ দিন বিকেল ৪ টায় মারহুমের লাশ ইবনে সিনা হাসপাতাল থেকে কেন্দ্রীয় জামায়াত অফিসে আনা হলে মাওলানা আব্দুল মোনেম, মোস্তফা হুসাইন সরকার এবং রহুল আমীন তাঁর শেষ গোসল করান।[১১১]

যানাজা নামাজ

৪ অক্টোবর জোহরের নামাজের পর বেলা ২ টায় ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে খান সাহেবের অন্তিম[১১২] ইচ্ছা অনুযায়ী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের তৎকালীন আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম[১১৩] (১৯৬৯-২০০০)

---

১১০. নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ১৪৩।

১১১. তদেব, পৃ: ১৮৩।

১১২. ১৯৯২ সালে খান সাহেব নিজেই তাঁর মৃত্যুর স্বপ্ন দেখেছিলেন । তিনি দেখেন আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর জানাযা নামাজের ইমামতি করছেন এবং মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী তাঁর কফিন কবরে নামাচ্ছেন। এ স্বপ্নই অন্তিম ইচ্ছা হিসেবে তিনি প্রকাশ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, ঐ সময় আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম সৌদি আরবে ছিলেন। প্রিয় সাথীর মৃত্যুর খবর শোনা মাত্রই তিনি তাঁর সফর সংক্ষিপ্ত করে ঢাকায় ফিরে আসেন এবং অশ্রুসজল অবস্থায় প্রিয় সাথী আববাস আলী খানের কপালে শেষ চুম্বন করেন।
দ্রঃ আবদুস শহীদ নাসিম (সম্পা:), *আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃ: ১৭; নাজমুস সায়াদাত (সম্পা:), *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ১৮৩।

১১৩. অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯২১ সালের ৭ নভেম্বর ঢাকা শহরের লক্ষ্মী বাজারস্থ মাতুলালয়ে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা গোলাম কবির এবং মাতার নাম সাইয়েদ আশরাফুন্নিসা। তাঁর পিতামহ মাওলানা কাজী আব্দুস সোবহান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর থানার বীরগাঁও গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৯৪৮ সাল থেকেই ঢাকা মহানগরীর রমনা থানার মগবাজার এলাকায় পিতার ক্রয় করা বাড়ীতে অধ্যাপক গোলাম আযম স্থায়ী ভাবে বসবাস করে আসছেন। তিনি ১৯৩৭ সালে জুনিয়ার মাদ্রাসা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৪০ সালে এস. এস. সি. এবং ১৯৪৪ সালে আই. এ. পরীক্ষায় যথাক্রমে তের তম এবং দশম স্থান অধিকার করেন। এ ভাবে বি. এ. এবং এম. এ. পরীক্ষায়ও তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ৪০ এর দশকে মুসলমানরা যখন ভিন্ন আবাস ভূমির জন্য সংগ্রামরত তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ আযাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৬-৪৭ শিক্ষাবর্ষে তিনি ফজলুল হক মুসলিম হলের সাধারণ সম্পাদক, ১৯৪৭-৪৮ এবং ১৯৪৮-৪৯ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসুতে জেনারেল সেক্রেটারী পদে (GS) নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদিলে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা হওয়ার পক্ষে অধ্যাপক গোলাম আযম লিখিত মানপত্র পাঠ করেন। ১৯৫০ সালের ৩ ডিসেম্বর তিনি রংপুর কারমাইকেল কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক পদে যোগদান করেন এবং ১৯৫৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এ পদে চাকুরী করেন। ১৯৫০ সালে তিনি রংপুরের তাবলীগ জামায়াতের আমীরের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। যার কারণে তাঁকে কয়েকবার কারাবরণ করতে হয়েছে। ১৯৫৪ সালের ২২ এপ্রিল তিনি জামায়াতে ইসলামীর রুকন হন এবং ১৯৫৭ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী হিসেবে তাঁকে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানের আমীর এবং স্বাধীনতার পর থেকে ২০০০ সাল পযর্ন্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ছিলেন। ১৯৭১ সালের পর মুজিব সরকার কর্তৃক তাঁর নাগরিকত্ব বাতিলের কারণে ১৯৭৩-১৯৭৮ সাল পর্যন্ত তাঁকে লন্ডনে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়েছে। ৬০ দশকে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন; ও ৯০ এর গণআন্দোলনে তিনি বলিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। আবাধ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে তিনি ১৯৮০ সালে কেয়ারটেকার সরকারের ফর্মুলা পেশ করেন। তিনি রাজনীতির পাশা-পাশি লেখা-লেখির কাজও করতেন। তিনি ইসলাম ও অন্যান্য বিষয়ে ৭৫টি বই লিখেছেন এবং বিশ্বনন্দিত তাফসির তাফহীমুল কুরআনের সংক্ষিপ্ত রূপে বাংলায় অনুবাদ করেছেন।
দ্রঃ মুহাম্মদ, আব্দুল ওয়াহাব সম্পাদিত, *এ শতকে ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন* (বগুড়া: স্টুডেন্ট ওয়েল ফেয়ার প্রকশনী, ১৯৯৭, খ্রী:), পৃ: ৩২-৩৩; অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, *বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপথিক যারা, ১ম খন্ড*, পৃ: ৮৬-৯৪; অধ্যাপক গোলাম আযম, *জীবনে যা দেখলাম, ১ম খণ্ড* (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশনী, ২০০২ খ্রী:), পৃ: ২১-২৬।

বিশাল এ জানাযা নামাজের ইমামতি করেন।[১১৪] ঐ দিন দিবাগত রাত ১.১৫ মিনিটে ঢাকা হতে মারহুমের কফিন সড়ক পথে নিজ বাড়ী জয়পুরহাটে নেয়া হয়। পথিমধ্যে বগুড়া জেলার জামায়াতের সাবেক আমীর ও সাবেক এম. পি. মাওলানা আব্দুর রহমান[১১৫] ফকিরের ইমামতিতে হাজার হাজার মানুষের অংশ গ্রহণে দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।[১১৬] ৫ অক্টোবর খান সাহেবের নিজ বাড়ী জয়পুরহাট শহরের সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর বিশাল ময়দানে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর[১১৭] ইমামতিতে প্রায়

---

১১৪. খান সাহেবের জানাযার বিবরণ সম্পর্কে পরের দিন ৫ অক্টোবর দৈনিক সংগ্রামের স্টাপ রিপোর্টার হারুন-অর-রশিদ লিড নিউজে উল্লেখ করেছেন, অযুত কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল কালেমা শাহাদাত। ঐ দিন পল্টন ময়দানে বাধ ভাঙ্গা জোয়ারের মত জনতার স্রোতে পুরা ময়দান কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বেলা-শোয়া ২ টায় জানাযা শেষে বিপুল সংখ্যক মানুষ পল্টন ময়দানে ছুটতে থাকে। জাতীয় স্টেডিয়ামের দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব কিনারা, রাজউক এভিনিউ, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ সর্বত্রই উপচে পড়া জনতার ভীড় ছিল। জানাযার নামাজ শেষ পর্যন্ত মহাসমুদ্রে রূপান্তরিত হয়। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাগামী কিশোর যুবক থেকে শুরু করে শশ্রুমন্ডিত শতবর্ষের বৃদ্ধ এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও সমাজের উচ্চস্তরের মানুষও শরীক হন নামাজের জানাযায়। আদর্শিক ও রাজনৈতিক কারণে এ জানাযায় অভুতপূর্ব লোক সমাবেশ হয়। তাছাড়া দলমত নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতি প্রমান করেছে সত্যিই তিনি ছিলেন "অজাতশত্রু" এক মর্দে মুমিন। সাম্প্রতিক কালে কোন রাজনৈতিক নেতার ইন্তিকালে এত শোকার্ত মানুষের ঢল কখনো দেখা যায়নি। আব্বাস আলী খান একটি জীবন, একটি আন্দোলন, একটি ইতিহাসের নাম। ঘটনাবহুল বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি অসংখ্য মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালাবাসা অর্জন করেছেন। তাঁর মৃত্যু প্রমান করেছে 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান....... এ যেন মৃত্যুহীন প্রাণের জীবন্ত অভিযোগ।
দ্র: নাজমুস সায়াদাত (সম্পা:), *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ১৯৫-১৯৬; দৈনিক সংগ্রাম, ৫ আক্টোবর, ১৯৯৯ খ্রী:।

১১৫. মাওলানা আব্দুর রহমান ফকির একজন প্রবীন 'আলিম, শিক্ষক ও রাজনীতিবিদ ছিলেন । তাঁর পূর্ণ নাম আবুল ইমরান মোহাম্মদ আব্দুর রহমান ফকির। পিতার নাম মরহুম মৌলভী হানিফ উদ্দীন ফকির। তিনি ১৯১৯ সালে ৯ অক্টেবর, বাংলা ১৩২৬ সালের ২৪ আশ্বিন বগুড়ায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ১৯৩৫ সালে জোড়া নজমুল 'উলুম সিনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি হন । ১৯৪১ সালে আলিম এবং ১৯৪৩ সালে ফাজিল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে প্রথম বিভাগে উত্তীন হন। অতপর ১৯৪৫ সালে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে কামিল পাশ করেন। প্রথম জীবনে শিক্ষকতার পেশায় নিয়জিত ছিলেন। পরবর্তীতে ম্যারেজ রেজি: এবং সর্বশেষে সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া থানার হামিদপুর মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫০ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি রুকনিয়াত লাভ করেন। ১৯৬৩ সালে স্বৈরাচারী আইয়ুব বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখার কারণে তিনি ৬ মাস কারাভোগ করেন। ১৯৭০ সালে নির্বাচনে তিনি জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হিসেবে বগুড়া-৪ আসন থেকে এম. পি. নির্বাচিত হন এবং ১৯৮৬ সালেও তিনি পুনরায় জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। বর্তমান এই প্রবীননেতা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মসলিশে শুরার একজন সদস্য।
দ্র: অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, *বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপথিক যারা*, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮২-৮৪।

১১৬. আবদুস শহীদ নাসিম (সম্পা:), *আববাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃ: ১৭।

১১৭. মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী একজন শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ সর্বপরি একজন সুদক্ষ রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ১৯৪৩ সালের ৩১ মার্চ পাবনা জেলার সাথিয়া থানার এক আদর্শ মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছোট বেলা থেকে একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে সাথীয়ার বোয়ালমারী মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯৫৫ সালে দাখিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে এবং ১৯৫৯ সালে আলিম পরীক্ষায় পাকিস্তান মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে ১৬ তম স্থান লাভ করেন। ১৯৬১ সালে তিনি ফাজিল এ প্রথম বিভাগ এবং ১৯৬৩ সালে ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল এ প্রথম বিভাগে ২য় স্থান লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকে তিনি ছাত্র ও জাতীয় রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৬৬-১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানের ইসলামী ছাত্র সংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে ৩০ মে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে তার যোগ্যতার কারণে ঢাকা মহানগরীর আমীর, ১৯৭৯-৮২ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য, ১৯৮৩-৮৮ পর্যন্ত সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল, ১৯৮৯-১৯৯৯ পর্যন্ত সেক্রেটারী জেনারেল এবং ২০০০ সাল থেকে অদ্যবধি (২০০৭-২০০৮) আমীরের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ১৯৬৯ গণআন্দোলন, ১৯৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, ১৯৯৪-৯৬ কেয়ারটেকার আন্দোলনে মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯১ এবং ২০০১ সালে জাতীয় নির্বাচনে তিনি এম. পি. নির্চাচিত হয়ে গণতন্ত্র ও ইসলামের পক্ষে জোরালো ভূমিকা পালন করেন। ২০০১ সালে ৪ দলীয় ঐক্যজোটের মন্ত্রী সভায় কৃষি ও শিল্প মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে থাকাকালীন তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দেন। সামাজিক কার্যক্রমের পাশা-পাশি তিনি ২৫টি বই রচনা করেছেন।
দ্র: মো: ফজলুর রহমান ও আব্দুল কাইয়ুম (সম্পা:), *সফল যারা কেমন তারা* (ঢাকা: সম্প্রীতি পাবলিকেশন্স, ২০০২ খ্রী:), পৃ: ৩২-৩৫; অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, *বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপথিক যারা*, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫৩-১৫৭।

লক্ষাধিক লোকের অংশ গ্রহণে সর্বশেষ জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।[১১৮] জানাযা নামাজ শেষে তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী নিজ বাড়ীর সন্নিকটে অবস্থিত পারিবারিক কবর স্থানে মারহুমকে তাঁর স্ত্রীর পাশে দাফন করা হয়। এ সময় মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী তাঁর মৃতদেহ কবরে নামান। দাফনান্তে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী হাজার হাজার শোকার্ত জনতাকে সাথে নিয়ে খান সাহেবের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করেন।[১১৯] 'আলিম-'ওলামা, পীর-মাশায়েখ, মন্ত্রী, এম. পি. ছাত্র-শিক্ষক, সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন পেশাজীবি সহ সর্বস্তরের মানুষ তাঁর জানাযায় শরীক হয়েছেন। বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্যজোট সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ[১২০] তাঁর জানাযায় শরীক হন।[১২১]

---

১১৮. ৫ অক্টোবর দৈনিক সংগ্রাম ও দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় জয়পুরহাটের জানাযার বিবরণ রিপোর্ট আকারে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে আব্বাস আলী খানের জানাযায় অংশ গ্রহণ করার জন্য গতকাল মঙ্গলবার মূলতঃ জয়পুরহাটে অঘোষিত ছুটি কার্যকর হয়ে যায়। স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকগণ প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে তাঁর জানাযায় শরীক হন। জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, পুলিশ ও অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তা ও সদস্যরাও ছুটে যান তাঁর নামাজের জানাযায়। অফিস আদালত অপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায়। ব্যবসা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে ব্যবসায়ী সহ সর্বস্তরের মানুষ মারহুম নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ছোট শহর জয়পুরহাট লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে। সকাল থেকে পিপিলিকার সারির মত লোকজন জানাযা স্থলে ছুটতে থাকায় জীবন যাত্রা স্থবির হয়ে পড়ে। কয়েক জন প্রবীন স্থানীয় বাসিন্দা জানান, ইতোপূর্বে অন্যকোন জানাযায় এত বিপুল সংখ্যক লোক এই শহরে কখনোই সমবেত হয়নি। ক্ষেতলাল এলাকার ৮০ বছর বয়সী বৃদ্ধ আব্দুল জব্বার জানান, এখানকার জনসভা ও সমাবেশেও অতীতে কখনো এত লোক হয়নি। একজন সরকারী কর্মকর্তা জানান, ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়ার যানাজা নামাজের পর এত বড় লোক সমাগম তিনি আর দেখেননি।
দ্রঃ দৈনিক সংগ্রাম, ৬ অক্টোবর, ১৯৯৯; দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ অক্টোবর, ১৯৯৯; নাজমুস সায়াদাত (সম্পাঃ), *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃঃ ১৮৮।

১১৯. আবদুস শহীদ নাসিম (সম্পাঃ), *আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃঃ ১৬; নাজমুস সায়াদাত (সম্পাঃ), আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম, পৃঃ ১৮৪।

১২০. রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ, বিএনপির মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া, সাবেক মন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরী, শামসুল ইসলাম, তরিকুল ইসলাম, কাজী ফিরোজ রশিদ, ইসলামী ঐক্যজোটের নেতা এ. আর. এ. মতিন, এন. ডি.-এর নূরুল হক মজুমদার ও এ্যাডঃ আব্দুল মবিন, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের নেতা এ. টি. এম. হেমায়েত উদ্দীন, ডি. এল.-এর নেতা সাইফুদ্দীন আহমদ মনি, নেজামী ইসলামীর মোস্তফা আনোয়ার, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের তৎকালীন আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহীদ, মাওলানা দেলাওয়ার হুসাইন সাঈদী, আব্দুল কাদের মোল্লা, ইসলামী ছাত্রশিবিরের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি মতিউর রহমান আকন্দ, ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
দ্রঃ নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃঃ ১৯১-১৯২।

১২১. জানাযা পূর্ব সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের তৎকালীন আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, এত বয়সেও যে ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করা যায় সেটা প্রমান করে গেছেন আব্বাস আলী খান। তিনি ছিলেন একজন মর্দে মুমিন। এসময় উপস্থিত জনতা সমস্বরে এ কথার স্বাক্ষ্য প্রদান করে। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী তাঁর বক্তব্যে বলেন, আব্বাস আলী খান ছিলেন আমাদের পিতৃতুল্য নেতা। তিনি তাঁর বয়সের চেয়ে ছোট সকলকে ভালবাসতেন। আব্দুল কাদের মোল্লা বলেন, খান সাহেবের মৃত্যুতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো তা পূরণ হবার নয়। তিনি ছিলেন অনেক বড় মাপের একজন মানুষ।
দ্রঃ নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃঃ ১৯৭।

শোকসভা ও দু'আর মাহফিল

আব্বাস আলী খান এর মৃত্যুতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন তাঁর মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করেন এবং শোকসভার আয়োজন করে। বিভিন্ন পত্রিকায় সে সব শোকসভা ও শোকবার্তা প্রকাশিত হয়। এ সকল শোক সভা ও শোকবার্তায় এ মহান ব্যক্তিত্বের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে সে সকল দু'আ অনুষ্ঠান, শোকসভা ও শোকবার্তার কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করা হলো:

মক্কা শরীফে দু'আ অনুষ্ঠান

আব্বাস আলী খান-এর জন্য পবিত্র মক্কা শরীফে বিশেষ মুনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। হারামাইন শরীফের প্রেসিডেন্সির প্রধান এবং মসজিদুল হারামের সম্মানিত প্রধান ইমাম মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন সুবাইলকে আব্বাস আলী খানের মৃত্যু সংবাদ জানানো হলে তিনি খান সাহেবের রুহের মাগফিরাতের জন্য কাবা শরীফে দু'আ করেন।[১২২] তাছাড়া মক্কা শরীফে আবস্থানরত বাংলাদেশীরা তাৎক্ষণিক ভাবে বায়তুল্লায় সমবেত হয়ে তাওয়াফ, নামাজ, কুর'আন তেলাওয়াত ও তাসবীহ পাঠ শেষে খান সাহেবের জন্য দু'আ করেন। দু'আ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মাদ ইউসুফ। দোয়ার সময় উপস্থিত জনতার আকুতি ও কান্না কাটিকে অন্যান্য দেশের মুসল্লিদের মাঝেও ভাবাবেগ জেগে উঠে এবং তারাও নিঃশব্দে এই দু'আয় শরীক হয়ে ব্যথিত হৃদয়ের আকুতি প্রকাশ করেন।[১২৩]

শারজায় শোকসভা ও দু'আর মাহফিল

আব্বাস আলী খান এর ইন্তিকালে গোটা আরব আমীরাতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। ৩ রা অক্টোবর রাত ১০.০০ টায় আমীরাতের শারজায় প্রবাসী বাংলাদেশীরা স্থানীয় ইসলামিক সেন্টারে এ্যাড: মহিউদ্দীন চৌধুরীর পরিচালনায় আলোচনা ও দু'আর মাহফিলে শরীক হন।[১২৪] এছাড়া সারা বিশ্বের বিভিন্ন মসজিদে বিশেষ করে ইটালী, ফ্রান্স, জার্মানী, পাকিস্তানসহ ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক মসজিদে মারহুমের জন্য বিশেষ দু'আ অনুষ্ঠিত হয়।[১২৫]

ঢাকায় শোকসভা

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ৮ আক্টোবর আল-ফালাহ মিলনায়তনে এবং ৯ অক্টোবর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট মিলনায়তনে পৃথক দু'টি স্মরণ সভার আয়োজন করে। এ স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন সাবেক

১২২. আবদুস শহীদ নাসিম (সম্পা:), *আববাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃ: ২৩৭।

১২৩. তদেব।

১২৪. তদেব।

১২৫. তদেব।

রাষ্ট্রপতি হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ, অধ্যাপক গোলাম আযম, সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, কামারুজ্জামান, সাবেক মন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরী, মুসলিম লীগের মহাসচিব জমির আলী, নূরুল হক মজুমদার, প্রখ্যাত মুফাস্‌সিরে কুর'আন মাওলানা দেলাওয়ার হুসাইন সাঈদী, আব্দুল কাদের মোল্লা সহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন সুধীজন।[১২৬] ১৯ অক্টোবর জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুরূপ আরো একটি স্মরণ সভা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।[১২৭] এছাড়া মহানগরী সহ দেশের প্রায় সকল জেলা শহরে দু'আ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় আববাস আলী খানের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে আলোচকরা বক্তব্য রাখেন। এ সকল স্মরণ সভায় বক্তাগণ আব্বাস আলী খান সাহেবের দর্শন, চিন্তা-চেতনা, তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা তুলে ধরেন। তাঁর মৃত্যুতে জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে বলে বক্তারা মন্তব্য করেন।[১২৮]

শোকবার্তা প্রেরণ

আব্বাস আলী খান-এর ইন্তিকালে যে সকল জাতীয় নেতৃবৃন্দ, সংগঠন ও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণ শোকবার্তা প্রেরণ করেছিলেন, সে সব শোকবার্তার কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করা হলো:

জাতীয় নেতৃবৃন্দ, সংগঠন ও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণের মধ্যে যারা শোকবার্তা পাঠিয়ে ছিলেন তাদের মধ্যে বিএনপির চেয়ারপার্সন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খলেদা জিয়া, সাবেক রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস, ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের তৎকালীন আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম, সাবেক এমপি মাওলানা দেলাওয়ার হুসাইন সাঈদী, সাবেক স্ব-রাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরী, বিএনপির মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া, জাগপা তৎকালীন সভাপতি শফিউল আলম প্রধান, মুসলিম লীগের সভাপতি নূরুল হক মজুমদার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইউকে এর পরিচালক অধ্যাপক খুরশিদ আহমদ, দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে এন্ড আয়ারল্যাণ্ডের আমীর মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীর কাজী হুসাইন আহমদ, ইখওয়ানুল মুসলিমিন-এর মুরশিদে আম মোস্তফা মাশহুর, রাবেতা আলমে ইসলামী বাংলাদেশের পরিচালক মীর কাশেম আলী, International Islamic Realif Organigation-এর বাংলাদেশের সাবেক রিজিউনাল ডাইরেক্টর রহমত উল্লাহ নাজির খান, বাংলাদেশে নিযুক্ত তৎকালীন

১২৬. পূর্বোক্ত, পৃ: ২২৩।

১২৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৩৩।

১২৮. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৩১।

(১৯৯৯) ইরানের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ সাদেক ফরাজ, লিবিয়ার তৎকালীন চার্জ দ্যা এ্যাফয়ার্স মাহফুজ রজব রাহীম, আফগানিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত গোলাম মুহাম্মদ মুখায়ার, মাসকাতে তৎকালীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত করম এলাহী এবং রোহিংগা সলিডারিটি অরগ্যানাইজেশন এর তৎকালীন (১৯৯৯) প্রেসিডেন্ট শেখ দ্বীন মুহাম্মদ প্রমূখ অন্যতম।[১২৯] এসব শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ গণতন্ত্র ও ইসলাম প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেন। তাঁরা মারহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে গভীর সমবেদনা জানান। তাঁর মৃত্যুতে দেশ প্রজ্ঞাবান, সৎ, আদর্শবাদী ও মেধা সম্পন্ন রাজনীতিবিদ এবং ইসলামী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী একজন সৈনিককে শুধু হারালো না বরং সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একজন মহান নেতা ও মনীষীকে হারালো। তাঁর তিরোধানে এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে বলে তাঁরা তাঁদের শোক বার্তায় উল্লেখ করেন'।[১৩০]

আববাস আলী খান সম্পর্কে সুধীজনের মন্তব্য

কবি আল মাহমুদ

বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবি আল মাহমুদ বলেন, 'আব্বাস আলী খান ছিলেন এদেশের মুসলিম ঐতিহ্যবাহী লেখকদের প্রতি খুবই সদয় এবং আমাদের জন্য অফুরন্ত হাসির ফুয়ারার মতো। যেহেতু তিনি নিজেই ছিলেন একজন লেখক এবং অন্তর দৃষ্টি সম্পন্ন পর্যবেক্ষক। তাছাড়া বিভাগ পূর্বকাল থেকে উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামের সাথে তিনি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। যে কারণে তাঁর ইতিহাস জ্ঞান এতটাই পরিচ্ছন্ন ছিল যে তিনি অবলীলায় রচনা করতে পেরেছেন "বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস" নামক এক বৃহদাকার পুস্তক। তাঁর "স্মৃতি সাগরের ঢেউ" নামক বইটি পড়তে গিয়ে আমার সহসাই মনে হয়েছিল তিনি ইচ্ছে করলেই বাংলা ভাষায় একজন সুপরিচিত কথা শিল্পী হয়ে উঠতে পারতেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততোদিন পর্যন্ত এদেশের মুসলমানদের স্বার্থ ও ইসলামী আন্দোলনে তাঁর একটি দৃঢ়-অবিচল ভূমিকা আমরা মনে মনে উপলব্ধি করেছি। তিনি কেবল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতা ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন বাংলাদেশের ইসলাম প্রিয় মানুষেরই নির্ভর যোগ্য নেতা। তাঁর চেহারায় পরহেজগারী ও আধ্যাত্মিকতার যেমন ছাপ ছিলো তেমনি ছিলো এদেশের মানুষের জন্য গভীরতর দরদের অভিব্যক্তি। একজন লেখক সাংবাদিক হিসেবে অকপটে বলতে পারি তাঁকে দেখলেই মনে আনন্দ সৃষ্টি হতো। তিনি আমাদের মতো লেখক শিল্পীদের ইসলাম প্রীতিতে কেবল পুলকিতই ছিলেন না, মনে হয় তাঁর আকাংখিত ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্রে যে আধুনিক মননশীল কবি-

---

১২৯. নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃঃ ২০২-২০৬; আবদুস শহীদ নাসিম, *আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃঃ ২২৬।

১৩০. তদেব।

সাহিত্যিকদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে এতে দ্বিধান্বিত ছিলেন না। প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন একজন শিক্ষিত, মার্জিত ও ওয়াকিফহাল আধুনিক মানুষ। তাঁর তিরোধানে কেবল যে ইসলামী গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই ক্ষতি হলো এমন নয়। বরং যারা ভাবেন গণতন্ত্র চর্চায় সহনশীলতার একান্ত দরকার তাদের মধ্যেও অপরিসীম ক্ষতের সৃষ্টি করেছে'।[১৩১]

Shah abdul Hannan

'Former secretary Govt. of Bangladesh and former chairman NBR Govt. of Bargladesh shah Abdul Hannan Said, Mr. Abbas Ali Khan was a major figur in Islamic movement of the south Asian Sub-Continent, an important political figure of Bangladesh. Thinker and writer. He was a gentleman per excellence as a Muslim Should be, from my Personal knowledge. I can say that he was a man of Islam. He spent every bit of his energy for the last 45 yerars for Islam and Islam only. He was a simple person, never showing of any pride or achievement. Allah bless him and give him Jannatul Firdaus'[132].

অধ্যাপক গোলাম আযম

ভাষা সৈনিক, কেয়ারটেকার সরকারের রূপকার, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, 'খান সাহেব ছিলেন দ্বীনের 'ইলম, মজবুত ঈমান, উন্নত নৈতিক চরিত্র, তাকওয়া, দ্বীনদারী ও আল্লাহর খাঁটি প্রেমিক হিসেবে আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। আমি তাঁকে সত্যের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান সাধক মনে করি। জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পূর্বে তাসাউফের লাইনে অগ্রসর হয়ে ফুরফুরা শরীফের খলিফা হওয়ার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলনে এগিয়ে আসতে তিনি সামান্য দ্বিধাও করেন নি। ফুরফুরার মারহুম পীর হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকীর পুত্র আব্দুল হাই সিদ্দিকী (র) এর সান্নিধ্য উনি পেয়েছিলেন। এ সময় তাসাউফের সাথে দ্বীনি ইলমের চর্চা যথেষ্ট করতেন। তাই ইকামতে দ্বীনের ডাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সাড়া দিতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর মত জ্ঞানী এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি পীরের খালীফা হিসেবে লোকদের মুরিদ করতে চাইলে তিনি খ্যাতিমান পীরও হতে পারতেন'।[১৩৩]

---

১৩১. আবদুস শহীদ নাসিম, *আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃ: ৮৮-৯০।

১৩২. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৪-৮৫।

১৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৬-২৭।

মাওলানা দেলাওয়ার হুসাইন সাঈদী

প্রখ্যাত মুফাস্‌সিরে কুর'আন সাবেক এম. পি. হযরত মাওলানা দেলওয়ার হুসাইন সাঈদী বলেন, 'ইতিহাস স্রষ্টা ব্যক্তিরা সাধারণতঃ জ্ঞানের দু'চারটি শাখায় আপন সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে থাকেন কিন্তু মারহুম খান সাহেব-এর মত এমন সৃষ্টিশীল প্রতিভা সত্যিই বিরল। তিনি জ্ঞানের প্রায় সব ক'টি শাখায় মৌলিকত্বের ছাপ রেখেছেন। ইসলামী রাজনীতির বিস্তৃর্ণ অঙ্গনে, ইসলামী সাহিত্য ও ইতিহাসে, সাংগঠনিক দক্ষতায়, জাতি সত্বা বিনির্মাণে, শিক্ষা ও দর্শনে, বাগ্মীতায়, তাকওয়ায়, পরিশীলিত আচার-আচরণে ও মার্জিত সৌজন্য বোধে তিনি ছিলেন আপন মহিমায় ভাস্বর এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। দূর থেকে মনে হতো তিনি অত্যন্ত ভাব-গম্ভীর রাশভারী মেজাজের লোক। কিন্তু তাকে যারা নিকট থেকে দেখেছেন, জেনেছেন তারা জানেন তিনি কত বিনয়ী, কত সরল-সহজ, দিগন্তের মতো প্রসারিত এক বিশাল হৃদয়ের অধিকারী অনুসরণযোগ্য মানুষ। যে কোন মাপকাঠিতে তিনি ছিলেন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ 'আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-এর যোগ্য উত্তরসূরী। তিনি তাঁর জীবনের যাবতীয় সুখ-শান্তি, আনন্দ-সম্ভার বিসর্জন দিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত দ্বীন প্রতিষ্ঠার মিশনে উৎসর্গ করেছিলেন। এমন লোক খুব কম দৃষ্টি গোচর হয় যাদের মাঝে উচ্চমানের মানসিক যোগ্যতা, অনন্য চিন্তাধারা, ইজতেহাদ এবং চিন্তার পরিশুদ্ধি ও পরিপক্কতার পাশা-পাশি বাস্তব ক্ষেত্রে নেতৃত্বের যোগ্যতা, চরিত্রিক মাধুর্য ও সরলতার সমাবেশ ঘটতে পারে। তিনি তার আজন্ম লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে ছুটে বেড়িয়েছেন। রোগ শোক, দু:খ-কষ্ট তাঁকে পরাভূত করতে পারেনি। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তিনি যে ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আমৃত্যু সচেষ্ট ছিলেন। এ দৃষ্টিকোন থেকে তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর মকবুল ও মাহবুব বান্দাহ'।[১৩৪]

ড. আ. ছ. ম. তরিকুল ইসলাম

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ্ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. আ. ছ. ম. তরিকুল ইসলাম তার শোক বার্তায় উল্লেখ করেন, খান সাহেব পোশাকে-আশাকে একজন পরিপাটি ব্যক্তি ছিলেন। তবে বাহ্যিক দিক থেকে তিনি যতো পরিপাটি মনের দিক দিয়ে তার চেয়ে আরো বেশী পরিপাটি। ভাবগম্ভীর অথচ সাংঘাতিক রসিক। স্বল্প ভাষী অথচ কথার শৈল্পিক আকর্ষণে মানুষকে কাছে টানেন। ব্যক্তিত্ব সচেতন অথচ গর্ব নেই। তার কথাবার্তা, আচার-আচরণে কৃত্রিমতার কোন ছাপ নেই'।[১৩৫]

---

১৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮০-৮৩।

১৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮২-১৮৩।

মু. হামিদ হুসাইন আযাদ

হাকোর্টের আইনজীবি ব্যারিস্টার হ্যামিদ হুসাইন আজাদ তার শোক বার্তায় বলেন, 'আব্বাস আলী খান মূলতঃ একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি কখনো বেশী কথা বলতেন না। মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনের সূরা মু'মিনূন-এর ৩ নং আয়াতে বর্ণিত (তারা বেহুদা কথা বলা থেকে বিরত থাকে) সফল মুমিন দলের গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অপ্রয়োজনীয় কথা যেমন তিনি বলতেন না তেমনি প্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে তিনি কখনো বিরত থাকতেন না। সাধারণ কথা বলা থেকে শুরু করে শিক্ষা বৈঠক ও জনসভার বক্তব্য পর্যন্ত সবত্রই তার কথা বলা ছিল যথার্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ। সময় ও পরিবেশকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় কথাগুলো তিনি বলতেন। ভাবাবেগ তাড়িত প্রান্তিক বা বলগাহীন অথবা নিরেট শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য কোন কথা তিনি বলতেন না। শুধু তাই নয়, বক্তব্য উপস্থাপনের সময় তিনি সময়ের দাবীর পাশা-পাশি সুদূর প্রসারী লক্ষ্যকে কখনো উপেক্ষা করেননি'।[১৩৬]

হাফেজা আসমা খাতুন

জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্যা হাফেজা আসমা খাতুন বলেন, 'আব্বাস আলী খান ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ নিবেদিত প্রাণ সৈনিক, বলিষ্ট নেতৃত্ব। ইসলামী আন্দোলনের চরম দুর্দিনে কঠিন কঠিন সময়ে দৃঢ়তার সংগে তিনি এ আন্দোলনের হাল ধরেছেন। তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। একাধারে তিনি একজন সাহিত্যিক, লেখক, গবেষক ও বাগ্মী ছিলেন। তার লিখিত বই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আন্দোলনের কর্মীদের জন্য প্রেরণার উৎস। জীবনের শেষ মুহূর্তে কঠিন অসুস্থ অবস্থায় তাঁর লিখিত "একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ" বইটি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য মাইল ফলক'।[১৩৭]

আবুল আসাদ

দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক আবুল আসাদ বলেন, 'খান সাহেব নিজে সত্যিকার আল্লাহর বান্দাহ হওয়ার সাধনাকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দিতেন। শুধু নিজে সিরাতুল মুস্তাকিমে চলা নয়, অন্য সবাই কে সিরাতুল মুস্তাকিমে আনা ছিল তার মিশন। সে জন্য তিনি ইসলামের পথে চলা ও চালানোর ক্ষেত্রে যখন যে সংগঠনকে সর্বোৎকৃষ্ট মনে করতেন, সেটাকেই আকড়ে ধরেছেন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তিনি ফুরফুরা পীরের মুরিদ ও খলীফা হন। আবার ৫০ দশকের মাঝা-মাঝি তিনি যখন জামায়াতে ইসলামীতে যাগদান করেন তখনও তাঁর মিশন ছিল এটাই। দেখতে তিনি ছিলেন গম্ভীর কিন্তু কথা ও

---

১৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭৪-১৭৭।

১৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ১২০-১২৩।

আলোচনা কালে তিনি ছিলেন প্রাণবন্ত দিলখোলা। তিনি ভাল একজন কথা সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি গল্প উপন্যাস লেখেননি বটে কিন্তু তাঁর স্মৃতি কথা "স্মৃতি সাগরের ঢেউ"-এতে উপন্যাসের সব কিছু আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সাহিত্য চর্চায় তিনি সময় দিতে পারলে একজন ভাল ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসেবে আবির্ভূত হতে পারতেন'।[১৩৮]

১৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ: ১০০-১০১।

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী আন্দোলনে তাঁর চিন্তাধারা ও মূল্যায়ন

ইসলামী আন্দোলনের পরিচয়

ইসলামী আন্দোলনে আব্বাস আলী খানের অবদান

রাজনৈতিক অঙ্গনে আব্বাস আলী খানের অবদান

লেখনির মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনে অবদান

বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনে অবদান

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী আন্দোলনে তাঁর চিন্তাধারা ও মূল্যায়ন

ইসলামী আন্দোলনের পরিচয়

ইসলাম শব্দের অর্থ

ইসলাম শব্দটি س-ل-م শব্দ মূল হতে গঠিত। শব্দটি باب افعال-এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। আল- কুর'আনে আট জায়গায় اسلام শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

১. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ -'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম ।[১]

২. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ -'যে ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু তালাশ করবে, তার থেকে কোন কিছু কবুল করা হবে না'।[২]

৩. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا -'আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম'।[৩]

৪. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ -'অতঃপর আল্লাহ পাক যাকে পথ প্রদর্শণ করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন'।[৪]

৫. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا -'নিঃসন্দেহে তারা কুফুরী বাক্য বলেছে এবং মুসলমান হওয়ার পর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে, আর তারা কামনা করেছিল এমন বস্তুর যা তারা প্রাপ্ত হয়নি'।[৫]

৬. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ -'আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতপর সে তার পালন কর্তার পক্ষ থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছে'।[৬]

---

১. সূরা আলে-'ইমরান: ৩ : ১৯ ।
২. পূর্বোক্ত : ৩ : ৮৫।
৩. সূরা আল-মায়িদা: ৫: ৩ ।
৪. সূরা আল-আন'আম: ৬ : ১২৫।
৫. সূরা আত্-তাওবা: ৯ : ৭৪।
৬. সূরা আয্-যুমার: ৩৯: ২২।

৭. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ -'তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য মনে কর না'।[৭]

৮. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ -'যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হয়েও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, তার চাইতে অধিক জালেম আর কে'?[৮]

সাল্ম سلم শব্দটির নিম্নোক্ত অর্থ গুলো বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্যঃ

১. বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ উভয় বিধ অপবিত্র ও দোষত্রুটি হতে মুক্ত থাকা।
২. সন্ধি ও নিরাপত্তা।
৩. শান্তি
৪. আনুগত্য ও হুকুম পালন করা।[৯]

উক্ত অর্থগুলোর মধ্যে পবিত্র ও দোষ ত্রুটি মুক্ত হওয়া অর্থটি বিশেষ ভাবে প্রনিধান যোগ্য।

রহুল মায়ানী গ্রন্থে আস-সালাম শব্দটির নিম্নোক্ত অর্থ করা হয়েছে,

১. ذو السلامة من كل نقص وافة -'যাবতীয় বিপদাপদ ও দোষত্রুটি হতে মুক্ত'।

২. هو الذي فرجئ منه السلامه -'সেই সত্তা যার নিকট হতে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের আশা করা যায়'।

আল-কুর'আনে اسلام শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে,

১. আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য উভয় বিধ কুলুষ ও দোষত্রুটি হতে মুক্ত ও পবিত্র থাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ[১০] উহা সম্পূর্ণ দোষ ত্রুটি মুক্ত উহাতে কোন খুত থাকবে না।

২. সন্ধি ও নিরাপত্তা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ[১১] -'অতএব তোমরা হীনবল হইও না এবং সন্ধির প্রস্তাব করিও না'। অপর আয়াতে এসেছে, وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا[১২] -'আর যদি তারা সন্ধির দিকে ঝুকে পড়ে, তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুকিবে'।

ক. আনুগত্য ও বাধ্যতামূলক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ[১৩] -'বরং আজ তারা অনুগত'।

---

৭. সূরা আল-হুজরাতঃ ৪৯: ১৭।
৮. সূরা আস্-সফঃ ৬১: ৭।
৯. আবুল ফজল জামালউদ্দীন ইব্ন মানযূর আল-আফরেকী, *লিসানুল 'আরব*, ১২ খণ্ড (বৈরুতঃ দারুস সাদির, তা. বি.),পৃঃ ২৯৩।
১০. সূরা আল-বাকারাঃ ২ : ৭১।
১১. সূরা মুহাম্মদঃ ৪৭ : ৩৫।
১২. সূরা আল-আনফালঃ ৮ : ৬১।
১৩. সূরা আস্-সফফাতঃ ৩৭ : ২৬।

খ. আত্ম-সমার্পণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ[১৪] -'আমি জগত সমুহের প্রতিপালক প্রভুর নিকট আত্ম-সমার্পণ করলাম'।

গ. পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا[১৫]

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ[১৬]

ঘ. হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, [১৭] المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. -'যে ব্যক্তির জিহবা ও হাত হতে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে সেই ব্যক্তি হইতেছে প্রকৃত মুসলমান'।

ঙ. ইসলাম শব্দের পারিভাষিক অর্থে মাওলানা মওদূদী (র) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার একচ্ছত্র ও সার্বভৌম ও প্রভুত্বের ভিত্তিতে মানব জীবনের পরিপূর্ণ ইমারাত রচনা করার প্রচেষ্টা ও আন্দোলনকেই বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে বলা হয় ইসলাম'।[১৮]

ইবন মানযূর তাঁর 'লিসানুল 'আরব' গ্রন্থে الإسلام শব্দের বিশ্লেষণ বলেন,[১৯]

الإسلام من الشريعة اظهار الخضوع واظهار الشريعة والتزام لما اتي به النبي صلي الله عليه السلام وبذالك يحقق الدم ويستدفع المكروه.

-'ইসলাম শব্দের অর্থ হইতেছে আনুগত্য প্রকাশ ও আত্মসমার্পণ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক আল্লাহ তা'আলার নিকট হইতে আনিত সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ ও ধারণ'।

কারও কারও মতে ইসলামের সংজ্ঞা এই,

الإِسْلاَمُ هُوَ الإنقياد لله ولرسوله عليه السّلام بتلفظ كلمتى الشهادة والامتثال بالواجبات والإجتناب عن المنهيات.

-'শাহাদাতের বাণী উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য মেনে নিয়ে তাদের নির্দেশাবলী পালন ও নিষেধাবলী পরিহার করার নামই হলো ইসলাম'।[২০]

---

১৪. সূরা আল-বাকারা: ২ : ১৩১।
১৫. সূরা আল-মায়িদা: ৫ : ৩।
১৬. সূরা আলে-'ইমরান: ৩ : ১৯।
১৭. আবুল আববাস যইনুদ-দীন আহমদ যবীদীর অনূদিত, বুখারী, ১ম খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৫৮ খ্রী:), পৃ: ১৪।
১৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী বিপ্লবের পথ* (ঢাকা: খায়রুল প্রকাশনী, ২০০১ খ্রী:), পৃ:১৭।
১৯. আবুল ফজল জামালউদ্দীন ইবন মানযূর আল-আফরেকী, *লিসানুল 'আরব*, ১২ খণ্ড, পৃ: ২৯৩।
২০. মুহাম্মদ শফিউল আলম ভুইয়া, *আরকানুল ঈমান* (ঢাকা: ব্রাদার্স পেপার এণ্ড পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯ খ্রী:), পৃ: ৮২।

চ. হযরত 'ওমর (রা) বর্ণিত হাদীসে জিব্রাইল-এ আগান্তুক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বলেন,[২১]

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلاّ اللهُ وَأنّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وتقيم الصلوة وتؤتي الزكوة وتصوم رَمَضَانَ وتحج البيت ان استطعت إليه سَبِيلاً.

-'ইসলাম হলো তুমি এ কথা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহা ও আনুগত্য করার যোগ্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁর রাসূলুল্লাহ্, নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমজান মাসে রোজা রাখবে এবং সামর্থ থাকলে হজ্জ পালন করবে'।

ছ. মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, 'আল্লাহ ও রাসূলের পথ অনুসরণ, বিপরীত সকল মত ও পথ পরিহার করার নামই ইসলাম'।[২২] মোট কথা আল্লাহর নিকট আত্মসমার্পণ ও তাঁর বিধানের প্রতি আনুগত্য করাকে বলা হয় ইসলাম।[২৩]

আন্দোলন

আন্দোলন শব্দটি দোলনা থেকে গৃহীত মূলতঃ যা কায়েম নেই বা চালু নেই তা বাস্তবে কায়েমের চেষ্টা করাকে আন্দোলন বলে।[২৪] রাজনৈতিক পরিভাষা Movement বা حركة ।

ক. সাধারণ অর্থে কোন দাবী দাওয়া প্রতিষ্ঠার জন্য এবং কোন কিছু রদ বা বাতিল করার জন্য কিছু লোকের সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করা।[২৫]

খ. সামগ্রিক অর্থে প্রতিষ্ঠিত কোন কিছুকে অপসরণ করে সেখানে নতুন কিছু কায়েম করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা, প্রাণান্তকর চেষ্টা করাই হলো আন্দোলন।[২৬]

গ. রাজনৈতিক দৃষ্টি কোন থেকে এর অর্থ হলো: একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করে অন্য একটা ব্যবস্থা কায়েমের চেষ্টা করার নাম আন্দোলন।[২৭]

---

২১. মাওলানা আব্দুর রহীম, *হাদীস শরীফ*, ১ম খণ্ড (ঢাকা : খায়রুল প্রকাশনী, ২৩ তম প্রকাশ, ২০০৫ খ্রী:), পৃ: ১৪।

২২. মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, *ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন* (ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, ১১ম প্রকাশ, ২০০৪ খ্রী:), পৃ: ৭।

২৩. অধ্যাপক গোলাম আযম, *স্টাডি সার্কেল*, পৃ: ৬৭।

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ: ১১৩।

২৫. মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, *ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন*, পৃ:৭, ৯।

২৬. তদেব।

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ৭, ৯।

ঘ. আদর্শিক দৃষ্টিকোন থেকে আন্দোলনের অর্থ হলো : একটি দেশের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তণ ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত সংঘবদ্ধ ও সুসংগঠিত প্রচেষ্টাই সত্যিকার অর্থে আন্দোলন নামে অভিহিত।[২৮] মোট কথা কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পরিচালিত সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা বা সংগ্রাম সাধনার নামই আন্দোলন।

ইসলামী আন্দোলন

কুর'আনী পরিভাষায় ইসলামী আন্দোলনকে جهاد في سبيل الله নামে অভিহিত করা হয়।

ক. মাওলানা মওদুদী বলেন, 'ইসলাম একটি বিপ্লবী মতাদর্শ। সমগ্র পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে উহার নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী নতুন করে ইহা ঢেলে গঠন করাই ইসলামের চরম লক্ষ্য। আর মুসলমান একটি আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দল বিশেষ। ইসলামের বাঞ্ছিত কার্যসূচী বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যেই তাদের সংঘবদ্ধ করা হয়েছে। আর এ উদ্দেশ্য লাভের জন্য ইসলামী দলের বিপ্লবী চেষ্টা সাধনা ও চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগের নামই হলো جهاد في سبيل الله বা ইসলামী আন্দোলন'।[২৯]

খ. অধ্যাপক ইউসুফ আলীর মতে, 'ইসলাম মানুষের নিকট আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান। নবী রাসূলগণ ইসলামকে দুনিয়ার বুকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। সেই পূর্ণাঙ্গ ইসলামকে মানব সমাজে কায়েম করা এবং চালু করার যে চুড়ান্ত চেষ্টা সাধনার কাজ, সেই কাজেরই নাম ইসলামী আন্দোলন'।[৩০]

গ. আব্বাস আলী খান বলেন, 'বাতিল মতবাদ, চিন্তাধারা ও জীবন বিধান খতম করে এবং তার অন্তঃসারশূণ্যতা ও অনিষ্টকারীতাকে প্রতিপন্ন করে, তার পরিবর্তে মানব জাতির জন্য আল্লাহর দেয়া একমাত্র জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই ইসলামী আন্দোলন'।[৩১]

ঘ. হাবিবুর রহমান বলেন, 'দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে চেষ্টা সাধনাই আল্লাহর পথে জিহাদ'।[৩২]

ঙ. অধ্যাপক গোলাম আযমের ভাষায়, 'যে দেশে আল্লাহর আইন ও রাসূলের আদর্শ কায়েম নেই, সে দেশে তা কায়েমের চেষ্টাই হলো ইসলামী আন্দোলন'।[৩৩]

উপরোক্ত আলোচনা হতে আমরা বলতে পারি আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত কিছু সংখ্যক লোকের সম্মিলিত ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার নাম ইসলামী আন্দোলন।

---

২৮. তদেব।
২৯. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *আল্লাহর পথে জিহাদ* (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৪সং, ২০০৪ খ্রীঃ), পৃঃ ৬।
৩০. অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, *ইসলামী বিপ্লব সাধনে সংগঠন* (ঢাকাঃ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, ২০০১ খ্রীঃ), পৃঃ ২৭।
৩১. আব্বাস আলী খান, *জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (ঢাকাঃ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, ১৯৯৬ খ্রীঃ), পৃঃ ১১।
৩২. প্রফেসর এম. আনোয়ারুল ইসলাম, *জিহাদের গুরুত্ব ও শহীদের মর্যাদা* (রাজশাহী : ইসলাম প্রকাশনী, ২০০১খ্রীঃ), পৃঃ ৬।
৩৩. অধ্যাপক গোলাম আযম, *স্টাডি সার্কেল*, পৃঃ ১১৩।

ইসলামী আন্দোলনের পরিধি

মানব জাতির নিকট আল্লাহর দ্বীন কবুল, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব গ্রহণ এবং গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব ও কতৃত্ব বর্জনের আহবান করার এক পর্যায়ে কায়েমী স্বার্থের সংগে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। জিহাদ ফি-ছাবিলিল্লাহর কাজে অংশ গ্রহণকারীকে এ বাতিল শক্তির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। এ যুদ্ধ ইসলামী আন্দোলনের গোটা কার্যক্রমের অংশ মাত্র। বিশেষজ্ঞগণ ইসলামী আন্দোলনের এ কার্যক্রম গুলোকে ৫টি ভাগে ভাগ করেছেন।[৩৪] কুর'আন ও হাদীসের আলোকে কাজ গুলোর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই।

দা'ওয়াত ইলাল্লাহ

আল্লাহর জমীনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নবী রাসূলগণ পরিচালনা করেছেন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) সহ সকল নবীগণ এ দা'ওয়াতের মাধ্যমে তাঁদের আন্দোলনের সূচনা করেন।[৩৫] নিম্নে কয়েক জন নবীর দা'ওয়াতের নমুনা তুলে ধরা হলোঃ

ক. হযরত নুহ (আ)-এর দাওয়াত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ"[৩৬]

-'আমি নূহ (আ)-কে তাঁর কওমের নিকট পাঠিয়েছিলাম তিনি তাঁর কওমকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন প্রভু নেই'।

খ. হযরত হুদ (আ) এর দা'ওয়াত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ"[৩৭]

-'আদ জাতির নিকট আমি তাদের ভাই হুদ (আ)-কে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বললেন, হে আমার দেশাবাসী তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহা নেই'।

গ. হযরত সালেহ (আ)-এর দা'ওয়াত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ"[৩৮]

-'সামুদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালেহ (আ)-কে পাঠিয়েছিলাম। তিনি তাঁর দেশবাসীকে ডাক দিয়ে বললেন 'হে আমার কওমের লোকেরা! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া কোন ইলাহা নেই'।

---

৩৪. মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, *ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন*, পৃ: ১০-১১।

৩৫. তদেব।

৩৬. সূরা আল-আ'রাফ: ৭: ৫৯।

৩৭. পূর্বোক্ত : ৭: ৬৫।

৩৮. পূর্বোক্ত: ৭: ৭৩।

ঘ. হযরত শু'আইব (আ)-এর দা'ওয়াত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ [৩৯]

-'মাদইয়ান বাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েব (আ)-কে পঠিয়েছিলাম। তিনি তার কওমকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া কোন ইলাহা নেই'।

ঙ. এভাবে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) মানব জাতিকে আল্লাহর দাসত্ব কবুলের জন্য আহবান জানিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [৪০]

-'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রভূর 'ইবাদত কর। যিনি তোমাদের এবং তোমাদরে পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। সম্ভবত তোমরা খোদাভীরু হতে পারবে'।

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا [৪১]

-'হে নবী! আমি আপনাকে স্বাক্ষী রুপে, সুসংবাদ দানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি এবং খোদার নির্দেশে তাঁর প্রতি আহবানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপ রুপে পাঠিয়েছি'।

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ [৪২]

-'ডাক তোমার রবের পথের দিকে, হিকমত ও উত্তম নসীহতের সাথে'।

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ [৪৩]

-'হে মুহাম্মদ (সা) বলেদিন! এটাই আমার পথ। যে পথে আমি আল্লাহর দিকে আহবান জানাই'।

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ [৪৪]

-'আর সে ব্যক্তির কথার চেয়ে উত্তম কথা হতে পারে কি? যে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহবান জানায় এবং ঘোষণা করে যে, আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত'।

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [৪৫]

-'তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকা দরকার যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং তারা ভাল কাজের নির্দেশ করবে ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখবে'।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [৪৬]

---

৩৯. পূর্বোক্ত: ৭: ৮৫।
৪০. সূরা আল-বাকারা: ২: ২১।
৪১. সূরা আল-আহযাব: ৩৩: ৪৫।
৪২. সূরা আন্-নাহাল: ১৬: ১২৫।
৪৩. সূরা ইউসুফ: ১২: ১০৮।
৪৪. সূরা হা-মিম আস-সাজদাহ: ৪১: ৩৩।
৪৫. সূরা আলে-'ইমরান: ৩: ১০৪।
৪৬. সূরা আলে-'ইমরান: ৩ আয়াত: ১১০।

-'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি! তোমাদেরকে মানুষের মধ্য হতে বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজ হতে বিরত রাখবে'।

সুতরাং স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, সমস্ত নবী ও রাসুলদের দাওয়াতের মূল সুর ও মূল আবেদন এক ও অভিন্ন ছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً -'আমার নিকট থেকে একটি বাক্য শুনে থাকলে তা অন্যের নিকট পৌছে দাও।[৪৭]

শাহাদাত 'আলান্নাস

শাহাদাত মূলতঃ দাওয়াতেরই একটা রুপ। জীবন্ত নমুনা হিসেবে পেশ করার মাধ্যমেই যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণ তাঁদের দাওয়াতকে মানব জাতির নিকট উপস্থাপন করেছেন। এ স্বাক্ষ্য তাঁরা মৌখিক ভাবে দিয়েছেন এবং এর ভিত্তিতে তাদের আমল আখলাক গড়ে তুলেছেন। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এ ব্যাপারে উত্তম ও পরিপূর্ণ আদর্শ উপস্থাপন করেছেন।[৪৮] সুতরাং তিনি হলেন সকলের জন্য দাওয়াতের বাস্তব নমুনা, মূর্তপ্রতীক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا[৪৯]

-'আমি তোমাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পাঠিয়েছি সত্যের স্বাক্ষীরুপে যেমন স্বাক্ষীরুপে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পাঠিয়েছিলাম ফেরাউনের প্রতি'।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا[৫০]

-'এভাবে আমি তোমাদের একটি উত্তম জাতিরুপে গড়ে তুলেছি, যাতে করে তোমরা গোটা মানব জাতির জন্য সত্যের সাক্ষ্য দাতা হতে পার এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেন তোমাদের জন্য সাক্ষ্য বা নমুনা হন'।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ[৫১]

-'হে ঈমানদাগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য সত্যের সাক্ষ্য হয়ে দাড়াও'।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ[৫২]

-'যার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে, সে যদি তা গোপন করে তাহলে তাঁর চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে'?

অতএব আল্লাহর রাসূল (সা)-কে উসওয়াতুন হাসানা হিসেবে গ্রহণ করা এবং তাঁর আদর্শের অনুসারী হিসাবে শাহাদাত আ'লানন্নাস এর ভূমিকা পালনের প্রতি আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন।

৪৭. খতীব আত্-তাবরিযমী, *মিশকাতুল মাসাবীহ* (করাচী : নূর মুহাম্মদ লাইব্রেরী, তাঃ বি), পৃঃ ৩২-৩৫।
৪৮. মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, *ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন*, পৃঃ ১৫।
৪৯. সূরা আল-মুযযাম্মিল: ৭৩: ১৫।
৫০. সূরা আল-বাকারা: ২: ১৪৩।
৫১. সূরা আল-মায়েদা: ৫: ৮।
৫২. সূরা আল-বাকারা: ২: ১৪০।

কিতাল ফি সাবী লিল্লাহ

قِتَالٌ শব্দের বিশ্লেষণ: এটা আরবী শব্দ। যার শাব্দিক অর্থ পরস্পর মুকাবেলা করা।

ইসলামী আন্দোলনের এ পথে সংঘাত ও সংঘর্ষ অনিবার্য। খোদাদ্রোহী শক্তির বিরোধীতার জবাবে দায়ীদেরকে ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণীর লোকেরা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে যখন দায়ীদেরকে নিশ্চিহ্ন করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন তাদের প্রতিরোধ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ[৫৩]

-'ফেতনা ফাসাদ মূলোৎপাটিত হয়ে দ্বীন পরিপূর্ণরূপে কায়েম না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই অব্যাহত রাখ'।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ[৫৪]

-'ফেতনা দূরীভুত হয়ে দ্বীন কায়েম না হওয়া পর্যন্ত লড়াই করতে থাক'।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ه الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ.[৫৫]

-'তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কেন আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না? অথচ নির্যাতিত নারী পুরুষ আর শিশুরা আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করছে হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে জালিম অধ্যশিত জনপদ থেকে বের করে নাও। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী এবং একজন অবিভাবক প্রেরণ কর। যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর যারা কাফির তারা লড়াই করে শয়তানের পথে'।

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.[৫৬]

-'যুদ্ধ কর আহলি কিতাবীদের সেই সব লোকদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষন করে না। আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল যা হারাম করে দিয়েছন তাকে হারাম সাব্যস্ত করে না। তাদরে সাথে লড়াই অব্যাহত রাখ যতক্ষ না তারা নিজেদের হাতে যিযিয়া দিতে ও ছোট হয়ে থাকতে

---

৫৩. সূরা আল-আনফাল: ৮: ৩৯।
৫৪. সূরা আল-বাকারা: ২: ১৯৩।
৫৫. সূরা আন-নিসা: ৪: ৭৫।
৫৬. সূরা আত্-তাওবা: ৯: ২৯।

প্রস্তুত হয়। আর জিহাদ ফি ছাবিলিল্লাহর এ কাজ মূলতঃ ঈমানের দাবী পুরণের উপায় হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে'। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ[৫৭]

-'যারা ঈমানের ঘোষণা দিয়েছেন তাদের জান-মাল আল্লাহ খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে জান ও মাল দিয়ে। এ লড়াইয়ে তারা জীবন দেবে এবং জীবন নেবে'।

সুতরাং নিদ্বিধায় বলা যায় আল্লাহ তা'আলা কিতালের এ নির্দেশ দিয়েছেন মূলতঃ ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য। এর মাধ্যমে সমাজ থেকে অশান্তি ফেৎনা, ফাসাদ চিরতরে মূলৎপাঠিত হবে।

ইকামতে দ্বীন

দ্বীন শব্দের শাব্দিক অর্থ শক্তি, ক্ষমতা, শাসন-কতৃত্ব, অপরকে আনুগত্যের জন্য বাধ্য করা, তার ওপর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করা, তাকে গোলাম ও আদেশানুগত করা।[৫৮] আর ইকামতে দ্বীন অর্থ দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা করা। দ্বীন কায়েম বলতে বুঝায় কোন একটা জনপদে বা রাষ্ট্রে দ্বীন ইসলাম বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।[৫৯] তাই যে সামাজে বা রাষ্ট্রে দ্বীন বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত নেই, সে সমাজে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নবী রাসূলগণের প্রধান দায়িত্ব ছিল দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৬০]

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

-'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই নিয়ম কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছেন যার নির্দেশ তিনি নুহ (আ) কে দিয়েছেন। আর যারা এখন তোমার প্রতি যে হেদায়াত অহির মাধ্যমে প্রদান করেছি, আর সেই হেদায়াত যা আমি ইবরাহীম (আ), মূসা (আ)-এর প্রতি প্রদান করেছিলাম। (সব নির্দেশের সার কথা ছিল) তোমরা দ্বীন কায়েম কর । এই ব্যাপারে পরস্পরে দলাদলিতে লিপ্ত হবে না'।

আর এভাবে দ্বীন কায়েমের চুড়ান্ত প্রচেষ্টা করাই হলো ইসলামী আন্দোলনের জাগতিক উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে পারলৌকিক নাজাত বা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব।

---

৫৭. পূর্বোক্ত: ৯: ১১১।
৫৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা* (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৯ম প্রকাশ, ২০০৪ খ্রী:), পৃ: ১০৬।
৫৯. মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, *ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন*, পৃ: ১৮।
৬০. সূরা আশ-শুরা: ৪২: ১৩।

আমর বিল মারুফ ও নেহী 'আনিল মুনকার

ইসলামী আন্দোলনের সর্বশেষ কাজটি হলো ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ হতে বাধা প্রদান কর।

দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই কেবল এ কাজটি করা সম্ভব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ [৬১]

-'এরাতো ঐসব লোক যাদেরকে আমি দুনিয়ায় ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব দান করলে তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করবে'।

উপরোক্ত পাঁচটি কর্মসূচীর সামষ্টিক নাম হলো جهاد في سبيل الله বা ইসলামী আন্দোলন।

ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

কুর'আন ও হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, ইসলামী আন্দোলনের কাজ করা ফরজ। শুধু ফরজ নয় বরং সব ফরজের বড় ফরজ। কারণ এ কাজ ব্যতীত অন্যান্য ফরজ কাজ সমুহ পরিপূর্ণ ভাবে পালন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,[৬২]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.

-'হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসার কথা বলব না। যে ব্যবসা তোমাদের কিয়ামতের কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করবে? তোমরা আল্লাহর এবং রাসুলের প্রতি ঈমান আনবে আর নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা তা বুঝতে পার।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ [৬৩]

-'তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের স্থিতি সুদৃঢ় করে দিবেন'।

ইসলামী আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারীকে আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,[৬৪]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

---

৬১. সূরা আল-হজ্: ২২: ৪১।
৬২. সূরা আস-সফ, ৬১: ১০-১১।
৬৩. সূরা মুহাম্মদ: ৬১: ৭।
৬৪. সূরা আল-মায়েদা: ৫: ৫৪।

-'তোমাদের মধ্য থেকে যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শণ করবে; তাদের পরিবর্তে আল্লাহ অন্য কোন সম্প্রদায়কে এই কাজের দায়িত্ব দেবেন । তারা আল্লাহকে ভালবাসবে আর আল্লাহও তাদেরকে ভালবাসবেন, তারা মুমিনদের প্রতি হবে দয়ালু আর কাফিরদের প্রতি হবে কঠোর। তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে এক্ষেত্রে কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদের পরোয়া করবে না। এটাতো আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানী। তিনি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি এই বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শণ করেন। আল্লাহ তো গভীর জ্ঞানের অধিকারী'।

ভালবাসার পাশাপাশি আল্লাহ তাদরেকে ক্ষমা ও জান্নাতে প্রবেশের ঘোষণাও দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৬৫]

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

-'আল্লাহ তোমাদের গুনাহ খাতা মাফ করে দিবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত রেয়েছে। সদা বসন্ত বিরাজমান জান্নাতে উত্তম ঘর তোমাদেরকে দান করা হবে। এটাই হলো সবচেয়ে বড় সাফল্য ।"

ইসলামী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ না করার পরিনতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৬৬]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا.

-'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমাদেরকে যখন আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়তে বলা হয় তখন তোমরা মাটি আকড়ে পড়ে থাক। তোমরা কি দুনিয়ার জিন্দেগী নিয়েই খুশি থাকতে চাও। অথচ দুনিয়ার এই পার্থিব জীবনতো আখিরাতের তুলনায় কিছুই নয়। যদি তোমরা বের না হও তাহলে তোমাদের জায়গায় আল্লাহ অন্য জাতিকে স্থলাভিসিক্ত করে দেবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।

হযরত আবু জর গিফারী (রা) নবী করিম (সা) থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা রকলাম اي الاعمال افضل কোন কাজটি সর্বোত্তম? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, الايمان بالله والجهاد في سبيل الله[৬৭] -'শ্রেষ্ঠ কাজ হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা'।

---

৬৫. সূরা আস-সফ: ৬১: ১২।

৬৬. সূরা আত-তাওবা: ৯: ৩৮-৩৯।

৬৭. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহ আল-বুখারী*, অনুবাদ: আবুল আব্বাস যইনদ-দীন আহমদ যবীদরী, ১ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৫৮ খ্রী:), পৃ: ১৯।

হযরত হারিস আল-আশয়ারী (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,[৬৮]

انا امركم بخمس والله امرني بهن والجماعة والسمع والطعات والهجرة والجهاد في سبيل الله

-'আমি তোমাদের পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যে পাঁচটি বিষয় আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। সংগঠন, শ্রবণ, আনুগত্য, হিযরত এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা'।

অতএব আমরা বলতে পারি ইসলামী আন্দোলন নিছক কোন রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, আবার আধুনিক যুগের কোন নতুন আবিস্কারও নয়। এ আন্দোলনের মাধ্যমেই শরীয়তের প্রধানতম ফরজ কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব। ঈমানের দাবী পুরুন এবং আখেরাতে নাজাত পেতে হলে ইসলামী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই।

ইসলামী আন্দোলনে আব্বাস আলী খানের অবদান

আববাস আলী খান এক জন মুসলমান ও ইমানদার বান্দার দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। ফলে উপরোক্ত কুর'আন ও হাদীসের ভাষ্য ইসলামী আন্দোলনে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। যার কারণে তিনি ইসলামী আন্দোলনে নিজকে উৎসর্গ করেছিলেন। মূলতঃ আব্বাস আলী খান ছিলেন বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি।[৬৯] তিনি ছিলেন এ দেশের লক্ষ লক্ষ ইসলামী জনতার মহান শিক্ষকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে সত্যিকার আধ্যাত্মিকতা বা তাজকিয়ায়ে নফসের দাবী পূরণে পূর্ণভাবে সক্ষম ও সহায়ক মনে করেই তিনি মনে প্রাণে ইসলামী আন্দোলনকে গ্রহণ করেন। জামায়াতের একজন সাধারণ কর্মী থেকে তিনি দলের শীর্ষ পদ অলংকৃত করেন। ইসলামী আন্দোলনের আনুগত্য ও শৃংখলার প্রশ্নে তাঁর অতীতের জীবনের মর্যাদার অনুভূতি কখনও অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। ব্যাপক পড়া-শুনা ও গবেষণার পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে মাওলানা মওদূদী (র) পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তিনি জামায়াতে ইসলামীর হাল ধরেছিলেন। তাঁর দৃঢ়তা, সাহসিকতা, প্রজ্ঞা ও সাংগঠনিক দক্ষতায় তিনি জামায়াতে ইসলামীর কান্ডরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। নানাঘাত, প্রতিঘাত, চড়াই উৎরাই সত্ত্বেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আন্দোলনের ময়দানে অটল, অবিচল থাকতে সক্ষম হন। এ পর্যায়ে আমরা তাঁর সাংগঠনিক জীবন, রাজনৈতিক ময়দানে ভূমিকা ও ইসলামী আন্দোলন সংক্রান্ত তাঁর লেখনি এবং বক্তৃতা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

---

৬৮. মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত-তিরমিজী, *আল-জামি'উত-তিরমিযী*, ২য় খণ্ড (দিল্লি : আমিন কোম্পানী, তা বি), পৃ: ১২৯।
৬৯. আব্দুস শহীদ নাসিম, *আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃ: ৩৩।

সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড

১৯৫৫ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে যোগদান করেন। কিছুদিন পর তিনি তাঁর নিজ এলাকায় একটি ইউনিট[৭০] গঠন করেন। এ ইউনিটের সভাপতি হিসেবে তিনি তাঁর সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা শুরু করেন। ১৯৫৬ সালের মাঝা-মাঝি সময়ে তৎকালীন রাজশাহী বিভাগীয় জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের নিকট তিনি সংগঠনের রুকন[৭১] হিসেবে বাইয়াত[৭২] গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে ইসলামী আন্দোলনের নিকট সোপর্দ করেন।[৭৩] এ বছরই মাওলানা মওদূদী (র) পূর্ব-পাকিস্তানে সফরে আসলে তিনি তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেন। খান সাহেব

---

৭০. ইউনিট জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের একটি সাংগঠনিক পরিভাষা । এটা জামায়াতে ইসলামীর মূল সাংগঠনিক কেন্দ্র। থানা বা উইনিয়ন সংঘঠনের অধীনে ছোট ছোট এলাকাকে কেন্দ্র করে তিন বা তার অধিক কর্মী নিয়ে ইউনিট গঠিত হয়। ইউনিটে একজন সভাপতি থাকেন। জামায়াতের বক্তব্য জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং চারদফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ও উর্ধ্বতন সংগঠনের নির্দেশ পালন করাই এ ইউনিট গুলোর কাজ।
দ্র: *সংগঠন পদ্ধতি*, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ (ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, ২০০৭ খ্রী:), পৃ: ৩৮।

৭১. রুকনের বহুবচন আরকান। শাব্দিক অর্থ Support বা Prop, অবলম্বন, আশ্রয়, নির্ভর, সমর্থন, ভার বহন, আস্থা, শক্তির উৎস, মজবুত অংশ, স্তম্ভ ইত্যাদি। যেহেতু স্তম্ভ বা খুটির উপর অবলম্বন করেই কোন ঘর খাড়া থাকে এবং স্তম্ভই ছাদের ভার বহন করে, সেহেতু Seconday অর্থে স্তম্ভকে রুকন বলা হয়। কাবা ঘরে তাওয়াফ করার সময় যে কোনে হাত ছুতেঁ হয় তাকে রুকনে ইয়ামান বলা হয়। নামাজের প্রস্তুতি মূলক ফরজ সমূহকে এ জন্যই রুকন বলা হয় যে, এ সবের উপর নামাজ শুদ্ধ হওয়া নির্ভর করে। পবিত্র কুরআনে দু' জায়গায় রুকন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।
قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ
দ্র:সূরা হুদ: ১১ :৮০।
এখানে ركن شديد অর্থ মজবুত অবলম্বন বা আশ্রয়।
فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ
দ্র: সূরা যারিয়াত: ৫১ : ৩৯।
এখানে ركن অর্থ শক্তি। জামায়াতে ইসলামী ও এর সদস্য গণকে এ দুটো অর্থেই রুকন আখ্যা দেয়া হয়। পরিভাষায় জামায়াতে ইসলামীর যে সকল জনশক্তি আল্লাহর পথে জান, মাল এবং শ্রম ও মেধা কুরবানী করার রক্তশপথ গ্রহণ করেন তাদরেকে রুকন বলা হয়। এই রুকনদের উপর নির্ভর করে জামায়াত তাঁর পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকেন।
দ্র: অধ্যাপক গোলাম আযম, *রুকনিয়াতের দায়িত্ব* (ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, ১৯৮৭ খ্রী:), পৃ: ৪।

৭২. বাইয়াত শব্দটি بَيْعٌ থেকে গৃহীত। আরবী অভিধানে অর্থ হলো : (১) বেচা- কেনা, লেন- দেন, বিক্রয় করা, (২) বাইয়াতের গৌন অর্থ চুক্তি, শপথ, অঙ্গিকার, আনুগত্য স্বীকার করা। (৩) Milton Cowan বাইয়াতের অর্থে বলেন- To sell, to make a contract, to pay homge to acknowledge as sovereign or leader. To offer for sale. To buy to parchase, (৪) তাছাড়া বাইয়াত শব্দটি Agreement. arrangement, business deal. Commercial. Transaction, bargain sale. ইত্যাদি। জামায়াতে ইসলামী "রুকনিয়তের" জন্য যে শপথ বাক্য পাঠ করতে হয়, পরিভাষায়, সেই শপথকে বাইয়াত বলা হয। এই বাইয়াতে যা বলতে হয় তাহলো (১) আল্লাহ তা'আলাকে স্বাক্ষী রেখে পূর্ণ দায়িত্ব বোধের সাথে কলেমায়ে শাহাদতের মাধ্যমে তাওহীদ, রেসালাতের ঘোষণা প্রদান। (২) আল্লাহর দ্বীনকে কায়েমের সর্বাত্মক চেষ্টা করার মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। (৩) জামায়াতের গঠনতন্ত্র মোতাবেক সংগঠনের পূর্ণ আনুগত্য করার ওয়াদা করা। (৪) إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي رَبِّ الْعَالَمِينَ -'বলে নিজের জান-মালসহ সমগ্র সত্তাকে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের মর্জির নিকট স্বপর্দ করা'।
দ্র: অধ্যাপক গোলাম আযম, *বাইয়াতের হাকিকত* (ঢাকা: আল আজমী পাবলিকেশন্স, ৪র্থ সং, ১৯৮৯ খ্রী:), পৃ: ২; অধ্যাপক গোলাম আযম, *রুকনিয়াতের দায়িত্ব*, পৃ: ৯।

৭৩. রুকনিয়াতের শপথ গ্রহণের পর প্রতিক্রিয়ায় খান সাহেব বলেন, এ শপথের মাধ্যমে আমি আমার জান-মাল আল্লাহর নিকট বিক্রয় করে দিলাম এবং আল্লাহর খরিদ করা জান-মাল তাঁরই পথে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এবার সত্যিই সঠিক পথের সন্ধান পেলাম। যে পথের সন্ধান ইলমে তাসাউফ আমাকে দিতে পারেনি। ভাগ্য ভাল নইলে আরো কিছু কাল ইলমে তাসাউফের ময়দানে থাকলে বাতিলের সাথে সংগ্রাম করার হিম্মত হারিয়ে জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে হুজরায় অর্থহীন তপ-জফ জীবন কাটিয়ে দিতাম।
দ্র: আববাস আলী খান, *স্মৃতি সাগরের ঢেউ*, পৃ ১৩৩।

ভাল উর্দু জানায় বিভিন্ন সভা-সমাবেশে তিনি মাওলানার দোভাষীর দায়িত্ব পালন করেন।[৭৪] ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নিখিল পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর রুকন সম্মেলন পাঞ্জাব প্রদেশের নাহাওয়ালপুর বিভাগের মাছিগোটে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে খান সাহেব সহ মোট দশজন রুকন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে যোগদান করেন।[৭৫] এ সম্মেলন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৫৮ সালে সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁর ওপর রাজশাহী বিভাগীয় আমীরের দায়িত্ব অর্পন করা হয় এবং ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন।[৭৬] এ সময় অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করে তিনি সংগঠন পরিচালনা করেছেন। তিনি কখনো সাইকেলে, কখনো রেল গাড়ীতে, কখনো গরুর গাড়ী, কখনোই বা পাঁয়ে হেঁটে উত্তর বঙ্গের প্রতিটি জেলায় জেলায় সাংগঠনিক সফর করে ইসলামের সুমহান দাওয়াত সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করতেন। ১৯৭২ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধানে ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করলে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের রাজানীতি নিষিদ্ধ হয়ে যায় এবং ১৯৭৫ সালের মে মাস পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের রাজনীতিতে নিষিদ্ধ থাকে।[৭৭] এ দীর্ঘ ৭ বছর সময় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ গোপনে তাদের সাংগঠনিক তৎপরতা অব্যাহত রাখে। ১৯৭৮ সালে সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি প্রায় এক বছর ঢাকা শহরে একজন সাধরণ রুকন হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে কোন প্রাকার দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করেননি।[৭৮] ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সরকার রাজনৈতিক দল সমুহের উপর থেকে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ বিধি বাতিল ঘোষণা করার ফলে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ আবার বৈধ রাজনৈতিক দল হিসেবে এ দেশে নতুন ভাবে প্রকাশ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করার সুযোগ পায়। ১৯৭৯ সালের ২৫ থেকে ২৭ মে পর্যন্ত হোটেল ইডেন চত্বরে জাতীয় কনভেনশনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশ্যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পুনরায় আত্ম প্রকাশ করে।[৭৯] এ সম্মেলনে আব্বাস আলী খানকে ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব দেয়া হয়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এদেশে নতুন ভাবে কাজ করার পিছনে খান সাহেবের বিরাট অবদান রয়েছে। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৭ বছর জামায়াতে ইসলমী বাংলাদেশ রাজনৈতিক অংগনে অনুপস্থিতি থাকায় ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন তথা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কমুনিষ্ট ও ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা এক তরফা ভাবে নানা অপপ্রচার চালিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। এমনি একটি প্রতিকূল পরিবেশে কঠিন পরিস্থিতিতে আববাস আলী খান জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতৃত্বের হাল ধরে

---

৭৪. অধ্যাপক গোলাম আযম, *জীবনে যা দেখলাম*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রী:), পৃ: ২১৫।

৭৫. নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৭৬; আববাস আলী খান, *স্মৃতি সাগরের ঢেউ*, পৃ: ১৩৯।

৭৬. অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, *স্মৃতির পাতায় জননেতা আব্বাস আলী খান*, পৃ: ১৩; নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৮১।

৭৭. হাসান মুহাম্মদ, *ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা ও বাংলাদেশের রাজনীতি* (১৯৭২-৭৬), পৃ: ৪১-৪৬; আব্দুস শহীদ নাসিম, *আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃ: ১০১।

৭৮. নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ১০১।

৭৯. অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, *স্মৃতি পাতায় জননেতা আব্বাস আলী খান*, পৃ: ১৫; ড. হাসান মোহাম্মদ, *জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ*, পৃ: ৯।

অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে সাংবাদিক সম্মেলন সহ বিভিন্ন সভা সমাবেশে যুক্তিপূর্ণ ভাবে জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য জনগণের সামনে উপস্থাপন করে এদেশের সর্বমহলে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনকে গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তুলতে তিনি ঐতিহাসিক অবদান রেখেছেন।[৮০] ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ বৈরী রাজনৈতিক পরিবেশে প্রায় চৌদ্দ বছর তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করেন।[৮১] ১৯৯২ সালে অধ্যাপক গোলাম আযম আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করলে মৃত্যু পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত (৩ অক্টোবর ১৯৯৯) তিনি কেন্দ্রীয় সিনিয়র নায়েবে আমীরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৮২] তাঁর সাংগঠনিক জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৯৫৫ সাল থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত (৪৪ বছর) চুয়াল্লিশ বছর তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে একজন খাঁটি মুজাহিদ হিসেবে ইকামতে দ্বীনের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। তৈরী করেছেন হাজার হাজার কর্মী।

রাজনৈতিক অংগনে আব্বাস আলী খানের অবদান

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য খান সাহেব রাজনৈতিক অংগনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর দক্ষ নেতৃত্বে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন অনেক টা সফল হয়েছে। ১৯৪২ সালে শের-ই বাংলা এ. কে. ফজলুল হক-এর সংস্পর্শে এসে তিনি রাজনীতির প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হন । ১৯৫৮ সালে ৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান[৮৩] পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী করে নিজের মত করে "মৌলিক গণতন্ত্র"[৮৪] (Basic Democracy) নামে শাসনতন্ত্র প্রনয়ণ করেন। সে সাথে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল

---

৮০. আব্দুস শহীদ নাসিম, *আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃঃ ৫০।

৮১. তদেব।

৮২. তদেব, পৃঃ ১৪।

৮৩. আইয়ুব খান একজন সামরিক শাসক ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ১৯০৮ সালে সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অ্যাবোটাবাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪৭ সালের ২৫ এপ্রিল তিনি ইন্তিকাল করেন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংল্যাণ্ডের স্যান্ডহার্স্ট রয়েল মিলিটারী কলেজে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ১৯২৮ সালে তিনি পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে তিনি মেজর জেনারেল পদে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ডিভিশনের জি.ও.সি. (General Officer Commanding) নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের দেশ রক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার সংগে যোগসাজশে তিনি পাকিস্তানের সামরিক শাসন জারী এবং ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল করেন। একই বছরের ২৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতা চ্যুত করে আইয়ুব খান নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা দেন। ১৯৬২ সালে ১ মার্চ প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির শাসনতন্ত্র জারী করে তিনি বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হন। ১৯৬৫ সালে ১ জানুয়ারী পরোক্ষ পদ্ধতিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে তিনি বিরোধী দল কর্তৃক সমর্থিত প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী মিস ফাতেমা জিন্নাহকে পরাজিত করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
দ্রঃ আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য, *শিশু বিশ্বকোষ*, ১ খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৯৯৫ খ্রীঃ), পৃঃ ৭৭-৭৮।

৮৪. শব্দগত ভাবে গণতন্ত্রের অর্থ জন সাধারণের শাসন। অতীত ও মধ্যযুগে গণতন্ত্র এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস (Herodotus) গণতন্ত্রের সংগায় বলেন, গণতন্ত্র এক প্রকার শাসন ব্যবস্থা, যেখানে শাসন ক্ষমতা কোন শ্রেণী বা শ্রেণী সমুহের উপর ন্যাস্ত থাকে না বরং সমাজের সদস্য গণের উপর ন্যাস্ত হয় ব্যাপকভাবে। লর্ড ব্রাইস বলেন, যে শাসন প্রথায় জন সমষ্টির অন্ততঃ তিন চতুর্থাংশ নাগরিকের অধিকাংশের মতে শাসন কার্য পরিচালিত হয় তাই গণতন্ত্র। স্যার ক্রিপস বলেন, গণতন্ত্র বলতে আমরা যে শাসন ব্যবস্থাকে বুঝি যেখানে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি সব বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। এবং সকলের মধ্যে নিজ নিজ মত প্রকাশ করতে পারে। ম্যাকাইভারের মতে "গণতান্ত্রিক শাসনে সরকার জনগণের এজেন্ট মাত্র এবং সে হিসেবে তারা সরকারকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করেন। এফ. স্টং গণতন্ত্রের সংগায় বলেন, শাসিতগণের সক্রিয় সম্মতির উপরে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত তাকে গণতন্ত্র বলে। তবে প্রেসিডেন্ট লিংকনের সংগাই সবচেয়ে জনপ্রিয়, তিনি বলেন, 'Government of the people by the people and for the people'.
দ্রঃ ড. এমাজ উদ্দীন আহমদ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা* (ঢাকা: বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লি, ২০০৩ খ্রীঃ), পৃঃ ৩৪৮; অধ্যাপক গোলাম আযম, *বাংলাদেশের রাজনীতি* (ঢাকা: আল আযমী পাবলিকেশন্স, ৩য় সং, ১৯৯০ খ্রীঃ), পৃঃ ৪০।

ঘোষণা করেন।[৮৫] নতুন এ শাসনতন্ত্রের আলোকে ১৯৬২ সালে এপ্রিলে পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে খান সাহেব জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করে বিনা খরচে জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন।[৮৬] এ সময় তিনি জামায়াতে ইসলামীর পার্লামেন্টারী গ্রুপের নেতা হিসেবে জাতীয় পরিষদে ইসলাম ও গণতন্ত্রের পক্ষে বলিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।[৮৭]

১৯৬২ সালে ৪ জুলাই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তাঁর শাসনতন্ত্র প্রনয়ণের সময় মুসলিম পারিবারিক আইন সংশোধনের নামে বিতর্কিত আইন প্রনয়ন করেন।[৮৮] যা ছিল সম্পূর্ণ ইসলাম ও মানবতা বিরোধী। জাতীয় পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে এবং জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় গ্রুপের নেতা হিসেবে খান সাহেব ঈমানী চেতনা বোধ নিয়ে এ কুখ্যাত আইন বাতিলের দাবীতে জাতীয় পরিষদে এ গুরুত্বপূর্ণ বিলটি উপস্থাপন করেন।[৮৯] যদিও অধিবেশনের আগের দিন ৩ জুলাই জেনারেল আইয়ুব খান তাঁকে বাসায় ডেকে নিয়ে বিলটি উপস্থাপন না করার জন্য শাসিয়ে দেন এবং ঐদিনই তিনি মহিলাদেরকে খান সাহেবের বিরুদ্ধে উসকিয়ে দেন। এতদসত্ত্বেও খান সাহেব বিলটি জাতীয় পরিষদে উপস্থাপন করলে প্রচন্ড বিরোধীতার পরও বিলটি আলোচনার জন্য গৃহীত হয় এবং বিলটি জাতীয় পরিষদে পাশ হয়।[৯০] স্বৈরশাসক আইয়ুব বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাঁর বলিষ্ট ভূমিকা ছিল। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে বিরোধী দলের "কপ"[৯১] "পিডিয়াম"[৯২] এবং "ডাক"[৯৩] নামে যে সব জোট গঠন করেছিলেন খান সাহেব ছিলেন সেগুলোর অন্যতম নেতা।[৯৪]

---

৮৫. নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৮৫।

৮৬. আববাস আলী খান, *স্মৃতি সাগরের ঢেউ*, পৃ: ৮৫।

৮৭. নাজমুস সায়াদাত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ২১৩।

৮৮. বিতর্কিত মুসলিম পারিবারিক আইনে যা ছিল তা হলো, একত্রে একাধিক বিবি রাখা হারাম, দণ্ডনীয় অপরাধ। ১৬ বছরের আগে মেয়ে বিয়ে দিলে উভয় বিহাইকে শ্রীঘরে যেতে হবে। কুর'আনে উত্তারাধিকারী আইনেও রদবদল করা হয়। এমনি সব উদ্ভট আইন কানুনের যোগফল হলো মুসলিম পারিবারিক আইন।
দ্র: নাজমুস সায়াদাত, *আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৮৬

৮৯. তদেব।

৯০. তদেব ।

৯১. গণতন্ত্রের নামে আইয়ুব খানের একনায়কতন্ত্রের প্রতিরোধের জন্য ১৯৬৪ সালে ২০ জুলাই মুসলীম লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম এবং জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি বৃন্দ ঐক্যবদ্ধ ভাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার সংকল্পে ঢাকায় খাজা নাজিমউদ্দীনের বাস ভবনে চারদিন ব্যাপী বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠকে নয় দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে সম্মিলিত বিরোধী দল (Combined Opposition) গঠন করেন। যা "কপ" নামে পরিচিত।
দ্র: অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫* (ঢাকা: সাঈদ হাসান প্রকাশক, তা: বি), পৃ: ৩৪৫।

৯২. এক ব্যক্তির শাসনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি হইতে সমগ্র দেশকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে জনগণের স্বার্ভভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক বাসনায় পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পন্থী , পাকিস্তান মুসলিম লীগ,পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টি, জামায়াতে ইসলামী এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ঐক্য সংস্থা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন । জনাব আতাউর রহমানের বাস ভবনে অনুষ্ঠিত ৩০ এপ্রিলের (১৯৬৭) সভায় "পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট" গঠিত হয় । যার সংক্ষিপ্ত নাম "পিডিয়াম" ।
দ্র: অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫*,পৃ: ৩৭৯-৩৮০।

৯৩. গণতান্ত্রিক আন্দোলন যখন ১৯৬৯ সালের শুরুতে গণআন্দোলন পরিচালনার তাগিদে ৭ ও ৮ জানুয়ারী ঢাকায় দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত বৈঠকে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, নিখিল পাকিস্তান মুসলীম লীগ,ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট,জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ও পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এর সমন্বয়ে গঠিত হলো "ডেমোক্রেটিক এ্যাকশান কমিটি" সংক্ষেপে (DAC)
দ্র: নাজমুস সায়াদাত সম্পাদিত, *আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম* ,পৃ: ২১৯।

৯৪. তদেব, পৃ: ২১৩।

১৯৬৯ সালে আইয়ুব সরকার বিরোধী গণঅভ্যুত্থানে[৯৫] তিনি বলিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে জয়পুরহাট থেকে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী হিসেবে তিনি অংশ গ্রহণ করে বিজয়ী হন এবং ১৯৭১ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্ণর আব্দুল মোত্তালিব মালিকের মন্ত্রী সভায় শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।[৯৬] শিক্ষামন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে চট্রগাম বিশ্ববিদ্যালয়ে "মেরিন বায়োলজি" পাঠ্য তালিকা ভুক্ত করা হয়। যা পরবর্তীতে মেরিন একাডেমীতে রুপান্তরিত হয়।[৯৭] যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের নৌ-বাণিজ্য দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বড় বড় নাবিক তৈরী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।[৯৮] তাছাড়া বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের একাডেমীক লেখা-পড়ার পাশা-পাশি নৈতিকতা শিক্ষাদানের জন্য আব্বাস আলী খানের শিক্ষামন্ত্রনালয় তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোহরের নামাজ আদায়কে বাধ্যতামূলক করে দেন। এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মনে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত করার উদ্দেশ্য তাদের মধ্যে জামায়াতের সাথে নামাজ পড়ার অভ্যাস সৃষ্টির জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে যোহরের নামাজ স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গঁনে অথবা নিকটবর্তী মসজিদে জামায়াত সহকারে আদায় করার নির্দেশ দেন।[৯৯]

১৯৮০ সালের ৭ ডিসেম্বর ঢাকার রমনাগ্রীন রেস্তোরায় এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে আব্বাস আলী খান জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নতুন রাজনৈতিক পদ্ধতি হিসেবে "কেয়ারটেকার সরকারের রুপরেখা"[১০০]

---

৯৫. ১৯৬৬ সালের ছয় দফা ও এগার দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে যে আন্দোলন পূর্ব-বাংলায় শুরু হয় তা দুর্বার হয়ে এবং ছাত্র-জনতা কৃষক-শ্রমিকের সম্মিলিত দাবী ভিত্তিক আন্দোলন পাকিস্তানের ভিত্তি শিথিল করে দেয়। সেই আন্দোলন ১৯৬৯ সালে গণবিপ্লবের আকার ধারণ করে। ১৯৬৮ সালের শেষ দিকে বাংলাদেশের জনশক্তির প্রচণ্ডতম অভ্যুত্থান শুরু হলো। যার ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানের এক কালের লৌহ মানব আইয়ুব খানের পতন হয়। তিনি সাময়িক ভাবে পাকিস্তানের সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের হাতে শাসনভার অর্পণ করে পদত্যাগ করেন।
দ্র: ড. এমাজ উদ্দীন আহমদ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা*,পৃ: ৭৪০-৭৪১।

৯৬. নাজমুস সায়াদাত, *আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম*,পৃ: ২১৫।

৯৭. তদেব।

৯৮. তদেব,পৃ:৯৬।

৯৯. তদেব,পৃ: ২১৫।

১০০. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ দেশের বর্তমান অবস্থাকে (১৯৮০) অস্বস্তিকর এবং শাসন ব্যবস্থাকে "ডিক্টেটর শীপ" অভিহিত করে সাংবাদিক সম্মেলনে একনায়কতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করার জন্য ৫ দফা দাবীর আকারে নতুন রাজনৈতিক পদ্ধতি ঘোষণা করেন । দাবী গুলো হলো:

১. বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন। রাষ্ট্র প্রধান থাকা কালে তিনি কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে থাকিতে পারিবেন না।
২. শাসনতন্ত্রের অবিভাবকত্ব প্রেসিডেন্ট এর নিরপেক্ষ হাতে ন্যাস্ত থাকিবে। কিন্তু দেশের শাসন কর্তৃত্ব তাঁর হাতে থাকিবে না। অবশ্য সরকারের উপদেশ দেওয়ার অধিকার তাঁর থাকিবে।
৩. জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই সরকার গঠনের প্রকৃত অধিকার ন্যাস্ত থাকিবে। জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সরকারই প্রকৃত পক্ষে দেশ শাসন করিবে।
৪. সরকারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করিবার প্রয়োজনে সংসদ সদস্যগণ দল পরিবর্তন করিতে পারিবেন না। এবং
৫. জাতীয় নির্বাচনের তিন মাস পূর্বে মন্ত্রী সভা ও পার্লামেন্ট ভাংগিয়া দিতে হইবে। পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের শাসন কাজ পরিচালনা করিবেন। নির্বাচনের এক মাসের মধ্যে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করিবেন।

দ্র: নাজমুস সায়াদাত সম্পাদিত, *আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম* ,পৃ:২৩০-২৩১; অধ্যাপক গোলাম আযম, *কেয়াটেকার সরকার পদ্ধতি উদ্ভাবন, প্রস্তাবনা ও আন্দোলন* (ঢাকা : আল আযমী পাবলিকেশন্স, ২য় সং, ২০০৪ খ্রী:), পৃ: ৫-৬।

এবং ইসলামী বিপ্লবের "সাত দফা"[১০১] গণদাবী উপস্থাপন করেন।[১০২] ১৯৮৩ সালে ২০ নভেম্বর "বায়তুল মোকাররম" জাতীয় মসজিদ[১০৩]-এর দক্ষিণ গেইটে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত জনসভায় তিনি দলের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে "কেয়ারটেকার সরকারের এ ফর্মুলা" [১০৪] ঘোষণা করেন।[১০৫] পরবর্তীতে একটি রাজনৈতিক প্রস্তাব

---

১০১. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে খান সাহেব ইসলামী বিপ্লবের যে সাত দফা গণদাবী উত্থাপন করেছিলেন তা হলো: ক. বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে হবে, খ. ঈমানদার ও যোগ্য লোকের সরকার কায়েম করতে হবে, গ.বাংলাদেশের আযাদী হেফাজত করতে হবে, ঘ.ইসলামী আইন শৃংখলা পূর্ণরূপে চালু করতে হবে ঙ.ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালু করতে হবে, চ. ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি চালু করতে হবে ছ. কুর'আন হাদীস মোতাবেক মহিলাদের যাবতীয় অধিকার বহাল করতে হবে। এ সাত দফার মধ্যে জনগণের সমস্যাবলী সমাধানের সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে।
দ্রঃ অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, *স্মৃতির পাতায় জননেতা আববাস আলী খান*, পৃঃ ১৭-১৮; নাজমুস সায়াদাত সম্পাদিত, *আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃঃ ২২৮-২২৯।

১০২. নাজমুস সায়াদাত সম্পাদিত, *আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃঃ ২২৭।

১০৩. বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম স্থাপত্য শৈলী ও নির্মান কুশলতায় মসজিদটির বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পাকিস্তানের প্রখ্যাত শিল্পপতি লতিফ বাওয়ানি ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ইয়াহিয়া বাওয়ানির সক্রিয় উদ্যোগে এ মসজিদটি নির্মানের পদক্ষেপ গৃহীত হয়। সেই সংগে যুক্ত হয় অন্যান্য সমাজহিতৈষী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের একান্ত প্রচেষ্টা। ১৯৬০ সালের ২৭ জানুয়ারী তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান এই মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। বায়তুল মোকাররম মসজিদের নকশা প্রনয়ন করেন বিখ্যাত পাকিস্তানি স্থাপতি আবুল হুসাইন থারিয়ানী, কর্ম তত্ত্বাবধানে ছিলেন জনাব মনিরুল ইসলাম। ৮ তলা বিশিষ্ট মসজিদ ভবনটি ৮.৩০ একর জমির উপর দাড়িয়ে আছে। মসজিদ চত্তর, অজু খানা, মিম্বর, মহিলা নামাজ ঘর, উত্তর-দক্ষিণ গেইট,প্রসস্থ বারান্দা প্রভৃতির সমন্বয়ে এই মসজিদটি একদিকে উপসনাগৃহ অন্যদিকে স্থাপত্য শিল্পের এক অনন্য নিদর্শণ হয়ে দাড়িয়ে আছে।
দ্রঃ আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য সম্পাদিত, *শিশু বিশ্বকোষ ,৪র্থ খণ্ড* , পৃঃ ১১৯-১২০।

১০৪. ১৯৮৩ সালের জনসভায় আববাস আলী খান কর্তৃক ঘোষিত কেয়ারটেকার সরকারের ফর্মুলা পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে বাস্তবায়িত হয়। ফর্মুলা টি নিম্নরুপ,
১. সংবিধানের ৭১(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রেসিডেন্ট বর্তমান জাতীয় সংসদ (১৯৮৮) বাতিল ঘোষণা করিবেন এবং ৮৫(৫) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে মন্ত্রী সভা ভাঙ্গীয়া দিবেন।
২. সংবিধানের ৫১(৩) ধারার বিধানের অধীনে বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করিবেন।
৩. প্রেসিডেন্ট সংবিানের ৫৫(১) ধারা অনুযায়ী এমন একজন আইনবিদকে প্রেসিডেন্ট নিয়ুত্ক করিবেন যিনি আন্দোলনরত দল সমুহের কাছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হইবেন।
৪. সংবিধানের ৫১(৩) ধারার অধীনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট তার পদ হতে পদত্যাগ করিবেন।
৫. ৫১ (৩) ধারা অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের সাথে সাথেই সংবিধানের ৫১(১) ধারা অনুযায়ী নব নিযুক্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করিবেন।
৬. ৫৮ ধারা অনুযায়ী অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট আন্দোলনরত দল সমুহের নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি কেয়ারটেকার সরকার গঠন করিবেন।
৭. অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এবং কেয়ারটেকার সরকারের সদস্যবৃন্দ প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।
৮. সংবিধানের ১১৮(১) ধারা অনুযায়ী অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন।
৯. সংবিধানের ১২৩(৩) (খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ বাতিল হইবার দিন হতে ৯০ দিনের মধ্যেই জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।
১০. নব-নির্বাচিত সংসদই দেশের ভবিষ্যৎ সরকার পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।
দ্রঃ কে. এম. নূরুল আমিন, *কেয়ারটেকার সরকার ও জামায়াতে ইসলামী*, পৃঃ ১৪-১৫।

১০৫. এ সম্পর্কে জামায়াতের সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, ১৯৭৩ সালের নির্বাচন পর্যালোচনা করে মনে হলো এ নির্বাচন রীতিমতো প্রহসন কিন্তু ১৯৭৯ এর নির্বাচন সে তুলনায় নিরপেক্ষ হলোও পরিপূর্ণ নিরপেক্ষ নয়। তাই জনগণের সিদ্ধান্ত অবাধ ও নিশ্চিত করার উপায় চিন্তা করে ১৯৮০ সালের জানুয়ারীতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদে আমি কেয়ারটেকার সরকারের রুপরেখা পোশ করি। বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মত ভাবে কর্মপরিষদে এ ফর্মূলা গ্রহণ যোগ্য বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
দ্রঃ নাজমুস সায়াদাত, *আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃঃ ২৩২, ২৩৯-২৪০।

হিসেবে খান সাহেব এটি জনসভায় দাবী হিসেবে পেশ করে কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ডাক দেন।[১০৬] এ আন্দোলনের অংশ হিসেবে আব্বাস আলী খান-এর নেতৃত্বে ৭ সদস্যের একটি ডেলিগেশন জেনারেল এরশাদের সাথে সাক্ষাৎ করে একটি লিখিত দাবী নামা[১০৭] পেশ করেন এবং এ সংলাপ শেষে সরাসরি জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের নিকট উক্ত লিখিত দাবীর কপি বিলি করা হয়।[১০৮] "কেয়ারটেকার সরকার" আন্দোলনের পাশা-পাশি খান সাহেব স্বৈরচার বিরোধী আন্দোলনে রাজনৈতিক অঙ্গনে আপোষহীন ও বলিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। এ সময় রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন জেলা শহর গুলোতে অসংখ্য জনসভায় তিনি দিক নিদের্শনামূলক ভাষণ দেন।[১০৯] বুদ্ধিজীবি ও সুধি সমাবেশেও অনুরুপ বক্তব্য পেশ করেন। তাঁর শালীন, যুক্তিপূর্ণ ও তেজস্বী বক্তৃতায় এ দেশের সাধারণ জনগণ স্বৈরচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।[১১০] স্বৈরচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বলিষ্ট ভূমিকা রাখার জন্য তৎকালীন সরকার খান সাহেবকে কয়েকবার গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করে।[১১১] '৯০ এর গণআন্দোলন[১১২] আব্বাস আলী খান এর নেতৃত্বে জামায়াতে

---

১০৬. তদেব,পৃ: ২৩২।

১০৭. লে. জেনারেল এরশাদ-এর নিকট লিখিত দাবী নামা হলো, সেনা প্রধান হিসেবে শপথ নেওয়ার সময় আপনি যে শাসনতন্ত্রের হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তা মূলতবী করে এবং নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করার কোন বৈধ অধিকার আপনার ছিল না। শাসনতন্ত্র বহাল করে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দিন। এ ব্যাপারে দু'টি বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন। ১. আপনি যদি নিজে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করতে চান তাহলে সুপ্রিম কোর্টের কর্মরত প্রধান বিচারপতির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করুন। তাঁর নেতৃত্বে একটি অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করুক। ২.যদি আপনি ঘোষণা করেন যে, আপনি নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এবং কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে থাকবেন না তাহলে আপনাকেও কেয়ারটেকার সরকার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে আমরা রাজী। নির্বাচনের পর আপনি পদত্যাগ করবেন এবং নির্বাচিত সরকার দেশ পরিচালনা করবে।
দ্র: অধ্যাপক গোলাম আযম, *কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি , উদ্ভাবনা , প্রস্তাবনা ও আন্দোলন*, পৃ: ৭।

১০৮. নাজমুস সায়াদাত, *আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ১৭৩।

১০৯. খান সাহেবের ভাষণের মুল কথা ছিল যে, এ সরকারকে পদত্যাগ করে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে। সংসদ নির্বাচনের পূর্বে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন জাতি কিছুতেই মেনে নিবে না। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে গোটা জাতির দাবী মেনে নিয়ে সশস্ত্র বাহিনী যদি ব্যারাকে ফিরে যান, তাহলে গুটি কয়েক উচ্চাভিলাষী সামরিক অফিসার অভ্যুথান ঘটাইতে আর উদ্দোগী হবে না। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ আত্মনিয়োগ করেছেন। সামরিক শাসনের ছত্র-ছায়ায় গণতন্ত্র কায়েম হতে পারে না। মুলতবী সংবিধান যদিও ইসলামী নয় কিন্ত দেশ পরিচালনার জন্য একটা সংবিধান প্রয়োজন। সশস্ত্র বাহিনী জাতির আশা আকাংখার ভরসা স্থল ও ঐক্যের প্রতিক। স্বাধীন জাতির জন্য সামরিক বাহিনী আব্যশ্যিক প্রয়োজন।
দ্র: নাজমুস সায়াদাত, *আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ২৩২-২৩৩।

১১০. তদেব, পৃ: ১৭৩।

১১১. তদেব।

১১২. ১৯৮২ সাল থেকে বাংলাদেশের ওপর যে স্বৈরাচারী সামরিক শাসন চেপে বসেছিল তার বিরুদ্ধে ঘটমান আন্দোলন নানা ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে ১৯৯০ সালের শেষে তুঙ্গে ওঠে এবং লে. জে. হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ সরকারের পতন ঘটায়। জনতার রুদ্ররোষে ও আন্দোলনের কাঁছে শক্তিমান একনায়কের এ নতিস্বীকারের ঘটনায় মহিমান্বিত হয়ে আছে নব্বই-এর গণআন্দোলন।
দ্র: আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য, শিশু বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬৪।

ইসলামী বাংলাদেশ ২২ জোটের[১১৩] পাশা-পাশি যুগপৎ আন্দোলন করতে সক্ষম হয়। ফলে স্বৈরচারের পতন ত্বরান্বিত হয়।[১১৪]

১৯৯১ সালে সাধারণ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী হিসেবে তিনি জয়পুরহাট থেকে প্রতিদ্বন্দিতা করে পরাজিত হন। এ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে বিভিন্ন জনসভায় তিনি ভাষণ দেন এবং ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।[১১৫] নির্বাচন উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে আব্বাস আলী খান জাতির উদ্দেশ্যে রেডিও ও টেলিভিশনে এক গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা মূলক ভাষণ দান করেন।[১১৬] তাঁর এ ভাষণ সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবি, রাজনীতিবীদ এমন কি সাধারণ মানুষের কাছে প্রশংসা কুড়িয়ে ছিল।[১১৭] ১৯৯২ সালে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের তৎকালীন আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে গণআদালত গঠন করে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশকে নিষিদ্ধ করার জন্য দেশে এক অরাজকতার পরিবেশ সৃষ্টি করে।[১১৮] এ সময় তৎকালীন বিএনপি সরকার অধ্যাপক গোলাম আযমকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করলে সারা দেশে তাঁর মুক্তির দাবীতে এক বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়। আব্বাস আলী খান এ কঠিন মুহূর্তে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করে গোলাম আযমের মুক্তির আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১১৯] ১৯৯৬ সালে সাধারণ নির্বাচনেও তিনি অংশগ্রহণ করে। এ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাসদ (রব) এবং জাতীয় পার্টির সমন্বয়ে সরকার গঠন করে। সরকার গঠন করার পর তারা ইসলাম ও ইসলামী সংগঠন গুলোর প্রতি অঘোষিত যুদ্ধ ঘোষণা করে।[১২০] এতে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ দেশের অধিকাংশ মানুষ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী। এ দু' শক্তির সমন্বয়ে আওয়ামী দুঃশাসনের পতনের লক্ষ্যে "চারদলীয় ঐক্যজোট"[১২১] গঠিত হয়।[১২২] বাংলাদেশ

---

১১৩. বিএনপি ৭ দল, আওয়ামী লীগ ৮ দল এবং বাম ফ্রন্ট ৭ দল ।
১১৪. নাজমুস সায়াদাত, আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম, পৃ: ১৭৩।
১১৫. তদেব, পৃ: ২৫১।
১১৬. রেডিও ওটেলিভিশনের প্রদত্ত ভাষণ আমরা পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হয়েছে।
১১৭. নাজমুস সায়াদাত, *আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ১৫২।
১১৮. তদের্ব, পৃ: ২৬৮ ।
১১৯. তদেব ।
১২০. তদেব,পৃ: ১৮৫।
১২১. ইসলামী মূল্যবোধ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী জনগণের নরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারকে (১৯৯৬-২০০০) নির্বাচনের মাধ্যমে পরাজিত করে সরকার গঠনের লক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, জাতীয় পার্টি (এরশাদ) এবং ইসলামী ঐক্যজোট এর সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি মোর্চা। মূলতঃ একটি ধর্মীয় অনুভূতি সম্পন্ন সুষম আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে "চারদলীয় ঐক্যজোট গঠন করা হয়। তবে নির্বাচনের পূর্ব মূহূর্তে এরশাদের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টির এক অংশ ঐক্যজোট থেকে বেরিয়ে যায়। অপর অংশ নাজিউর রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যজোটের সাথে থেকে যায়।
দ্রঃ নাজমুস সায়াদাত, *আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ২৮৭ ।
১২২. তদেব ।

জাতীয়তাবাদী দল এই জোটের নেতৃত্বে থাকলেও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। আব্বাস আলী খান এ জোটের অন্যতম শীর্ষ নেতা হিসেবে সরকার পতনের আন্দোলনকে তরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১২৩] যার ফলশ্রুতিতে ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে জোট দু' তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী হয়। কিন্তু আব্বাস আলী খান এ বিজয় দেখে যেতে পারেননি। কারণ এ বিজয়ের পূর্বে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

লেখনির মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনে অবদান

রাজনৈতিক অংগনে ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য খান সাহেব যেমনি নিজের জান-মাল সর্বতভাবে নিয়োজিত করেছিলেন, পাশা-পাশি লেখনির মাধ্যমেও তিনি ইসলামী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ইসলামী আন্দোলন সংক্রান্ত, বেশ কিছু মৌলিক বই রচনা করেছেন এবং এ সংক্রান্ত অনেকগুলো গ্রন্থও তিনি অনুবাদ করেছেন। যা পাঠক বর্গকে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের প্রতি উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। সর্বপরি তার যুক্তিপূর্ণ লেখনির মাধ্যমে তিনি মানুষকে ইসলামী আন্দোলনের দিকে উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং এর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন। তার গ্রন্থাবলী ইসলাম প্রচার ও প্রাসারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ পর্যায়ে আমরা ইসলামী আন্দোলন সংক্রান্ত তার লিখিত ও অনুদিত গ্রন্থের বিবরণ তুলে ধরতে চাই।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাঙ্খিত মান

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের তৎকালীণ আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯৯২ সালে সরকার কতৃর্ক কারারুদ্ধ থাকায় এ বছর অনুষ্ঠিত রুকন সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান নেতৃত্ব প্রদান করেন। সম্মেলনের উদ্বোধনী ও সমাপনী ভাষণ ছাড়াও 'কর্মীদের কাঙ্খিত মান' এ মূল বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন। যা পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে "কর্মীদের কাঙ্খিত মান" নামে প্রকাশিত হয়।[১২৪] গ্রন্থ খানি ১৯৯৩ সালে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ প্রকাশ করে। আলোচনার শুরুতে তিনি এ উপমহাদেশে প্রথম ইসলামী আন্দোলন শুরু হওয়ার প্রেক্ষাপট উল্লেখ করেন। এ সম্পর্কে খান সাহেব বলেন"বিগত শতাব্দির প্রথম দিকে এ উপমহাদেশে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভীর নেতৃত্বে ইসলামী আন্দোলন পরিচালিত হয় এবং এ উদ্দেশ্যে তিনি "তাহরিকে মুজাহেদীন" সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এ মুজাহিদ বাহিনীর প্রত্যেকের আদর্শিক ও চারিত্রিক মান ছিল অতুলনীয়। যার ফলে উপমাহাদেশে সত্যিকার অর্থে খিলাফাত আলা-মিনহাজিন্নাবুয়া-এর অনুকরণে একটি খোদার প্রতিনিধিত্ব মূলক রাষ্ট্র ব্যবাস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩১ সালে বালাকোটে এক সংঘর্ষে তিনি তার সংগীগণ সহ শাহাদত বরণ

---

১২৩. তদেব।
১২৪. আব্বাস আলী খান, *ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাঙ্খিত মান* (ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ, ১৯৯৩ খ্রী:), পৃ: ৩।

করেন এবং ১৮৫৭ সালে আযাদী আন্দোলনের তাঁদের সকল শক্তি নিঃশেষে হয়ে যায়। তথাপি ত্ত খোদার পথের মুজাহিদীন তাদের জিহাদের প্রেরণা, শাহাদতের তামান্না ও আমল আখলাকের দ্বারা সাহাবগণের (রা) আমল আখলাকেরই নমুনা পেশ করেছেন। এ যুদ্ধ কালে তাঁদের দিন কাটত ঘোড়ার পিঠে এবং রাত কাটতো অশ্রুশিক্ত জায়নামাজে।[১২৫] বালাকোটে সাইয়েদ আহম্মদ এর শাহাদতের একশত বছর পর তাঁর রেখে যাওয়া আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রা)। তিনি তাঁর আন্দোলনের সূচনা করেন একটি মাসিক পত্রিকা "তরজুমানুল কুর'আনের" মাধ্যমে। যার ফলশ্রুতিতে "জামায়াতে ইসলামী" নামে একটি বিপ্লবী আদর্শবাদী দল গঠিত হয়।[১২৬] এরপর এ ধরণের আদর্শ বাদী সংগঠনের কর্মীদের যোগ্যতা ও নৈতিকা কেমন হওয়া উচিৎ সে সম্পর্কে তিনি একটি জীবন্ত চিত্র তুলে ধরে প্রাণবন্ত আলোচনার অবতারণা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, এ সব দলের বা আন্দোলনের কর্মীদের দু' ধরণের মান অপরিহার্য। প্রথমটি হলো সাংগঠনিক মান অর্থাৎ- সংগঠনের সকল নির্দেশ পালন। অপরটি হলো ইসলামী আন্দোলনে যে মান আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয়, যে মান কুর'আন পাক তৈরী করতে চায়, যে মান তৈরী করেন নবী করিম (সা) এর সাহাবা কিরামগণ ।[১২৭] একজন ব্যক্তি বহু ডিগ্রী ধারী পণ্ডিত হতে পারেন কিন্তু তাঁর মধ্যে যদি তাকওয়া ভিত্তিক গুনাবলীর অভাব থাকে, তাহলে তাঁর এ যোগ্যতা ইসলামী আন্দোলনের জন্য অর্থহীন। একজন খাটিঁ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর প্রয়োজনীয় গুনাবলীর বিবরণ পবিত্র কুর'আন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ গুনাবলীর যে যতো বেশী অর্জন করতে পারবে তাঁর মান ততো বেশী উচ্চস্তরের হবে। তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ্ তাঁর মুমিন বান্দাহকে যে সব গুনাবলীতে ভূষিত দেখতে চান এবং যে মান (Standard) হতে পারে, তাঁর কোন নিদিষ্ট সীমা রেখা নেই যে সেখানে পৌছাঁর পর পূর্ণতা হাসিল করা যাবে। তবে তাঁকে সর্বদা উচ্চ থেকে থেকে উচ্চতর গুনাবলী অর্জনের চেষ্টা সাধনা করে যেতে হবে এটাই তার কাজ"।[১২৮] এ মর্মে তিনি আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেন,[১২৯]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۔ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ.

-'যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তারা নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম সৃষ্টি। তাদের প্রতিদান হচ্ছে খোদার কাছে তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত সমুহ। সে জান্নাতের তলদেশে রয়েছে প্রবাহমান

১২৫. তদেব, পৃ: ৭।
১২৬. তদেব, পৃ: ৯।
১২৭. তদেব, পৃ: ৯-১০।
১২৮. তদেব, পৃ: ১১।
১২৯. সূরা আল-বাইয়্যেনাত: ৯৮: ৭-৮।

ঝর্ণাধারা। তাঁরা-এর মধ্যে বসবাস করতে থাকবে চিরকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আর এ সব কিছু তার জন্যে যে খোদাকে ভয় করে চলে'। তিনি ইসলামী আন্দোলনের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত গুনাবলীর গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গুনের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন,

১. **মুজাহাদায়ে নফসঃ** ব্যক্তিগত গুনাবলীর মধ্যে এটি প্রাথমিক ও মৌলিক গুন। প্রত্যেককে নিজের মনের সাথে লড়াই করে প্রথমে মুসলমান ও খোদার অনুগত হতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, المجاهد من جاهد نفسه طاعت الله. -'সত্যিকার মুজাহিদ সেই যে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য নিজের নফসের সাথে সংগ্রাম করছে।[১৩০]

২. **হিযরতঃ** নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের পর যে গুনাবলী অর্জন করতে হবে তা হলো হিজরত। এর আসল উদ্দেশ্য দেশ ত্যাগ করা নয়, বরং খোদার নাফরমানী থেকে পালিয়ে খোদার সন্তুষ্টির জন্য অগ্রসর হওয়া। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো ما لهجرة أفضل يا رسول الله؟ জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ان تهجر ما كره ربك তুমি সে সব কাজ পরিহার করবে যা আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন।[১৩১]

৩. **ফানা ফিল ইসলাম হয়ে যাওয়াঃ** ইসলামী আন্দোলনের প্রত্যেক কর্মীকে ফানা ফিল ইসলাম হয়ে যাওয়া, যাতে তিনি কারও সামনে উপস্থিত হলে তাঁর ভিতরে ইসলামী আন্দোলনের পূর্ণ চিত্র যেন পরিস্ফুঠিত হয়ে ওঠে। নবী করীম (সা) এটাকে এ ভাবে বলেছেন, "এদের সাথে দেখা হলেই আল্লাহর ইয়াদ আসবে, আল্লাহর কথাই মনে পড়বে।[১৩২] এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল বলেন,[১৩৩]

امرنى ربى بتسع خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضاء، القصد في الفقر والغناء، وان اصل من قطعنى، واعطى من حر منى، واعفو من ظلمنى، وان يكون صمتى فكراً، نطقى ذكراً، نظرى عبرة.

উক্ত হাদীসে যে সব গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে তা নিম্নরুপঃ

১. গোপন প্রকাশ্য সকল অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলা। খোদাভীতি ও আখেরাতে জবাবদিহির অনুভুতি এ দু'টি ব্যতিত ইসলামী চরিত্র তৈরী, নেক আমল করা এবং সকল প্রকার পাপাচার থেকে দূরে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়।

---

১৩০. আব্বাস আলী খান, *ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাংখিত মান*, পৃঃ ১৩।
১৩১. তদেব, পৃঃ ১৩-১৪।
১৩২. তদেব, পৃঃ ১৪।
১৩৩. তদেব, পৃঃ ১৫-১৬।

২. কার প্রতি সদয় থাকা অথবা ক্রুদ্ধ সকল অবস্থায় ইনসাফ কায়েম করা।

৩. দারিদ্র অথবা আর্থিক উভয় অবস্থায় সততা ও ভারসাম্য রক্ষা করে চলা।

৪. যে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তার সাথে সর্ম্পক স্থাপন করা।

৫. যে বঞ্চিত করবে, তাকে দান করা।

৬. কেউ যুলম করলে, তাকে মাফ করে দেয়া।

৭. আমার নীরবতা যেন সৎ চিন্তায় পরিনত হয়।

৮. আমার কথায় যেন আল্লাহর স্বরণ হয়।

৯. আমার দৃষ্টি যেন হয় শিক্ষনীয়।

এসব কাংখিত গুনাবলীর উল্লেখ করার পর নবী (সা) বলেন, আমাকে হুকুম করা হলো আমি যেন আমর বিল মারুফ এবং নাহি 'আনিল মুনকারের কাজ করি। সুতরাং নেক কাজের প্রচার ও প্রসার এবং অন্যায় অত্যাচারের অবসানের জন্য যে উম্মতে ওয়াসাতের উত্থান, তার প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে এ গুনাবলী অপরিহার্য।

১. **নামাজ :** নামাজই সর্বোত্তম ইবাদত যা নামাযীর মধ্যে সকল বাঞ্চিত গুনাবলী সৃষ্টি করে। নামাজই মানুষকে খোদার নৈকট্যলাভের সুযোগ করে দেয়। আল্লাহ বলেন, সিজদা কর ও খোদার নিকটবর্তী হয়ে যাও।[১৩৪]

২. **সংকল্প গ্রহণ :** প্রথমে আল্লাহর নেক ও প্রিয় বান্দাহ হওয়ার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা। সত্যিকার নামাজ ও তাঁর সৃষ্ট মহৎ গুনাবলীর দ্বারা একদিকে যেমন আল্লাহর নিকটে মর্যাদা লাভ করা সম্ভব হয়। অপর দিকে সমাজের লোকজন ও দীনদার ও ইসলাম প্রিয় লোক মনে করে সম্মানের চোখে দেখে থাকে। সুতরাং আমাদের নামাজ যদি রিয়া মুক্ত হয়ে 'ইহ্সান'[১৩৫]-এর নামাজ হয়, তাহলে আমাদের জামায়াত দীনি জামায়াত হিসাবে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হবে।[১৩৬]

৩. **ব্যাপক জনমত সৃষ্টি:** এ বিষয়ে মাওলানা মওদূদী (র)-এর উদ্বৃতি দিয়ে খান সাহেব বলেন "আমাদের গঠন মূলক সকল চেষ্টা সাধনা ব্যর্থ যদি তাঁর পিছনে মজবুত জনমত সৃষ্টি না হয়। গঠন মূলক কাজ ব্যতীত যেমন কোন ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে না, তেমনি বৃহত্তর জনগোষ্ঠির মধ্যে

১৩৪. তদেব, পৃ: ১৬।

১৩৫. ইহ্সান সম্পর্কিত হাদীসটি এই, أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ -'তুমি এমনভাবে আল্লাহ্র 'ইবাদত করবে যে, তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ, আর যদি তুমি আল্লাহকে দেখতে না পাও, তাহলে তুমি জানবে আল্লাহ্ তোমাকে দেখছেন'।
দ্র: মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *হাদীস শরীফ*, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৪।

১৩৬. তদেব, পৃ: ২২।

ইসলামী দাওয়াতের প্রচার প্রসার ব্যতীত এ ধরণের কোন বিপ্লব সম্ভব নয়। অতএব আমাদের জামায়াত যদি জনগণের কাছে একটি দ্বীনি জামায়াত হিসেবে পরিচিত হয়, আমাদের আমল আখলাক যদি মানুষকে অকৃষ্ট করতে পারে এবং দেশের জনগোষ্ঠী যদি ইসলামী শাসনের স্বপক্ষে আন্তরিকতার পরিচয় দেয়, তাহলে ইসলামী বিপ্লবকে কেউ রুখতে পারবে না।[১৩৭]

৪.**অশ্লীলতা ও সকল অনাচার পাপাচার থেকে দূরে থাকা:** নামাজ শুধু মহৎ গুনাবলী অর্জনেই সাহায্য করে না, বরং সকল অশ্লীলতা, পাপাচার অনাচার থেকে নামাযীকে দূরে রাখে। সেই সাথে মানুষের সকল মানসিক ব্যাধিও নিরাময় করে। খান সাহেব উল্লেখ করেন, চারিত্রিক মানদন্ড হচ্ছে প্রধানত আর্থিক লেন-দেন। যার আর্থিক লেন-দেন যত ভালো সে ততো চরিত্রবান। অন্যদিকে লেন-দেন ভালো না হলে তাকে চরিত্রবান বলা যায় না।[১৩৮]

উল্লেখিত গুনাবলী ছাড়াও ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য সাংগঠনিক, আদর্শিক, চারিত্রিক, 'ইলমী ও ফিকহী মানের আরো কিছু গুনাবলী অপরিহার্য বলে তিনি তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো :

ক. **প্রশাসনিক যোগ্যতা দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনিক যোগ্যতা :** কারো মধ্যে প্রভুত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যে যদি দুর্নীতি পরায়ন হয়। তাহলে সে যোগ্যতার সাথে দুর্নীতি করতে পারে। তাই প্রয়োজন দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনিক যোগ্যতা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অফিসাদি ও দেশ পরিচলনার যোগ্যতা অবশ্যই অর্জন করতে হবে।[১৩৯]

খ. **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (Science and Technology):** ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কে এ দু'টি পুরা-পুরি আয়ত্ব করতে হবে। শুধু তাই নয় বরং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির (Islamization) ইসলামী করণ করতে হবে।[১৪০]

গ. **ভাষার দক্ষতা অর্জন করতে হবে:** মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও আরোও দুটি ভাষায় আরবী ও ইংরেজীতে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। কারণ বিশ্বের কোন একটি দেশে ইসলামী বিপ্লব হবে না যদি তার স্বপক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টি না হয়। এজন্য যারা 'আরবী ভাষা জানেন তাদেরকে ইংরেজী ভাষায়

---

১৩৭. তদেব, পৃ: ২৩-২৪।
১৩৮. তদেব,পৃ: ২৪।
১৩৯. আব্বাস আলী খান, *ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাংখিত মান*, পৃ: ২৫।
১৪০. তদেব,পৃ: ২৬।

অনর্গল বক্তৃতা করার যোগ্যতা লাভ করতে হবে। তাহলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামের স্বপক্ষে বলিষ্ট জনমত গড়ে তোলা সম্ভব হবে।[১৪১]

উপরিক্ত গুনাবলীগুলো উল্লেখ করার পর খান সাহেব ইসলামী আন্দোলনের বিজয়ের অপরিহার্য শর্তবলী সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী (র)-এর একটা উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "ইসলামের নামে কোন দল যদি ক্ষমতা লাভ করে, অথচ সে দলের নেতা-কর্মীদের ইসলামী চরিত্র পাকাপোক্ত হয়নি, তারপর যদি তারা খিয়ানত কারী প্রমানিত হয়, ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করে, ব্যক্তিস্বার্থ ও প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার জন্য ইনসাফ ও আমানতের কবর রচনা করে, জাতীয় অর্থ আত্মসাৎ করে, নিজেকে আইনের উর্দ্ধে মনে করে, চারিত্রিক অধঃপতন শুরু হয়, তাহলে চিরদিনের জন্য ইসলাম বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাবে। এবং সারা বিশ্বে ইসলাম সম্পর্কে নৈরাশ্য সৃষ্টি হবে"।[১৪২]

উপরিক্ত আলোচনাটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, খান সাহেব ইসলামকে বিজয়ী হিসেবে দেখার স্বপ্ন দেখতেন তা বাস্তবায়ন করার জন্য এক দল মানুষের প্রয়োজন যাদেরকে চরিত্রে, আদর্শে, জ্ঞানে-গুনে' বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া তথা সাহাবাকেরামের বৈশিষ্ট্য ও আদর্শের একান্ত অনুসারী হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ আদর্শ ছাড়া ইসলামী বিপ্লবের আর কোন বিকল্প নেই।

এ গ্রন্থ খানি ছাড়াও আববাস আলী খান আরো বেশ কিছু গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের খেদমত করেছেন। এসম্পর্কিত তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা নিম্নরূপ,

১. ঈমানের দাবী

২. মৃত্যু যবনিকার ওপারে

৩. ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব

৪. একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ : তার থেকে বাঁচার উপায় ।

৫. ইসলামী বিপ্লব একটি পরিপূর্ণ নৈতিক বিপ্লব।

৬. ইসলামী আন্দোলন ও তার দাবী।

৭. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস।

৮. মুসলিম উম্মাহ।

৯. সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক।

১০. কুর'আনের আলো।

---

১৪১. তদেব।

১৪২. তদেব।

বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলামী আন্দলোনে তাঁর অবদান

আববাস আলী খান ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি যুক্তিপূর্ণ ভাবে বক্তৃতা দিতে পারতেন। তার বক্তব্য খুবই বলিষ্ট ও স্পষ্ট ছিল। তার শিক্ষণীয়, জ্ঞান গর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করত। এ পর্যায়ে আমরা তার কয়েকটি বক্তৃতার নমুনা উল্লেখ করতে চাই।

কার্লাইল সম্মেলনে বক্তৃতা

কার্লাইল সম্মেলনে খান সাহেবের বক্তৃতার বিষয় ছিল: সকল মুসলমান একই উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে সাহেব 'আরবী ও ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেন,

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের এই যে উম্মাহ এ আসলে একই উম্মাহ। এবং আমি তোমাদের রব। অতএব তোমরা আমারই হুকুম মেনে চল। কিন্তু (মানুষের দুস্কৃতি এই যে) তারা পরবর্তীকালে তাদের দ্বীন কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। (অথচ) তাদের সকলকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে'।[১৪৩]

তিনি বলেন, 'আজ এখানে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল থেকে এসে একত্রে সমবেত হয়েছি আমাদের বর্ণ বংশ গোত্র ভাষা চালচলন জীবনযাপন পদ্ধতি, রীতিপদ্ধতি, সাজ-পোষাক সব কিছুই আলাদা। এমনকি খানাপিনার রুচি ও ধরণ আলাদা। তথাপি আমাদের মধ্যে রয়েছে পূর্ণ একাত্মতা। আমাদের চিন্তাধারা ও জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক। আমরা যে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের মূর্ত প্রতীক তাতে কোন সন্দেহ নেই। বহুদিক দিয়ে আমাদের চলার পথ এক এবং গন্তব্যস্থলও এক। আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় গুণাবলীসহ তাঁর একত্বের উপর রয়েছে আমাদের সুদৃঢ় ও অবিচল বিশ্বাস। ঠিক তেমনি আমাদের অদম্য বিশ্বাস রয়েছে নবী মুহাম্মদের (সা) নেতৃত্বের উপরে এবং সত্যের উপরে যে নব্যুয়াতের ধারাবহিকতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে তাঁর উপরে। আমাদের সকলের দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে পরকালীন অনন্ত জীবনের প্রতি। ইসলাম আমাদের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং আমরা আল্লাহর এবাদত বন্দেগী ও দাসত্ব আনুগত্য ঠিক সে ভাবেই করি যেভাবে নির্দেশ রয়েছে কুর'আন পাকে এবং যেমন ভাবে তা করেছেন এবং করতে বলেছেন আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা)'।

ধর্মীয় ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণা ও মতবাদ রয়েছে। তাথাকথিত পন্ডিতরা বলেন যে, মানুষ তার ধর্মীয় জীবন শুরু করে অন্ধকারের মধ্যে এবং এ জীবনের যাত্রা শুরু হয় প্রকৃতি পূজা ও পৌত্তলিকতা থেকে। তারপর ক্রমশ: সে আল্লাহর উপাসনা শুরু করে। তাঁর সাথে অন্যান্য দেবদেবীকেও শরীক করে। এ ক্রিয়াকর্ম চলতে থাকে বহুকাল যাবত। অবশেষে সে আল্লাহর একত্ব অনুধাবণ করে ও মেনে নেয়।

---

১৪৩. মূল আয়াতটি এই, إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ۔
দ্রঃ সূরা আল-আম্বিয়াঃ ২১ : ৯২-৯৩।

কিন্তু কুর'আন উপরোক্ত ধারণা খণ্ডন করে বলেন যে, মানব জীবনের সূচনাই হয় পরিপূর্ণ আলোকউজ্জ্বল পরিবেশে। আল্লাহ তা'আলা যখন আদি মানব আদমকে পয়দা করেন, তখন তিনি তাঁর কাছে সত্যকে উদ্ভাসিত করে দেন এবং সত্য ও সঠিক পথ বাতলে দেন। বহুকাল যাবত আদমের বংশধরগণ এ সত্য পথে চলতে থাকে এবং তারা সকলে ছিল একই সম্প্রদায়ভুক্ত ও একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। পরবর্তীকালে তারা ভিন্ন পথ অবলম্বন করে এবং নতুন ধর্মের প্রবর্তন করে। তাদেরকে সত্য সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়া সত্বেও তারা এ পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। এ জন্যে যে, তাদেরকে যে অধিকার দেয়া হয়েছিল, তার অসদ্ব্যবহার করে অতিরিক্ত কিছু পাবার তারা ইচ্ছা পোষণ করেছিল।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তা'আলার বানী সকল কালে ও সকল যুগে ছিল এক এবং সকল নবী রাসূলগণ তা একই সুত্রে আবদ্ধ এবং তাদের ধর্মও ছিল এক। সকল নবী রাসূল একই ধর্মীয় বিশ্বাস সহ দুনিয়ায় আগমণ করেন এবং তাদের ধারণা ছিল আল্লাহ তা'আলারই একমাত্র মানুষের স্রষ্টা ও প্রভু ও প্রতিপালক। অতএব দাসত্ব আনুগত্য একমাত্র তাঁরই করতে হবে।

সকল নবী রাসুল যে ধর্ম বা দ্বীন প্রচার করেন তা ইসলাম ছাড়া আর কিছু ছিল না। যার মূলকথা ছিল আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য। যারা এ সত্য মেনে নিয়েছে তাদেরকেই বলা হয়েছে মুসলিম। আর আল্লাহ দাসত্ব আনুগত্য কিভাবে করতে হবে তাও শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহর নবীগণ। কিন্তু নবীদের অবর্তমানে পরবর্তীকালে মানুষ সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং আপন খুশী খেয়াল মত ব্যক্তিগত ও পার্থিব স্বার্থের জন্য প্রবৃত্তির তাড়নায় দুনিয়ার ভোগ বিলাসের জন্যে নতুন নতুন ধর্ম আবিষ্কার করে কেউ নিজেদেরকে খৃষ্টান, কেউ ইয়াহুদী, কেউ কেউ অন্য কিছু বলে আখ্যায়িত করেছে।

সর্বশেষে সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা) ঠিক সেই বাণীই প্রচার করলেন যা করেছিলেন মুসা ঈসা ও অন্যান্য নবীগণ। ইহুদী ও খৃষ্টানরা এ বাণী মেনে নিতে শুধু অস্বীকারই করেনি, বরং চরম ভাবে বাধা দিয়েছেন এর প্রচার ও প্রসারকে। তাদেরকে বলা হয় যে, কুর'আন যে বাণী নিয়ে এসেছে তা পূর্ববর্তী নবীগণের বাণী থেকে ভিন্ন কিছু নয় এবং নবী মুহাম্মদের মিশন অন্যান্য নবীদের থেকে ভিন্ন কিছু নয়। অতএব ইহুদী-খৃষ্টানদের আচরণ ছিল একেবারে ভুল। এর থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে তাওরাত এবং ইঞ্জিলে যে সব কথা বলা হয়েছিল, তা তারা মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে এবং যে ধর্মীয় নেতৃত্বের আসন তাদেরকে দেয়া হয়েছিল তার গুরু দায়িত্ব পালন করতেও তারা ব্যর্থ হয়েছে।

এখন আমি তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলতে চাই যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে থাকেন,

আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানের দাবীদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেমন তাকে ভয় করা দরকার এবং মুসলিম হিসেবে ছাড়া মৃত্যু বরণ করো না এবং আল্লাহর রশি শক্ত করে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেয়ো না'।[১৪৪]

আল্লাহ রশি শক্ত করে ধর এ কথার দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, দ্বীন বা আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং এটাই হবে জীবনের সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু। একে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে চালাতে হবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং এ ব্যাপারে থাকতে হবে পারস্পরিক পূর্ণ সহযোগীতা। এ রশি যদি কখনো ঢিলা হয়ে যায় এবং মুসলমান যদি এর মৌলিক নীতি ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে তাহলে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং তার ফলে তারা বহু দল উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। পরিণামে দুনিয়া ও আখেরাতে অশেষ লাঞ্ছনাই তাদেরকে ভোগ করতে হবে।

আজ গোটা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে চরম অনৈক্য বিরাজ করছে এবং দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে তারা একে অপরের গলায় ছুরি চালাচ্ছে। ঐক্য কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না, না ইসলামের তথাকতি ধ্বজাবাহীদের মধ্যে। আর না 'আলিম, পীর মাশায়েখের মধ্যে।

কেন এ অনৈক্য, কেন এ হানাহানি?

এর কারণ হলো, যে দুটো মৌলিক ভিত্তির উপর একটি মুসলিম জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে যা তাদের দায়িত্ব পালনের জন্যে অপরিহার্য তা হয় তারা একবারে ভুলে বসে আছে অথবা পরিত্যাগ করেছে। এ দু'টি মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে-ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ব।

এ দু'টি এমন ভিত্তি যার উপর গোটা মুসলিম উম্মাহর প্রাসাদ দাঁড়িয়ে থাকে। এর যে কোন একটি ধসে পড়লে গোটা প্রাসাদই ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

মুসলমানদের অনৈক্যের এটাও একটা কারণ যে তাদের মধ্যে রয়েছে চিন্তার অনৈক্য। ঐক্যের প্রকৃত উৎস হচ্ছে আল্লাহ, রাসুল ও কুর'আন সম্পর্কে সঠিক ধারণা।

ইসলামের মৌলিক ধারণা এই যে, সমগ্র সৃষ্টিজগত একজন একক স্রষ্ঠার সৃষ্টি, যাকে ইসলাম আল্লাহ নামে অভিহিত করে। তিনি সৃষ্টি জগতের প্রভূ ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক (Sovereign)। তিনি এক

---

১৪৪. মূল আয়াতটি এই,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

দ্রঃ সূরা আলে-ইমরান: ৩ : ১০২-১০৩।

ও একক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনিই বিশ্ব জগতের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও ব্যবস্থাপক প্রভূ ও শাসক। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করার পর দুনিয়ায় অবস্থানের জন্যে একটা সময়কাল নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এ জন্যে সুন্দর ও সঠিক জীবন বিধান দিয়েছেন। আবার তাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন এ বিধান গ্রহণ অথবা বর্জন করার। যে আল্লাহর নাযিল করা এ বিধান মনে প্রাণে গ্রহণ করে, সে মু'মিন (খোদার বিধানে বিশ্বাসী)। আর যে এটাকে প্রত্যাখ্যান করে, সে কাফির (খোদার বিধান অস্বীকারকারী)।

মানবের জীবন সমস্যা সমাধানের সব রকম পথ নির্দেশনা দিয়েছে আল-কুর'আন। কুর'আন যে মৌলিক মতবাদ ও ধ্যান ধারণা পেশ করেছে, তার উপরেই গড়ে উঠবে সমগ্র জীবন ব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র, বিভাগের জন্যে তাতে নির্দেশনা আছে। সে জীবন ব্যক্তিগত হোক, পারিবারিক অথবা সামাজিক হোক, বৈষয়িক অথবা নৈতিক হোক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক হোক কিংবা সাংস্কৃতিক, জাতীয় অথবা আন্তর্জঅতিক হোক।

কিন্তু আমরা এ অমূল্য গ্রন্থখানিকে অবহেলায় দূরে সরিয়ে রেখেছি যা সমগ্র মানবজাতি জন্যে শাশ্বত পথ প্রদর্শক। এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ আমাদের মধ্যে চিন্তা ও কাজের অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। খোদার দেয়া মতবাদ আদর্শ ও চিন্তাধারা পরিহার করে মুসলমানগণ, বিশেষ করে যারা রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তারা, এমন মতবাদ ও ধ্যান ধারণার দ্বারা প্রভাবিত, যা ইসলাম ও কোরআনের পরিপন্থী। বহু মুসলিম দেশে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে ধর্ম-নিরপেক্ষবাদ অবলম্বন করা হয়েছে যা ইসলামের বিপরীত।

মজার ব্যাপার এই যে, মুষ্টিমেয় শাসকগোষ্ঠী ধর্ম-নিরপেক্ষবাদ অথবা সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী হলেও সংখ্যা গরিষ্ট জন সাধারণ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অভিলাষী। ফলে এ সব দেশে শাসক ও শাসিতের মধ্যে চলে আসছে এ অবিরাম দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ। তার ফলে জাতীয় উন্নয়ন ব্যহত হচ্ছে এবং জাতি অধঃপতনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

ধর্ম-নিরপেক্ষবাদ অথবা অন্যান্য খোদাহীন মতবাদের পেছনে কেন?

কুর'আন ও সন্নাহ বিদ্যামান থাকতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ধর্ম-নিরপেক্ষতা অথবা খোদাহীন মতবাদের পেছনে ছুটছে কেন? আঁধারে হাতবাড়াবার কি কারণ, যখন তাদের কাছে আলো রয়েছে? এর জবাব পাওয়া যাবে যদি আমরা পাশ্চত্য সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতির গভীরে একটু দৃষ্টিপাত করি। মিশরের এককালীন গভর্ণর লর্ড ক্রোমার একটি অতি সত্য কথা বলে গেছেন।

তিনি বলেন, ইংল্যাণ্ড তার সকল উপনিবেশগুলোতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত আছে যদি বুদ্ধিজীবি ও রাজনীতিকদের একটা শ্রেণী ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ইংরেজদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ক্ষমতা হাতে নিতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু তাই বলে বৃটিশ সরকার এক মুহূর্তের জন্যেও কোন স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রের বারদাশত করবেন না।

তৎকালীন মিশরের জন্যে যে কথাটি প্রযোজ্য ছিল, তা সমভাবে প্রযোজ্য ছিল আলজেরিয়া, লিবিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জন্যেও।

মতবাদ, চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা বিভিন্নতার কারণে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে অনৈক্য তাদেরকে একটি একটি করে দুশমনের কবলে নিক্ষেপ করেছে। অন্যদিকে বহু অমুসলিম রাষ্ট্রে মজলুম মুসলমানদের আর্তনাদ হাহাকারে আকাশ-বাতাস মথিত হচ্ছে। তাদের সাহায্যের জন্যে, তাদের বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করে দেয়ার জন্যে, কোন মুসলিম রাষ্ট্র এগিয়ে আসতে পারে না। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাদের কোন দরদ না থাকারই কথা। তারা নিজেরাই কি খুব সুখে আছে? আদর্শ ও মতবাদের বিভিন্নতার কারণে নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার পরিবর্তে, তাদের মধ্যে কেউ রাশিয়াকে এবং কেউ আমেরিকাকে তার বন্ধু ও মুরব্বি বলে গ্রহণ করেছে। কিন্তু তারা এ কথা ভুলে গেছে যে, এদের কেউ মুসলমানের বন্ধু নয়।

ঐক্যের ভিত্তি

একমাত্র ইসলামের ভিত্তিতেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে বুনইয়ানুম মারসুসের (শিসাঢালা প্রাচীরের) মতো ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, আপন পায়ে দাঁড়াতে হবে, যে কোন পরিস্থিতির মুকাবিলার জন্যে আল্লাহর উপর ভরসা করে পাহাড়ের মতো অটল হয়ে থাকতে হবে।

ইসলামকে বাস্তবে রূপদান

মুসলিম দেশগুলোতে কুর'আন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সকল সমস্যার সমাধানের জন্যে মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানগণ মক্কা মোয়াযযামায় একত্রে মিলিত হয়ে আল্লাহর পবিত্র ঘরের সামনে আল্লাহকে সাক্ষী করে শপথ গ্রহণ করেন ১৯৮১ সালের এক শুভ লগ্নে। এ এক ঐতিহাসিক ঘটনা এবং এ শপথ পালনের মধ্যেই মুসলিম দেশগুলোর মুক্তি নিহিত রয়েছে। তবে খোদা না করুন এ শপথ ভংগ করলে স্রষ্টার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতাই করা হবে এবং তার পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

শপথ কার্যকর করার জন্যে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন:

১. সকল মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামকে সংবিধানের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং কুর'আন ও সুন্নাহকে সকল আইনের উৎস বলে ঘোষণা করতে হবে।
২. রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি সবকিছুতেই ইসলামের ছাঁচে ঢেলে গড়ে তুলতে হবে।
৩. নিম্নে খোদায়ী নির্দেশগুলো সমাজে কার্যকর করতে হবে।
    ক. নামায প্রতিষ্ঠা
    খ. যাকাতের সুষ্ঠু ব্যাবস্থাপনা
    গ. সকল সুনীতির আদেশ দান ও তার বাস্তবায়ন (আমর বিল মারুফ) এবং
    ঘ. সকল দুস্কৃতি নিষিদ্ধকরণ ও তার মূলোৎপাটন (নাহী আনিল মুনকার)

তবে বাস্তব জীবনে ইসলামের অনুশাসন মেনে না চলার কারণে কোন কোন দেশে কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রের আতংকে শাসক গোষ্ঠীকে আমেরিকার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করছে। অপরদিকে যে ইস্রাইল পিএলও এবং আরব দেশেগুলোর ন্যায়সংগত দাবী উপেক্ষা করে লেবাননে মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞ শুরু করছে তাদের প্রতি আমেরিকার অন্ধ সমর্থন কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রকে রাশিয়ার কোলে ঠেলে দিচ্ছে। আমার মনে হয়, এ যা কিছু হচ্ছে তা চিন্তার বিভ্রান্তির জন্যেই হচ্ছে। কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্র একটা আদর্শ বিধান এবং তার মুকাবিলা করা যেতে পারে শুধুমাত্র একটি মহত্তর আদর্শের দ্বারা, পুঁজিবাদ অথবা অস্ত্রের দ্বারা নয়। আর সে আদর্শ হচ্ছে ইসলাম। অতএব রাশিয়াপন্থী ও আমেরিকানপন্থী মুসলিম রাষ্ট্রগুলি যদি একমাত্র ইসলামের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে তারাই হবে দুনিয়ার বৃহত্তর শক্তি। দুনিয়ার কোন পরাশক্তিই তখন আর তাদেরকে পরাভূত করতে পারবে না।

মুসলিম দেশগুলোর প্রতিরক্ষার জন্যে আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রের যে প্রয়োজন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর জন্যে তাদের উচিত নিজেদের অস্ত্র নির্মান কারখানা গড়ে তোলা। এ ব্যাপারে তুরস্ক, মিশর ও পাকিস্তানের প্রযুক্তিবিদগণকে কাজে লাগানো যেতে পারে। রাশিয়া অথবা আমেরিকার উপর নির্ভরশীল হলে সমস্যা বাড়বে কিন্তু কমবে না। তাদের পলিসিই হলো মুসলমানদেরকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করে তাদেরকে পরস্পর দ্বন্দ্বমুখর করে তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে রাখা।

তবে অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলোতে কোন না কোন প্রকারের ইসলামী আন্দোলন চলছে। তার উদ্দেশ্য হলো সেখানে ইসলামের ভিত্তিতে এমন এক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে শুধুমাত্র বিশ্ব স্রষ্টারই আইন শাসন চলবে। জাতি ধর্ম, দলমত ও নারী পুরুষ নির্বিশেষ সকলেই তাদের মৌলিক অধিকার পুরোপুরি ভোগ করতে পারবে। সুবিচার ও শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হবে, প্রতিটি মানুষের জানমাল ও ইজ্জত আবরুর পূর্ণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে। অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা নৈতিক অবক্ষয়, অশ্লীলতা, যৌন অনাচার, শোষণ ও অবিচার, সন্ত্রাস ও লুটতরাজ চিরতরে নির্মূল হবে।

এ সব ইসলামী আন্দোলন ১৯৮১ সালের মক্কা ঘোষণাকে কার্যকর এবং আল্লাহর ঘরের সামনে কৃত শপথ বাস্তবায়নের পথ সুগম করতে চায়। কিন্তু শাসকগণ যদি এ সব আন্দোলন দমিত করার পথ বেছে নেন তাহলে কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী করে তাঁরা যে শপথ করেছেন তার বিপরীত কাজই করা হবে। ফলে আল্লাহর অভিশাপ অবশ্যই তাঁদেরকে কুড়াতে হবে।

এখন আমি ফসিস এর আমার যুবক ভাইদেরকে কিছু বলতে চাইছি। প্রথমত: আপনাদের এ বিরাট ও মহান উদ্যোগের জন্যে আপনাদেরকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই। তারপর বলতে চাই যে, মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ আপনাদের নিঃস্বার্থ সেবা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, চরম ধৈর্য্য, ত্যাগ ও সহনশীলতার উপর

নির্ভর করছে। ত্যাগ ছাড়া কোন কিছুই লাভ করা যায় না এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁর পথে কাজ করার জন্য সবচেয়ে বেশি ত্যাগের প্রয়োজন হয়।

প্রিয় ভাইসব! আপনারা এমন এক দেশে বসবাস করছেন যার অধিবাসী প্রধানত: খৃষ্টান। যারা কোনদিনই মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখতে পারেনি। তাছাড়া তাদের সমাজ-ব্যবস্থা, জীবন যাপন পদ্ধতি, ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাংখা, আচার-অনুষ্ঠান আমাদের থেকে একেবারে আলাদা এবং বিপরীত। খোদাহীন মতবাদ, নাস্তিক্য ও জড়বাদ প্রযুক্তিবিদ্যার উপর ভর করে তাদের নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংস করছে। কিন্তু এতদসত্বেও এ সমাজ পরিবেশে আপনারা যে ইসলামী দা'ওয়াতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তা খুবই আনন্দের বিষয়। পাশ্চত্য সভ্যতা এখন বিবেকের কাছে ধিকৃত হয়ে পড়েছে এবং বিবেকবান মহল সন্ধান করে বেড়াচ্ছে সত্যের আলোকের, শান্তির ও সম্প্রীতির। একমাত্র ইসলামই তাদের দাবী মিটাতে এবং আত্মাকে তুষ্ট করতে সক্ষম। এ ব্যাপারে আপনাদের ইসলামের পতাকাবাহী হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং ঘরে ঘরে ইসলামের আলো ছাড়াতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ আপনাদের ও আমাদের সকলকে মদদ করুন।[১৪৫]

ইস্ট লণ্ডন মসজিদে ভাষণ

২৮ জুলাই তিনি দা'ওয়াতুল ইসলাম লণ্ডন শাখার সদস্যবৃন্দ ও ইয়ং মুসলিম

অর্গানাইজেশনের সদস্যদের এক যৌথ সমাবেশে ভাষণ দেন। খান সাহেব তাঁর ভাষণে বলেন, 'আপনারা যে সমাজ ও পরিবেশে বাস করেন, সেখানে একজন মুসলমানের মুসলমান হিসেবে টিকে থাকা বড়ই কঠিন। আর টিকে থাকতে হলে মনের সাথে সংগ্রাম করেই টিকে থাকতে হবে'।

মানুষের একটা আত্মা আছে, যা মানুষকে সর্বদা জীবিত ও সজীব রাখে। তার কোন মৃত্যু নেই। ধ্বংশ নেই। সে আত্মার যে ক্ষুধা, তার যে চাহিদা ও দাবী সে সম্পর্কে মাথা ঘামাবার ফুরসৎ এদের কোথায়? দৈহিক চাহিদা মিটিয়ে আনন্দ সুখ উপভোগ করাই এদের জীবনের লক্ষ্য। তার জন্য কোন নৈতিক বন্ধনের বালাই তাদের নেই।

এই যে বিরাট বিশাল বিশ্ব প্রকৃতি, যার একটি ক্ষুদ্রতম অংশে মানুষ বাস করে তার স্রষ্টা কেউ আছেন কিনা, থাকলে তাঁর পরিচয় কি, তাঁর সাথে মানুষের বা কি সম্পর্ক, মানুষের তিনি স্রষ্টা একথা স্বীকার করার পর প্রশ্ন জাগে কেনই বা তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, কি তার উদ্দেশ্য ও কি তার জীবনের লক্ষ্য? মৃত্যুর পর আর কোন জীবন আছে কিনা, থাকলে তা কেমন? এ ধরণের অসংখ্য প্রশ্নের উদয়

---

১৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ১২৭-১৩৬।

তাদের মনে হয়নি ফলে তার সঠিক জবাব পাবার তারা চেষ্ট করে কি? করে না। আর মৃত্যুও পরের জীবনটাকে অস্বীকার করে এখানেই তারা সবকিছু পেতে চায়।

এখন প্রশ্ন রইলো নিজেদের সন্তান সন্ততি সম্পর্কে। এখানকার এ বিষাক্ত আবহাওয়ায় তাদেরকে লাগামবিহীন ছেড়ে দেওয়া যায় কি করে? তারুণ্যের স্পর্শকাতর অবস্থায় গার্লফ্রেন্ডশিপের মাদকতার প্রভাব থেকে তাদেরকে বাঁচতে হবে। ইসলামের ছাঁচে তাদের মন মানসিকতা ও চরিত্র গড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। তার জন্যে মা ও বাপকে হতে হবে আদর্শ। সকাল সন্ধ্যায় তাদেরকে নিয়ে বসুন, ইসলামী তালীম দিতে থাকুন। জামায়াতে নামাজের অভ্যাস সৃষ্টি করুন, ইসলামীয়াত শিক্ষার ব্যবস্থা করুন, মুসলমান ছাত্র ও যুবকদের ইসলামী সংগঠন গড়ে তুলুন। নতুবা এরা অদূর ভবিষ্যতে মুসলিম উম্মাহ ও পূর্ব পুরুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। খোদা না করুন, তা যেন কখনো না হয়।

আজ সারা বিশ্বে ইসলামের নবজাগারণ শুরু হয়েছে। যুবকদের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্যম ও প্রেরণা দেখা যাচেছ। এ প্রেরণার অগ্নিশিক্ষায় তারা দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পতংগের মতো। আপনাদের সন্তানদেরকে এমনই প্রতংগ বানাতে হবে।

তারপর শেষ কথা এই যে, আপনাদের এ দেশে বসবাস করার উদ্দেশ্যে ও নিয়তটাও ঠিক করে নিতে হবে। উদ্দেশ্য যদি এ হয় যে, প্রচুর অর্থ কামাই করবেন যার সুযোগ আপন দেশে নেই এবং সেই সাথে জীবনকে উপভোগ করার আধুনিক দ্রব্য সামগ্রী আহরণ করবেন। তাহলে তার পরিণাম হবে অত্যন্ত মারাত্মক ও ভায়বহ। বরঞ্চ আপনাদেরকে এদেশে ইসলামের রাষ্ট্রদূতের ভূমিকা পালন করতে হবে। এদেশের পথহারা মানুষকে পথের সন্ধান দিতে হবে। তার জন্যে নিজেদেরকে ইসলামের আদর্শ বানাতে হবে। নির্ঝঞ্ঝাট ও বিলাসী জীবন যাপন যেন আপনাদেরকে ইসলামের জেহাদী প্রেরণা থেকে দূরে ঠেলে না দেয়। এখানকার বিষাক্ত খোদা বিমুখ পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই প্রেরণাকে জাগ্রত রাখতে হবে। আপনাদের একজন দরদী দ্বীনিভাই হিসেবে কথাগুলো আপনাদের কাছে বিবেচনার জন্যে পেশ করলাম। আলাহ্ আপনাদেরকে ও আমাকে তাঁর পথে চলার তাওফিক দান করুন, আমীন।[১৪৬]

ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকা বা ইকনার আমন্ত্রণে জনাব আব্বাস আলী খান যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। 'আমেরিকায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার' এই কেন্দ্রীয় বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ইকনা এর চুতুর্থ সম্মেলনটিতে তাঁর প্রদত্ত ভাষণ

আমি আমার বক্তব্যে বললাম, দুনিয়ার শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং বিপর্যয়ের হাত থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করার জন্যে মুসলিম যুব সমাজের উচিত ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রে সমৃদ্ধ হয়ে পজ্ঞা, মেধা, সহনশীলতা ও ত্যাগের মনোভাব নিয়ে ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করা। অতঃপর আমি বাংলাদেশের

---

১৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪৭-১৫০।

মুসলমানদের সংগ্রামী ঐতিহ্য উল্লেখ করে বলি, আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস এবং ইসলামের প্রতি ভালোবাসা এদেশের জনগণের আছে, আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠার তীব্র আগ্রহ রয়েছে। জনগণ এ জন্যে তাদের আপোষহীন সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন।

এ কথাও বলি যে, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ জনগণের অধিকার বহাল করার জন্যে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলাকে পবিত্র দায়িত্ব মনে করে। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আপোষহীন সংগ্রামের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী একটি নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও বলি যে, মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সামরিক শাসকদের শক্তির জোরে ক্ষমতা দখল রাজনীতিকে কুলুষিত করেছে, নির্বাচন পদ্ধতি ধ্বংস করেছে। জনকল্যাণের নামে একনায়কত্ব কায়েম করে ইসলামী আন্দোলনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। আমি দৃঢ়তার সাথে এ কথা বলছি যে, মুসলিম দেশগুলোর জনগণ অবাধ ও নিরপেক্ষ রাজনীতির সুযোগ পেলে ইসলামের সপক্ষেই সুস্পষ্ট রায় দেবে।

পরদিন ১২ আগষ্ট বৈকালিক অধিবেশনে আমার বক্তব্যে এ কথা বলি যে, বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) যে আদর্শ, যে জীবন বিধান এবং যে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করলেন তা কিভাবে খোলাফায়ে রাশেদীন (রা) অমলিন ও অবিকৃত রাখলেন। তাদের পর খেলাফত যে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হলো এবং খেলাফতের নামে স্বৈরশাসন কায়েম হলো, হযরত 'ওমর ইব্ন 'আব্দুল আযীয কিভাবে তাকে 'আবর ইসলামী খেলাফতের রূপদান করলেন, তার উপরও কিছু আলাকপাত করলাম। অতঃপর জাহেলিয়াতের হাতে রাষ্ট্র শক্তি যাওয়ার পর কিভাবে আবূ হানীফা (র) ইমাম মালেক (র), ইমাম শাফ'ঈ (র), ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র), প্রমুখ আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীন এবং পরবর্তীকালে ইমাম গাজ্জালী (র), ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) প্রমুখ মনীষীগণ সংগ্রাম করে ইসলামের প্রাণশক্তি জিয়ে রাখেন তাও আলোচনায় রাখলাম। অতঃপর এ উপমাহাদেশে ইসলামকে নির্মূল করার যে ষড়যন্ত্র বাদশাহ আকবর করেছিলেন, সে ষড়যন্ত্র কিভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন মুজাদ্দিদে আল-ফেসানী (র) তার উপরও আলোকপাত করলাম। সর্বশেষে এ উপমাহদেশে সাইয়েদ আহমদ শহীদের তাহরীকে মুজাহেদীন যার স্থায়ী সাফল্য অর্জিত না হলেও আজো লক্ষ কোটি মুসলমানের মধ্যে জেহাদের প্রেরণা বলবৎ রেখেছে।[১৪৭]

ইসলামিক ফোরাম ইউরোপের সম্মেলন

এ সম্মলনের আলোচ্য বিষয় ছিল 'দুনিয়া আখেরাতের কর্মক্ষেত্র' । এ বিষয়ের উপর আব্বাস আলী খানের প্রদেয় ভাষণ,

মৃত্যুর পরে অনিবার্য রূপে যে চিরন্তন জীবন রয়েছে তার কর্মক্ষেত্র হচ্ছে এ দুনিয়া বা দুনিয়ার জীবন। এখানে যে বীজ বপন করা হবে, মৃত্যুর পরের জীবনে সে বীজেরই ফসল ভোগ করতে হবে। তাই এ জীবনের কর্মের উপরই পরকালীন জীবনের সুখ-দুঃখ নির্ভর করছে।

---

১৪৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৫-১৫৬।

সে সব জিনিসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলে কাউকে মুসলিম বা মুসলমান বলা যেতে পারে, তার মধ্যে একটি আখেরাত বা মৃত্যুর পরের জীবন। জীবনমুখী ও সুন্দর করতে হলে দুনিয়ার জীবনে হর-হামেশা আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান মেনে চলতে হবে। পরকালীন জীবনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাকে যারা সুখী ও সুন্দর করতে চায়, দুনিয়ার জীবনে তাদের চরিত্র ও আচরণ এক ধরণের হবে। আর যারা তা বিশ্বাস করে না তদের চরিত্র হবে অন্য ধরণের।

মোট কথা, পরকালীন জীবনের অনিবার্যতা এবং সে জীবনের আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সুখ শান্তি লাভ করতে হলে দুয়িার জীবনকে কিভাবে পরিচালিত করতে হয় তার উপরই আলোকপাত করে বক্তব্য রাখলাম।[১৪৮]

১৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫৮-১৫৯।

মসজিদে মুহাম্মদীর সেমিনার

খান সাহেবের প্রদত্ত ভাষণ

মসজিদে মুহাম্মদীর সেমিনারে আলোচ্য বিষয় ছিল, "ইসলাম ও সমাজবিপ্লব"। এই সেমিনার সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, নয়টি মুসলিম সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এ সেমিনারে আমি আমার বক্তব্যে বল্লাম, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে ইসলামের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মন্ডিত রাষ্ট্র ও সামজ ব্যবস্থা আছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী রাসূলগণ দুনিয়াতে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার মিশন নিয়ে এসেছিলেন। সৎ ও চরিত্রবান লোক তৈরী করে তাদেরকে সংগঠিত করার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তাঁরা সমাজ বিপ্লবের সংগ্রাম করেছেন। শেষ নবী মুহাম্মদ মস্তফা সা. এভাবেই সমাজ পরিবর্তন করেছিলেন। মানুষের ব্যক্তি জীবনের পরিবর্তনের মাধ্যমেই সমাজ পরিবর্তনের কাজের সূচনা হয়। ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের উপর বিশেষ জোর দিয়ে আমি বলি, দা'ওয়াতী তৎপরতার মাধ্যমেই মুসলিম সমাজ জীবন্ত থাকতে পারে। আমি আমার বক্তব্যের প্রারম্ভে আল্লাহ তা'আলার সাথে মানুষের সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলি যে, আল্লাহ শুধু মানুষের স্রষ্টাই নন, মানুষের বাদশাহ, শাসন ও আইন দাতাও। তিনি মানুষের গোটা জীবনের জন্যে যে আইন বিধান দিয়েছেন তা পুরোপুরি মেনে চলাই মানুষের কাজ। দ্বিতীয়ত: মৃত্যুর পর প্রতিটি মানুষের আল্লাহর নিকটে ফিরে গিয়ে তার কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে। তৃতীয়ত: আল্লাহ তা'আলা মানুষের কৃতকর্মের পূংখানুপুংখ বিচার করে তাকে পুরষ্কার অথবা শাস্তি দেবেন। এ মতবাদ ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই মানুষের ব্যক্তিগত সামাজিক ও সামষ্টিক জীবন গড়তে হবে। আর এ জিনিসই দাবী করে তার চিন্তা চেতনায়, তার জীবন পথে, চরিত্রে, আচার-আচরণে এবং কথা ও কাজে এক বিপ্লবী পরিবর্তন সূচিত করার। আর উন্নতি অগ্রগতির প্রক্রিয়া শুরু হয় পরিবর্তনের মাধ্যমে। এ পরিবর্তন মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তির, দুঃখ কষ্ট থেকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের, দারিদ্র্য থেকে স্বচ্ছলতার এবং নৈতিক অধঃপতন থেকে এর উন্নত নৈতিক মানের। ইসলাম মানব সমাজে এ পরিবর্তন দাবী করে।

অতঃপর পাশ্চত্য সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা তুলে ধরে বলি, এ সভ্যতা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করলেও মান জাতিকে কল্যাণকর কিছুই দিতে পারেনি। এ সভ্যতা মাত্র পঁাচিশ বছরের ব্যবধানে মানব জাতির ঘাড়ে দু'টি বিশ্বযুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ সামরিক বেসামরিক লোক নির্মম ভাবে নিহত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ লোক বিকলাংগ ও আকর্মন্য হয়েছে। কোটি কোটি টাকার ধন সম্পদ ধ্বংস হয়েছে। অগণিত বিধবা ও এতিম শিশুর আর্তনাদ হাহাকারে আকাশ বাতাস মথিত হয়েছে। দু'টি বিশ্বযুদ্ধের পরিণামে দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি, বেকারত্ব, দুর্নীতি, যৌন আনাচার, অবিচার, অত্যাচার ও চরম নৈতিক অবক্ষয় মানবজীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। এখনও বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে শোষণ, লুষ্ঠন, বর্ণবাদ ও আধিপত্যবাদের প্রতিযোগীতা চলছে। তাই পাশ্চত্য সভ্যতা গুণগত দিক দিয়ে প্রাচীন জাহেলিয়াত থেকে পৃথক কিছু নয়।

আরব জাহেলিয়াতের কথাই ধরা যাক, তারও নিজস্ব একটা সভ্যতা ছিল, সংস্কৃতি ছিল, মূল্যাবোধ ছিল, তাদের শিক্ষা কেন্দ্রও ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য ছিল আতিথিয়তার জন্যে আরবদের সুখ্যাতি ছিল। বীরত্ব ও সাহসিকতা তাদের ছিল তুলনাহীন। তথাপি তাদের অত্যাচারে, নিস্পেষণে মানুষের মধ্যে হাহাকার-আর্তনাদ শুনতে সময়ের দাবী ছিল একটা পরিবর্তনের। নবী মুহাম্মদ (সা) এসে পরিবর্তনই এনেছিলেন। তিনি শুধু ইসলামের বাণী প্রচারের জন্যেই আগমণ করেননি। বরং তাঁর আগমণ ছিল সমাজ পরিবর্তনের জন্যে, সুখ শান্তি ও নিরাপত্তার এক নবযুগ সৃষ্টি করার জন্যে। তাঁর জন্যে তিনি মানুষকে সংগঠিত করেন, তাদের জীবন পরিশুদ্ধ করেন, তাদের নিয়ে ক্রমাগত তেইশ বছর আন্দোলন ও সংগ্রাম করেন। তিনি যে সুখী ও সুন্দর সমাজ গড়েন, তার নজির নেই, তুলনা নেই।

নবী মুহাম্মদের (সা) সমাজ পরিবর্তনের সে প্রক্রিয়া পদ্ধতিই আমাদের অনুসরণ করতে হবে। বলা বাহুল্য জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সে উদ্দেশ্যেই সংগ্রাম করে যাচ্ছে। সকল শ্রেণীর মানুষ নারী ও পুরুষ জামায়াতে ইসলামীতে অংশগ্রহণ করছে।[১৪৯]

কানাডায় ইকনা এর সম্মেলন

এ সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল, 'জিহাদের পথে প্রতিবন্ধকতা'। এ বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, নবীগণের ইসলামী আন্দোলন তথা জিহাদের পথে বাতিল শক্তিই সর্বদা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। আধুনিক যুগে বাতিল শক্তি ছাড়াও তাদের তাবেদার মুসলিম শাসক গোষ্ঠীও এ পথের বিরাট প্রতিবন্ধক। মুসলিম দেশগুলোর জনগণ ইসলামের প্রতিষ্ঠা মনে প্রাণে চাইলেও ক্ষমতাসীন শাসক গোষ্ঠী তা চায় না। ফলে জনগণ ও তাদের মধ্যে সংঘাত সংঘর্ষ লেগেই থাকে। যার জন্যে জাতির সার্বিক উন্নতি অগ্রগতি ব্যহত হচ্ছে। কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই ইসলামের অগ্রগতি পছন্দ করে না। আল্লাহর পথে সংগ্রাম জোরদার করার এবং আদর্শ ইসলামী চরিত্র পেশ করার আহবান জানিয়ে বলি যে, আল্লাহর পথে নিবেদিত প্রাণ সৈনিকদের পক্ষেই মুসলিম জাহানে ইসলামের নব জাগরণ সৃষ্টি করা সম্ভব। মুসলিম জাহানে ইসলামের প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারলেই দুনিয়ায় আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সাফল্য মন্ডিত হবে এবং বিশ্ব মানবতা শান্তি ও মুক্তির সন্ধান পাবে।[১৫০]

---

১৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬১-১৬৩।
১৫০. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৬৩-১৬৪।

চতুর্থ অধ্যায়

আব্বাস আলী খানের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা

চতুর্থ অধ্যায়

আব্বাস আলী খানের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা

আব্বাস আলী খান (১৯১৪-১৯৯৯ খ্রী:) ছিলেন একজন বড় মাপের গবেষক ও লেখক। ইসলামের মৌলিক বিষয়ে তিনি ছিলেন বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। বাংলা, ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। তিনি অনেক গুলো বই লিখেছেন এবং অনুবাদ করেছেন। তার লিখিত বই পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে। তিনি তাঁর লেখনির মাধ্যমে জাতিকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তার লিখিত বই-এ ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের দিক নির্দেশনা রয়েছে। এ পর্যায়ে আমরা তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনা করার প্রয়াস পাব।

এক. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস

এটি আববাস আলী খানের লিখা ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি উপমহাদেশে ইসলামের আগমন, মুসলিম শাসন, ইংরেজ শাসন, ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন থেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আলোচনা করেছেন।

ইতিহাস জাতির দর্পণ। এ ইতিহাস একটি জাতির মধ্যে জীবনী শক্তি সঞ্চার করে। কোন জাতিকে ধ্বংস করতে হলে তার অতীত ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে হবে অথবা বিকৃত করে পেশ করতে হবে। একজন তথা কথিত মুসলমান যদি ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের সুযোগ না পায় এবং তার জাতির অতীত ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে তাহলে তার মুখ থেকে এমন সব মুসলিম ও ইসলাম বিরোধী কথা প্রকাশ করা হবে, যে সব কথা একজন অমুসলিম বলতে ভয় করবে। তাই মুসলিম জাতি সত্ত্বার অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে তাদের সঠিক অতীত ইতিহাসের সাথে ইসলামেরও সঠিক জ্ঞান ও ধারণা নতুন প্রজন্মের কাছে পরিবেশনের উদ্যোগ অপরিহার্য। আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তির পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনও রুখতে হলে ইতিহাসের পর্যালোচনা ও ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা সর্বস্তরে উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি কনেছিলেন তিনি। এ কারণেই বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসে প্রসংগক্রমে ইসলামের এসব মূলনীতি তুলে ধরা হয়েছে এবং মুসলমানদের উপর হিন্দুদের প্রায় দু'শ বছরের উৎপীড়ন ও নির্যাতনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।[১]

ইতিহাসের একজন একনিষ্ঠ ছাত্র হিসেবে সত্য ইতিহাস জানার ও আগ্রহ থেকে ইতিহাস লেখার প্রবনতা তার মধ্যে সৃষ্টি হয়। বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৯৯৪ খ্রী:) তাঁর রচিত একটি মৌলিক গ্রন্থ। এটি ছিল এদেশের মুসলিম ইতিহাসের এক অনুল্লেখ্য অধ্যায়। এ ধরণের উচ্চতর প্রামান্য গবেষণা বাংলাদেশের ইতিহাসে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য অবদান। লেখাটি তিনি "মাসিক পৃথিবী" পত্রিকায় নভেম্বর ১৯৮৯ সালে প্রথম শুরু করেছিলেন এবং শেষ করেছেন মে ১৯৯৪ সালে। এ সাড়ে পাঁচ বছর একাধারে

---

১. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক সেন্টার কাটবন, ৪র্থ প্রকাশ, ২০০২ খ্রী:), পৃ: ১০৬।

তিনি লিখেছেন এবং তা প্রকাশও হয়েছে। অবশেষে ১৯৯৪ সালে বইটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার বইটি প্রকাশ করে। প্রথম যখন বইটি প্রকাশিত হয় তখন এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৫১৬। আর এ বইটি লেখার জন্য তিনি যে সব বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন তার সংখ্যা ১১৭ খানা। এ সব সহায়ক গ্রন্থের মধ্যে ৭৮ টি ইংরেজী এবং বাকী ৩৯ টি বাংলা।[২] বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস বইটি প্রকাশের সাথে সাথে পাঠক মহলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। যার কারণে একশত ত্রিশ টাকা দামের এ বইটি মাত্র এক বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। এর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ঠিক তার পরের বছর ১৯৯৫ সালে।[৩] বর্তমান পঞ্চম মুদ্রণ বাজারে দেখা যায়। বইটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশের পুর্বাঞ্চলে মুসলমানদের প্রথম আগমন থেকে শুরু করে পরবর্তী সাড়ে পাঁচশত বছর ব্যাপী (১৩২৮-১৭৫৭ খ্রী:) বাংলা শাসনের ইতিহাস। দ্বিতীয় বিভাগে তিনি ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত থেকে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন (Government of India Act 1935) কার্যকর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময় কালের (১৯৩৫-১৯৪৭) ইতিহাস উল্লেখ করেছেন। বইটির প্রথম ভাগে ১৫ টি অধ্যায় এবং দ্বিতীয় ভাগে ১৬ টি অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে। বইটি গভীর ভাবে পর্যালোচনা করলে তাকে একজন ইতিহাসবিদ বললে অত্যুক্তি হয় না। গ্রন্থ খানির পর্যালোচনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

প্রথম ভাগে আলোচিত বিষয়

প্রথম অধ্যায়: বাংলায় মুসলমানদের আগমন। আগমনকারী মুসলমানগণকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। তম্মধ্যে এক শ্রেণীর মুসলমান ব্যবসা বানিজ্যের সুবাদে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আগমন করে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করেন এবং আরেক শ্রেণীর মুসলমান এসেছিলেন বিজয়ীর বেশে দেশ জয়ের মাধ্যমে। এই দু'মাধ্যমে বাংলায় মুসলমানদের আগমনের প্রেক্ষাপট সুন্দর সুবিন্যাস্ত লিখনির মাধ্যমে তিনি তার এ গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়: বিজয়ী বেশে মুসলমান, বাংলায় মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা, বাংলার স্বাধীন সুলতান গণ, রাজাগণেশ, ইলিয়াস শাহী বংশ, হিন্দু জাতির পূনরুত্থান, গণেশের বংশ, ইলিয়াস শাহী বংশের পূনরুত্থান, বাংলার মসনদে হাবশী সুলতান, হোসেন শাহ, শ্রী চৈতন্য ও হোসেন শাহী বংশ ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়: ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাংলায় আগমন, মীর জুমলা থেকে সিরাজ উদ্দৌলা, নবাব শায়েস্তা খান, ফিদা খান, যুবরাজ মোহাম্মদ আজম, সুবাদার ইব্রাহীম খান, সুবাদার আজিমুশশান, মুর্শিদ কুলী খান, সুজাউদ্দীন, সরফরাজ খান, আলীবর্দী খান, সিরাজ উদ্দৌলার শাসন কালের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে।

---

২. আব্দুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত, *আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃ : ১৯১ ।
৩. তদেব।

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলার মুসলিম শাসন বিলুপ্তির পটভূমি, মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান, বাংলার পতনের রাজনৈতিক কারণ, বাংলায় ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের উচ্চাভিলাষ, ফলতায় ইংরেজ গমন।

পঞ্চম অধ্যায়: ইংরেজদের আক্রমন ও নবাবদের পরাজয় ও সিরাজদ্দৌলার পতনের পর বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা।

ষষ্ঠ অধ্যায়: মুসলিম সমাজের দুর্দশা, নবাব সম্ভ্রান্ত বা উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান, নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান,কৃষক ও তাতী, হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক: ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং সাম্প্রাদায়িক সংঘর্ষ।

সপ্তম অধ্যায়: মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা-দীক্ষা, ইংরেজদের আগমনের পর, খৃষ্টান মিশনারী ও ইংরেজী শিক্ষার সূচনা, বাংলার মুসলমান ও বোধনকৃত নতুন বাংলা ভাষা, আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সাম্প্রদায়িকতা।

অষ্টম অধ্যায়: আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলমান, ঊনবিংশ শতকে মুসলমান, মুসলমান চরম অগ্নি পরীক্ষার মুখে, ফকির আন্দোলন।

নবম অধ্যায়: ফরায়েজী আন্দোলন।

দশম অধ্যায়: শহীদ তিতুমীর, কোলকাতায় জমিদারদের ষড়যন্ত্র সভা, অলেকজাণ্ডার রিপোর্ট ও তার প্রতিক্রিয়া।

একাদশ অধ্যায়: সাইয়েদ আহমদ শহীদের জিহাদী আন্দোলন, মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব,শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র), শাহ আব্দুল আজিজ (র), শাহ ওয়ালি উল্লাহর বংশ তালিকা, সাইয়েদ আহমদ শহীদ, বালাকোট বিপর্যয়ের কারণ, বালাকোট বিপর্যয়ের পর, মাওলানা বেলায়েত আলী, বিপ্লবী আহমদুল্লাহ, মাওলানা ইয়াহইয়া আলী, মাওলানা ইমামুদ্দীন, সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী।

দ্বাদশ অধ্যায় : বৃটিশ ভারতের প্রথম আযাদী সংগ্রাম।

ত্রয়োদশ অধ্যায় : স্যার সাইয়েদ আহমদ খান, বংগভংগ, আর্য সমাজ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, বালগংগাধর তিলক।

চতুর্দশ অধ্যায় : বংগভংগ রদ ও তার প্রতিক্রিয়া।

পঞ্চদশ অধ্যায় : উনিশ শত ছয় থেকে ছত্রিশ, খেলাফত আন্দোলন, হিযরত আন্দোলন, মোপলা বিদ্রোহ, ইসলাম ও মুসলমানদের উপর সুপরিকল্পিত হামলা, সংগঠন আন্দোলন, মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বাতন্ত্র দাবী, সর্বদলীয় সম্মেলন, মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঐতিহাসিক চৌদ্দ দফা, সাইমন কমিশন গোলটেবিল বৈঠক, দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক, তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক, পূনাচুক্তি ও ভারত শাসন আইন।

দ্বিতীয় ভাগে যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে তা হলো :

প্রথম অধ্যায় : ভারত শাসন আইন ১৯৩৫, প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন, রক্ষাকবচ প্রশ্নে অচলাবস্থা সৃষ্টি, নির্বাচনের ফলাফল, বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও আসাম।

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রদেশ গুলোতে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা, কংগ্রেস শাসন ও মূল্যায়ন।

তৃতীয় অধ্যায় : মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস আলোচনা।

চর্তুথ অধ্যায় : পাকিস্তান আন্দোলন।

পঞ্চম অধ্যায় : পাকিস্তানের আদর্শিক ভিত্তি।

ষষ্ঠ অধ্যায় : পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধীতা।

সপ্তম অধ্যায় : বৃটিশ সরকারের আগষ্ট প্রস্তাব।

অষ্টম অধ্যায় : ক্রিপস মিশন।

নবম অধ্যায় : ওয়াভেল পরিকল্পনা ১৯৪৫।

দশম অধ্যায় : কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা ।

একাদশ অধ্যায় : ডাইরেক্ট অ্যাকশন।

দ্বাদশ অধ্যায় : একজিকিউটিভ কাউন্সিলে লীগের যোগদান।

ত্রয়োদশ অধ্যায় : গণপরিষদ।

চতুর্দশ অধ্যায় : মাউন্টব্যাটেন মিশন।

পঞ্চদশ অধ্যায় : ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া।

ষষ্ঠদশ অধ্যায় : উপসংহার।

বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস বইটিতে আব্বাস আলী খান উল্লেখ করেছেন যে, মুহাম্মদ বিন কাশিম এ উপমহাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রদূত ছিলেন। তিনি যে সভ্যতা সংস্কৃতির বৃক্ষ রোপন করেন তা কালক্রমে বর্ধিত ও বিকশিত হতে থাকে। ফলে সমগ্র ভারত উপমহাদেশে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়। এ সময় মুসলমানগণ বিজয়ী বেশে ভারতে আগমন করতে থাকে। তাদের সাথে আসেন, সৈনিক, কবি, সাহিত্যিক, সূফী সাধক, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী। কিন্তু মুসলিম শাসনের অবসানের পর ইসলামী আইনের স্থলে প্রবর্তিত হলো পাশ্চত্যের মানব রচিত আইন, ইণ্ডিয়ান সিভিল এন্ড ক্রিমিনাল কোডস অব প্রসিজিয়র এবং ইন্ডিয়ান নেপাল কোড পরিবর্তন করা হলো। এ ভাবে মুসলমানগণ শুধু রাজ্য হারা হলেন না বরং ইসলামী তথা আল্লাহর আইনের পরিবর্তে তাদের উপর কুফরী আইন চাপিয়ে দেয়া হলো। তাদের জীবন জীবিকার সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হলো। তাদের বহু লা-খেরাজ ভূসম্পদ কেড়ে নেয়া হলো। তাদেরকে পথের ভিখারীতে পরিণত করা হলো। এ সময়ের মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এ বইটিতে।[৪] এ ছাড়া বইটিতে মুসলিম জাতির গৌরবময় অতীত ইতিহাসের দিকে নতুন প্রজন্মের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

মুসলিম জাতির ইতিহাস কালের কোন এক বিশেষ সময় থেকে শুরু হয়ে কোন এক বিশেষ সময় গিয়ে শেষ হয়নি। এ ইতিহাসের সূচনা দুনিয়ার প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ)-এর আগমন থেকে। তখন

৪. আববাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পৃ: ৫০৬-৫০৭।

থেকে আজ পর্যন্ত এ ইতিহাস অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলে এসেছে সময় কাল ও পরিবেশ পরিস্থিতির চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে এবং তা চলতে থাকবে যতদিন দুনিয়া বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং মুসলমানদের অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই সামনে অগ্রসর হতে হবে।[৫] আব্বাস আলী খান তার অসম্ভব পরিশ্রম, ধৈর্য্য এবং একাগ্রতার সমন্বয়ের ফসল বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস এ গ্রন্থ খানি। এটা তার সাহিত্য জীবনের এক অনবদ্য গ্রন্থ। বইটি রচনা প্রসংঙ্গে জনাব খান বলেন, প্রায় দেড় যুগ পূর্বে বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস লেখার দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়। আশা ছিল বাংলায় মুসলমানেদের প্রথম আগমন থেকে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ পর্যন্ত এ সুদীর্ঘ ইতিহাস লেখার। তবে বিশেষভাবে ইংরেজদের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার পর মুসলমানদের প্রতি বৃটিশ সরকার ও হিন্দুদের আচার আচরণ কেমন ছিল তা যেন নির্ভরযোগ্য তথ্যাদিসহ ইতিহাসে উল্লেখ করি। কয়েক বছরের শ্রম ও চেষ্টা সাধনায় সে ইতিহাস লেখার কাজ সমাপ্ত করি। এ ইতিহাসের কোথাও কনা মাত্র অসত্য, কল্পিত অথবা অতিরঞ্জিত উক্তি করেনি। অনেকের কাছে তিক্ত হতে পারে কিন্তু আগাগোড়া সত্য ঘটনাই লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি।[৬] তার এ গ্রন্থটি সম্পর্কে বিদগ্ধ পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞগণ উচ্চশিত প্রশংসা করেছেন। তাদের মধ্য থেকে কয়েক জনের অভিমত আমরা এখানে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব।

অধ্যাপক আলী আহসান

এ গ্রন্থটি সম্পর্কে সুসাহিত্যিক ও সকলের শ্রদ্ধেয় পন্ডিত ব্যক্তি জাতীয় অধ্যাপক আলী আহসান বলেন, 'আমার ধারণা ছিলো রাজনীতিবিদরা পড়াশুনা করেন না। কিন্তু খান সাহেবের বই খানা পড়ে মনে হয়েছে এমন কিছু রাজনীতিবিদ এখনো আছেন যারা শুধু পড়াশুনাই করেন না, মনে হয় বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে আমরা যারা পড়াশুনা ও বিদ্যাবুদ্ধির অহংকার করি তাদের চাইতে বেশী করেন। বরং শুধু পড়াশুনা নয়, গবেষকদের মতই লেখা পড়া করেন।[৭] তিনি আরো উল্লেখ করেন, লেখক আলোচ্য গ্রন্থে হিন্দু মুসলিম সম্পর্কে প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরেছেন। সর্বকালীন ও সার্বজনীন ধর্ম ইসলামে বিশ্বাসীরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের সাথে মিলে এক সত্ত্বায় পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। মধ্যযুগে খৃষ্টানরা ইউরোপে ইসলামের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার শুরু করেছিল তা আজো অব্যাহত রয়েছে'।

---

৫. তদেব, পৃঃ ১১।
৬. তদেব, পৃ : ৯।
৭. আব্দুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত, *আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃঃ ৫৪।

কবি মোশররফ হোসেন

কবি মোশাররফ হোসেন বলেছেন, 'আব্বাস আলী খানের সাহিত্য রুচি, অভিজ্ঞান এবং পাঠের যে তীব্রতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিদ্যুৎ চমকের মত ঝলকানী দিয়ে উঠতো। তাঁর পান্ডিত্য, ভাষা আর লেখার আধুনিকতম কৌশল ও কারুকাজে আপ্লুত না হয়ে পারতাম না। তিনি সাড়ে পাঁচ বছর যাবৎ এ বইটি লিখেছেন এবং ধারাবাহিক ভাবে তা মাসিক পৃথিবীতে ছাপা হয়েছে। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, তিনি যখন বইটি শুরু করেন তখন তার বয়স (১৯১৪-১৯৮৯ খ্রী:) পঁচাত্তর বছর। আর যখন শেষ করলেন তখন বয়স দাড়িয়েছে (১৯১৪-১৯৮৯ খ্রী:) আশি বছরে। ভাবা যায়! তখন তিনি সমানে লিখছেন। কে না জানে যে, তিনি কেবল লেখাকে কেন্দ্র করেই চব্বিশ ঘন্টা অতিবাহিত করার অবকাশ পেতেন না। দিনের সিংহ ভাগ সময়ই তিনি ব্যস্ত থাকতেন নানা বিধ কাজে । এই সব হাজারো কাজের ফাঁকে তিনি যে কিভাবে নিয়মিত 'পৃথিবীর' প্রতিটি সংখ্যায় লেখা দিতেন, তা আজো আমার কাছে এক বিস্ময়কর ব্যাপার হয়ে আছে'।[৮]

অধ্যাপক আ. ন. ম. আব্দুস শাকুর

অধ্যাপক আ. ন. ম. আব্দুস শাকুর লিখেছেন, 'আব্বাস আলী খানের লিখিত বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস রচনা তাঁকে যদুনাথ সরকার, রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, সুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রফেসর ডঃ আব্দুল করিম[৯], প্রফেসর আব্দুর রহীম[১০] প্রমূখ প্রথম কাতারের ঐতিহাসিকগণের সাথে উল্লেখ করা যেতে পারে'।[১১]

আবুল আসাদ

বিশিষ্ট সাংবাদিক আবুল আসাদ বলেন, 'ইতিহাসের বিকৃতি এবং ইসলামের নামে অপ-প্রচার সহ নানা ভাবে আমাদের জাতিসত্ত্বা ধ্বংসের চক্রান্ত চলছে। মুসলিম জাতির মর্যাদাপূর্ণ অস্তিত্বের স্বার্থেই ১৯৪৭ সালে সতন্ত্র আবাসভূমি ছিল। কায়েদে আযম ভারত বিভাগ চাননি বলা ভুল। শত শত বছরের রাজত্বের পর কেন মুসলিম শাসনের পতন ঘটেছিল তার কারণ উপলব্ধী করতে লেখকের বইটি সহায়ক হবে'।[১২]

---

৮. মুঃ সেলিম উদ্দীন সম্পাদিত, *ছাত্র সংবাদ*, এপ্রিল সংখ্যা, ২০০০ খ্রী:, পৃঃ ১৩; আব্দুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত, *আববাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃঃ ১৯০।

৯. আব্দুল করিম (১৮৭১-১৯৫৩) সাহিত্যিক, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা এবং প্রাচীন বাংলা পুথির সংগ্রাহক ও ব্যাখ্যাকার। চট্টগ্রামের পটিয়া থানায় ১৮৭১ সালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ সালে পটিয়ার উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কয়েকটি স্কুলে শিক্ষকতা করার পর তিনি চট্টগ্রামে বিভাগীয় কমিশনারের অফিসে চাকুরী গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি সাহিত্য বিষয়ক নিবন্ধ রচনা করেন। তার সাহিত্য তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করে। মধ্য যুগে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান তার বিশেষ আগ্রহের বিষয়। এ কারণে তিনি সাহিত্য সাগর ও সাহিত্য বিশারদ উপাধিতে ভূষিত হন।
দ্রঃ সিরাজুল ইসলাম নম্পাদিত, বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৮।

১০. আব্দুর রহীম (আনু-১৭৮৫-১৮৫৩) যুক্তিবাদী ও চিন্তাবিদ। আনুমানিক ১৭৮৫ সালের দিকে উত্তর ভারতের গোরক্ষপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০৪ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি লাক্ষ্ণৌতে যান। প্রথম জীবনে আব্দুর রহীম ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। ১৮১০ সালে তিনি কলিকাতা চলে আসেন এবং বাকী জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন। ১৮৫৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর তিনি ইন্তিকাল করেন।
দ্রঃ সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ:১৮৪।

১১. আব্দুল কাইয়ুম ও এফ, আর মামুন সম্পাদিত, *সফল যারা কেমন তারা*, পৃঃ ৭৯।

১২. আ. ন. ম. আব্দুস শাকুর, *বাংলা ভাষায় মাওলানা মওদূদী (র:) চর্চা ও আববাস আলী খানের অবদান*, পৃঃ ২৮।

অধ্যাপক শাহেদ আলী

তিনি বলেন, 'আববাস আলী খান-এর বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস নামক এবইটি জাতির প্রয়োজনীয় পাঠ্য হওয়া উচিৎ। নিপীড়িত মানুষ মুক্তি লাভের আশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ইসলামী সমাজ কায়েম না থাকায় তাদের আশা পূর্ণ হয়নি। বাংলায় মসুলিম সমাজের সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ইতোপূর্বে রচিত হয়নি। এদিক থেকে আববাস আলী খানকে পথিকৃত বলা যায়'।[১৩]

ড. আব্দুল্লাহ

ড. আব্দুল্লাহ বলেন, 'জনাব খান রাজনীতি সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের বাস্তবায়ন এবং মুসলিম ইতিহাসের বিকৃতির অপনোদন চান। বইটিতে এ দু'টি বিষয় তিনি সাফল্যের সাথে তুলে ধরেছেন। কুর'আনের শিক্ষা ভুলে গিয়ে আমরা আজ বাঙ্গালী বনাম বাংলাদেশী দ্বন্দ্বে মেতে আছি। ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ইসলাম সমর্থন করে না'।[১৪]

অধ্যাপক নাজির আহমদ

বিশিষ্ট শিক্ষাবীদ অধ্যাপক নাজির আহমদ বলেন, 'এদেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠি মুসলমান। কিন্তু তারা ইসলামের সামগ্রীকতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। আমাদের আদর্শিক পরিচিতি ও ইতিহাস উপস্থাপনের জন্যই এ বইটি প্রকাশ করা হয়েছে'।[১৫]

আব্দুল কাদের মোল্লা

আব্দুল কাদের মোল্লা বলেন, '১৯৩৫ সালে যখন মুসলমানেরা ইংরেজ ও হিন্দুদের ডাবল গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ, সে সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজন মুসলিম ছাত্রের ইতিহাসে গ্রাজুয়েশন পরীক্ষায় ডিষ্টিংকশন পাওয়া মোটেই সহজ ব্যাপার ছিলো না। বিশেষ করে হিন্দুদের চরম সাম্প্রদায়িক মানসিকতার কারণে মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে ভাল ফল করা খুবই কঠিন ছিল। কারণ তারা প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। তাঁর লিখিত 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' ইতিহাসের প্রতি তাঁর দখলের অন্যতম দলীল'।[১৬]

শাহ্ আব্দুল হান্নান

বাংলাদেশ সরকারের সচিব শাহ্ আব্দুল হান্নান বলেন, 'He has writter important works on history, Islamic movement and Islamic studies. Though he had no formal education as historain. He left he hind a major work on "Muslim History in Bengal. Except for Dr. Mohor Alis "History of Muslim Bengal. This work is the best on the subject.'[১৭]

---

১৩. নাজমুস সায়াদাত সম্পাদিত, *আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৩৪৯; দৈনিক সংগ্রাম, ৮ ই অক্টোবর, ১৯৯৪ খ্রী:।

১৪. তদেব, পৃ: ৩৪৯, ৩৫০।

১৫. তদেব।

১৬. আব্দুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত, *আব্বাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীণ প্রাণ*, পৃ: ৫৪।

১৭. তাদেব, পৃ: ৮৪।

দুই : মাওলানা মওদূদী (র)-এর বহুমুখী অবদান

এটি আব্বাস আলী খানের একটি মৌলিক গ্রন্থ। ১৯৮৫ সালে বইটি সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। মোট পৃষ্ঠা ৩২ মূল্য ১২/= (বার) টাকা মাত্র। মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী (র) ছিলেন একজন কালজয়ী ইসলামী চিন্তাবিদ, শ্রেষ্ঠ 'আলিমে দ্বীন, মুজাহিদ, বিপ্লবী তাফসীর লেখক, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান এবং কুর'আন হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রের বিদগ্ধপন্ডিত, সাহিত্য সম্রাট, হৃদয় জয়কারী সুদক্ষ বাগ্মী ও সংগঠক। তিনি তাঁর এ ধরণের বহুমুখী অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ আববাস আলী খান এ গ্রন্থখানি রচনা করেন। এ বইটিতে যেসব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে তা হলো :

১.**মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান :** এখানে তিনি মাওলানা মওদূদীর অবদানের সার সংক্ষেপ তুলে ধরেছেন।

২.**ইসলামী পূনর্জাগরণ :** এ অধ্যায়ে মাওলানার ইসলামী পূনর্জাগরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচী সহ তার অবদান আলোচনা করেছেন এবং তাঁকে বিংশ শতাব্দীর একজন মুজাহিদ হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন।[১৮]

৩.**ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন :** এ অধ্যায়ে মাওলানা মওদূদী (র) ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার একটা চিত্র তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে ১৯৮৩ সালে আল্লামা ইকবালের আহবানে মাওলানা পাঞ্জাব প্রদেশে হিযরত করেন এবং জামালপুর পাঠানকোটে দারুল ইসলাম নামে একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। তার উদ্দেশ্য বর্ণনায় মাওলানার নিজের একটি উক্তি তিনি উল্লেখ করেছেন। মাওলানা বলেন এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচেছ আল্লাহর কালামকে সমুন্নত করা। অর্থাৎ ইসলামী আইনকে মানব রচিত আইনের উপর কার্যত: বিজয়ী করা। দ্বিতীয়তঃ যারা ইসলামী আইনের উপর ঈমান রাখে এবং তাকে দুনিয়ার সকল আইনের উপর বিজয়ী করতে চায় তাদেরকে একত্রে সংগঠিত করা। তিনি আরোও বলেন আমার জীবনের উদ্দেশ্য ও মিশন হলো ইসলামী আন্দোলনের পূনঃপ্রতিষ্ঠা। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মাওলানা ৭৫ জন বিপ্লবী লোক নিয়ে ১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামী নামে একটি আদশর্বাদী দল গঠন করেন। এবং সাথে সাথে বিপ্লবের জন্য বিপুল সাহিত্য ভান্ডার সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়ে এ আন্দোলনের স্বপক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।[১৯]

৪. **রাজনীতির অংগনে মাওলানার অবদান :** রাজনীতির ক্ষেত্রে মাওলানার অবদানের কথা উল্লেখ করে জনাব খান সাহেব বলেন, এক জন সমাজ সংস্কারককে তার সামজিক পরিবেশের প্রতিটি বিষয়ের প্রতি সুক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হয়। যাতে করে কোন ছিদ্র পথে জাহেলিয়াতের স্রোতধারা প্রবেশ করে সমাজকে ভাসিয়ে নিয়ে না যায়, সমাজের অবশিষ্ট নৈতিক ও ইসলামী মূল্যবোধ টুকু ধুয়ে মুছে নি:শেষ হয়ে না

---

১৮. এ সম্পর্কে নবী পাকের সাঃ যে সুস্পষ্ট ভবিষ্যত বাণী রয়েছে তার মর্ম এই যে, ইনশাল্লাহ ইসলামী ইতিহাসের কোন এক শাতাব্দীও এমন লোকদের থেকে বঞ্চিত হবে না যারা জাহেলিয়াতের আগ্রাসনের মোকাবেলা করবেন এবং ইসলামকে তার আসল প্রাণশক্তি ও রূপে আকৃতিতে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা চালাবেন। ইসলামী পরিভাষায় এমন লোককে বলা হয় মুজাদ্দিদ।
দ্রঃ আববাস আলী খান, *মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান* (ঢাকাঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ১৯৮৫ খ্রী:), পৃঃ ৬।

১৯. তদেব,পৃ:১৩-১৫।

যায়। ইসলামের সংস্কারক হিসেবে মাওলানা মওদূদী (র) মানুষকে প্রকৃত ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতিতে তার সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করেছেন। রাজনৈতিক প্রতিভা ও দূরদর্শিতা ছিল তার অসাধারণ। তাই তিনি তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা থেকে সুদূর ভবিষ্যতের যে চিত্র একে দিতেন তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে পরিণত হত। শুধু ইসলামের প্রশ্নে শাসকগণ তার প্রতি বিদ্বেষ পোষন করলেও জাতির জটিল প্রশ্নে তার সুপরামর্শ নিতে তারা বাধ্য হয়েছেন।[২০]

৫. **মুসলিম উম্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মাওলানার অবদান :** মুসলিম উম্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মাওলানার অবদান বর্ণনায় আববাস আলী খান বলেন, যেহেতু তাঁর দাওয়াত, বাণী ও আদর্শ ছিল আর্ন্তজাতিক, বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য, তাই তাঁর ব্যক্তিত্ব কোন ভৌগলিক দেশ ভিত্তিক ছিল না বরং আন্ত র্জাতিক। সেজন্য তিনি ছিলেন সকল আঞ্চলিকতা, স্বজনপ্রীতি ও একদেশ-দর্শিতার বহু উর্ধে। তাই সারা বিশ্বের মুসলমানদের কাছে সাইয়েদ মওদূদী একটি অতি প্রিয় নাম, সকলের আকর্ষণ ও শ্রদ্ধার পাত্র। উপরন্তু তিনি আধুনিক ও ইসলামী জ্ঞান ও চিন্তাগবেষণার বিশ্বকোষ। তাঁর মূল পরিকল্পনার ভিত্তিতে মদিনায় যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চলছে তাতে বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রগুলি থেকে শত শত ছাত্র জ্ঞান লাভ করছে এবং তাদের মধ্যে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের প্রেরণা সৃষ্টি হচ্ছে। ১৯৫২ সালে মক্কায় যে বিশ্ব ইসলামী সম্মেলন হয়েছিল তাতে মাওলানা যোগদান করেন এবং তারই পরামর্শে ইসলামী বিশ্বের সাথে সংযোগ সম্পর্ক স্থাপনকারী রাবেতা 'আলমে ইসলামী নামক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া তিনি একান্ত ভাবে কামনা করতেন যে, বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলি ইসলামের ভিত্তিতে একটি "কমনওয়েল্থ" গঠিত হোক। অবশেষে ষাটের দশকের শেষাংশে মরক্কোতে অনুষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর শীর্ষ সম্মেলনে 'ইসলামী সেক্রেটারিয়েট' গঠিত হয়।[২১]

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় মাওলানা বিশ্ব মানবতার আহ্বায়ক ছিলেন এবং মুসলিম উম্মার প্রবক্তা ছিলেন। তাই মুসলিম মিল্লাতের জন্য তার বহুমুখী অবদান তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

৬. **তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রে মাওলানার অবদান :** মাওলানার লিখিত তাফসীর গ্রন্থ তাফহীমুল কুর'আন শিরোনামে আববাস আলী খান তাঁর উক্ত গ্রন্থে মন্তব্যে বলেন, 'এটি তাঁর ইসলামী জ্ঞান গবেষণা ও ইজতিহাদের স্বর্ণ ফসল। কুর'আনের সম্মোহনী শক্তি যেভাবে দুর্ধর্ষ ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে টেনে এনেছিল এবং বাদশা নাজ্জাশীর গন্ডদেশ অশ্রু প্লাবিত হয়েছিল, অনুরূপ ভাবে মাওলানার তাফসীর তাফহীমুল কুর'আন পাঠকের মনে বিপ্লবী আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর তাফসীর সারা বিশ্বে ইসলামের এক নব দিগন্তের উম্মোচন করেছে। অপর দিকে

---

২০. তদেব, পৃ: ১৬-১৮।
২১. তদেব, পৃ: ১৯।

হাদীস অমান্য কারীরা হাদীস শাস্ত্রকে অমূলক ও অবিশ্বাস্য প্রমান করতে চাইলে তিনি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে তার সত্যতা প্রমান করলে সকল সন্দেহের অবসান হয়। কুর'আনের তাফসীরের ক্ষেত্রে তিনি অনেক দ্বিধা-দ্বন্দের অবসান করেছেন'।[২২]

৭.**সীরাতে সরওয়ারে আলম :** আববাস আলী খান উক্ত গ্রন্থে মাওলানা মওদূদী (র)-এর সীরাত সরওয়ারে আলম গ্রন্থের সমালোচনা করে বলেন, এটি মাওলানার একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। রাসূলুল্লাহুল্লাহ্ (সা) ছিলেন আল কুর'আনের বাস্তব চিত্র। তাই তিনি নবী জীবনকে কুর'আন পাকের সাথে মিলিয়ে এবং তাঁর গোটা জীবনকে কুর'আনের ভিত্তিতে একটি বিপ্লবী আন্দোলন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর রচিত সীরাতগ্রন্থ খানি দু'খণ্ডে প্রকাশিত এবং তা মক্কী জীবন সম্পর্কে। মাদানী জীবন লেখার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন।[২৩]

৮. **এক নজরে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী :** এ অধ্যায়ে ১৯০৩ সালে মাওলানার জন্ম থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের বিবরণ তুলে ধরেছেন।

৯. **মাওলানা মওদূদী প্রণীত গ্রন্থাবলী :** এ অধ্যায়ে আব্বাস আলী খান মাওলানা মওদূদী (র)-এর বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত ৯৩ খানা বইয়ের বিষয় ভিত্তিক তালিকা দিয়েছেন। তন্মধ্যে নিম্নে উক্ত তালিকা উল্লেখ করা হলো :

ক. কুর'আন সম্পর্কিত	৫ টি
খ. হাদীস ও সুন্নাহ	২ টি
গ. ইসলামী জীবন দর্শন	২৫ টি
ঘ. অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা	৭ টি
ঙ. দাম্পত্য জীবন ও নারী	৪ টি
চ. তাজকিয়ায়ে নফস	৪ টি
ছ. সীরাত	৫ টি
জ. আইন, রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা	১৩ টি
ঝ. ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন	১৮ টি এবং
ঞ. সামগ্রীক বিষয়ে	১০ টি।

তিন. জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত)

এটি আব্বাস আলী খানের রচিত মৌলিক গ্রন্থ। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশ করে। ১৯৯৭ সালে বইটির ৩য় সংস্কার বের করা হয়। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০, মূল্য ৩০/= (ত্রিশ) টাকা। বইটি লেখার জন্য তিনি ছোট বড় মোট ১০ টি বই এবং অনেকগুলো সাপ্তাহিক পত্রিকার সহযোগিতা নিয়েছেন। এতে মোট পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে। বইটি রচনা প্রসঙ্গে তিনি গ্রন্থের মুখবন্ধে উল্লেখ করেন, জামায়াতে ইসলামী তথা বিংশ শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য সংগঠনের

২২. তদেব, পৃ: ২০।
২৩. তদেব, পৃ: ২১।

বিস্তারিত ইতিহাস রচনা করা বড় কঠিন ও সময় সাপেক্ষ। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিদিনের কাজ ও প্রতিটি পদক্ষেপ লিপিবদ্ধ হওয়ার যোগ্য। তাই তার বিস্তারিত ও পরিপূর্ণ ইতিহাস কয়েক খণ্ডে পরিণত হবে। এমন ইতিহাস লেখার দুঃসাহস না থাকলেও এ দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয় এবং রুকন সম্মেলনে এ লিখিত ইতিহাস পাঠ করার দায়িত্বও আমার উপর অর্পিত হয়। তাই তড়ি ঘড়ি ও কাটছাট করে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখে তা সম্মেলনে পাঠ করি। পরবর্তীতে এ ইতিহাস গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার দাবী উঠলে তা প্রকাশ করা হয়।[২৪] এ গ্রন্থটিতে তিনি মুলতঃ জামায়াতে ইসলামীর সত্যিকার পরিচয়, তা গঠনের প্রয়োজনীয়তা, গঠনের পটভূমি, ভারতীয় মুসলমানদের কোন জীবন-মরন সন্ধিক্ষণে এর প্রতিষ্ঠা, নবীদের আন্দোলনের সাথে এর সম্পর্ক কি? দুনিয়ার অন্যান্য আন্দোলন এবং জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে পার্থক্য, এ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কে? কি তাঁর পরিচয়?[২৫] এ ব্যাপারে অত্যন্ত তথ্যবহুল আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন। এ ছাড়া এ গ্রন্থটিতে মৌলিক ভাবে যে বিষয় গুলো আলোচনা করেছেন তা হলো :

১. **জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস :** এ অধ্যায়ে তিনি জামায়াতে ইসলামী কি? ইসলামী আন্দোলনের সূচনা, খুলাফায়ে রাশেদীনের ইসলামী আন্দোলন, খুলাফায়ে রাশেদীনের পর ইসলামী আন্দোলন, ভারতে ইসলামী আন্দোলন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সংক্ষিপ্ত পরিচয়, আল-জিহাদ ফিল ইসলাম, গবেষণা ও ইসলামী আন্দোলনের প্রস্তুতির স্তর, তৎকালীন ভারতে মুসলমানদের অবস্থা, তর্জুমানুল কুর'আনের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন, দারুল ইসলাম ট্রাষ্ট গঠন ও ইসলামী আন্দোলন, দল গঠনের পটভূমিকা রচনা ইত্যাদি বিষয় সংযুক্ত করেছেন।

২. **দারুল ইসলামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য :** এ শিরোনামের এ অধ্যায়ে আববাস আলী খান শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব, প্রকৃত পক্ষে প্রথম প্রস্তাব, দ্বিতীয় প্রস্তাব তৃতীয় প্রস্তাব নামে ইসলামী শাসনতন্ত্রের কিছু প্রস্তাবনা তিনি উপস্থাপন করেছেন।

৩. **জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা :** এ অধ্যায়ে জামায়াতে ইসলামীর কাজ ও জামায়াতের গঠনতন্ত্রের অনুমোদন এ দু'টি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

৪. **জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত :** এ শিরোনামের অধ্যায়ে ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত মাওলানা মওদূদীর সাংগঠনিক কর্মব্যস্ত জীবন ও এ সময়ের বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আলোচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো

আমীরে জামায়াতের সাংগঠনিক ও দাওয়াতী সফর, জামায়াতের দপ্তর স্থানান্তর, মাওলানার বিশেষ হেদায়েত, মাওলানার অসাধারণ কর্মব্যস্ত জীবন, মজলিসে শুরার জরুরী বৈঠক, জামায়াতের প্রাথমিক সাংগঠনিক স্তর, সেক্রেটারী জেনারেল (কায়েম), প্রথম নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামীর রুকন

২৪. আববাস আলী খান, *জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস* (সংক্ষিপ্ত) (ঢাকা: সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ৩য় সং, ১৯৯৫ খ্রী:), পৃ: ৩-৫।

২৫. আববাস আলী খান, জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত), পৃ: ৫-৬।

সম্মেলন, দ্বিতীয় নিখিল ভারত সম্মেলন (১৯৪৬), পাটনা সম্মেলন (১৯৪৭), জামায়াতের সাহিত্য সৃষ্টি, ভারত বিভাগ, দেশ বিভাগের সময় দারুল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী দু'ভাগে বিভক্ত, ৬ জানুয়ারী ১৯৪৮, মাওলানার গ্রেফতারী, আদর্শ প্রস্তাব ১২ ই মার্চ ১৯৪৯, মুক্তিলাভ, 'আলিমগণের ২২ দফা, ১৯৫৩ সাল, ডাইরেক্ট এ্যাকশন ঘোষণা, মাওলানার প্রতি মৃত্যুদন্ডাদেশ, পূর্ব-পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদূদীর সফর, মাওলানার দ্বিতীয় বার পূর্ব পাকিস্তান সফর, নিখিল পাক জামায়াতে ইসলামী সম্মেলন (১৯৫৯-৬৩) ও একত্তোরের ভূমিকা।[২৬]

৫. জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য

এ অধ্যায়ে জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য শিরোনামে নিম্ন লিখিত বিষয় গুলি উল্লেখ করা হয়েছে।

১. এ জামায়াতের দাওয়াত আকিদা-বিশ্বাস ও লক্ষ্যের দিকে। কোন ব্যক্তিত্বের দিকে নয়।

২. এ জামায়াতের গঠন প্রকৃতি কোন সংকীর্ণ ফের্কার (দলের) মত নয়।

৩. দাওয়াতের উদ্দেশ্য হলো একামতে দ্বীনের জন্য একনিষ্ঠ ভাবে জামায়াতে যোগদান করা।

৪. সংগঠনের একটি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আছে। পরিপূর্ণ কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে খাঁটি মুমিন হিসেবে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী করে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

৫. সময়ানুবর্তীতা জামায়াতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি মুহূর্ত অমূল্য। এ অমূল্য সময় যথাযথ ভাবে এক জন মুমিন হিসেবে কর্মময় করে তোলার তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

৬. জামায়াতের নেতৃত্ব লাভের জন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ নেই।[২৭] যোগ্যতার মানদন্ডে নেতৃত্বের দায়িত্ব ঘাড়ে এসে যায় এবং তখন সে দায়িত্ব পালনের জন্য বদ্ধপরিকর থাকেন।

৬. পরিশিষ্ট

৭. জামায়াত প্রতিষ্ঠাতার কিছু মূল্যবান কথা

এ শিরোনামে লেখক আববাস আলী খান উল্লেখ করেন, দল গঠনের আবশ্যকতা, তাবলীগ ও বিপ্লব, ইকামতে দ্বীন একটি অটল ও অপরিহার্য কর্তব্য, হুকুমতে ইলাহীয়া ও আল্লাহর সন্তুষ্টি, সত্য পথের দাবী। বইটির পরিশিষ্টে তিনি আরো বলেন, মুসলিম জাতির এমন এক পতন যুগে এ আন্দোলন শুরু করা হয়েছিল যখন সামগ্রিক ভাবে মুসলমান ঈমান আকিদা ও আমল আখলাকের দিক দিয়ে ইসলাম থেকে দূরে সরে পড়েছিল। একটি শক্তিশালী চক্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিকল্পনার অধীনে মুসলমানদের কে গোলাম বানিয়ে তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র মুছে ফেলার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। ঠিক এমনি সময়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) ইসলামী আন্দোলনের মশাল হাতে নিয়ে মুসলমানদের চলার পথ আলোকিত করেন।[২৮]

---

২৬. তদেব, পৃ: ৪।
২৭. তদেব, পৃ: ২৬-২৭।
২৮. তদেব, পৃ: ৭৪-৭৫।

চার. মৃত্যু যবনিকার ওপারে

গ্রন্থখানী আব্বাস আলী খানের এক অনবদ্য রচনা শৈলী। তিনি যে একজন খোদাভীরু, তাকওয়া পূর্ণ ও পরকালের জবাবদিহিতার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন তার প্রমান মেলে তার এ লিখনিতে। তিনি তার এ গ্রন্থে যুক্তি প্রমান দিয়ে পরকালের বিষয়ে তার এ লেখা উপস্থাপন করেছেন। এ তার পরকাল সম্পর্কিত রচিত মৌলিক গ্রন্থ। গ্রন্থটি বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত আধুনিক প্রকাশনী ২০০৫ সালে ৯ম বারের মত প্রকাশ করে। এর আগে ২০০১ সালে ৬ষ্ঠ এবং ১৯৯৭ সালে ৫ম সংকরণ প্রকাশিত হয়। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৩ এবং মূল্য ৪৫ টাকা।[২৯] এ গ্রন্থটিতে আখেরাত সম্পর্কিত অনেক গুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে মানব মনের স্বাভাবিক প্রশ্ন,[৩০] পরকাল সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ,[৩১] জ্ঞানের মূল উৎস, যুগে যুগে নবীদের আগমন, পরকাল সম্পর্কে ইসলামী মতবাদ,[৩২] পরকালের বিরোধীতা, এক মাত্র খোদভীতি অপরাধ প্রবনতা দমন করতে পারে, পরকাল সম্পর্কে কুর'আনের যুক্তি,[৩৩] পরকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক যুক্তি,[৩৪] দুনিয়ার জীবন মানুষের পরীক্ষা ক্ষেত্র,

---

২৯. আব্বাস আলী খান, *মৃত্যু যবনীকার ওপারে* (ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদোশ প্রকাশনা বিভাগ, ৬ষ্ট সংস্করণ, ২০০১ খ্রী:), পৃ: ২; নাজমুস সায়াদাত সম্পাদিত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৩১০।

৩০. এ দুনিয়ার জীবনটা কি একমাত্র জীবন না, এর পরও কোন জীবন আছে? অর্থাৎ মরণের সাথে সাথেই কি মানব জীবনের পরিসমাপ্তি? না তার পরও জীবনের জের টানা হবে? মানব মনের এ এক স্বাভাবিক প্রশ্ন এবং সকল যুগেই এ প্রশ্নে দ্বিমত হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে দু'টি বিপরীতমুখী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।
দ্র: আববাস আলী খান, *মৃত্যু যবনিকার ওপারে*, পৃ: ৯।

৩১. মানব মনের স্বাভাবিক প্রশ্নের জবাব খুজতে গিয়ে পরকাল সম্পর্কে অনেক গুলো মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন :
১. স্রষ্টা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। এ জগৎ হঠাৎ কোন দুর্ঘটনার ফলশ্রুতি স্বরূপ।
২. এ জগৎ অনাদি ও অনন্ত, এর কোন ধবংস নেই। কিন্তু পুনর্জীবন সম্ভব নয়।
৩. মৃত্যুর পর মানুষ বারবার এ দুনিয়ায় জন্ম গ্রহণ করবে।
৪. এ জগত টা মহাপাপের স্থান। এখানে জীবনটাই এক মহাশাস্তি। আর মানবাত্মার প্রকৃত মুক্তি তার ধ্বংসে।
৫. পরকাল, বেহেশত ও দোযখে বিশ্বাসী দলের জন্ম হয়েছে।
দ্র: আববাস আলী খান, *মৃত্যু যবনিকার ওপারে*, পৃ: ১২ ও ১৩।

৩২. পরকাল সম্পর্কে নবী প্রদত্ত যে ধরণা, তাকে বলে ইসলামী মতবাদ। সংক্ষেপে এ মতবাদ হলো পৃথিবী, আকাশ মণ্ডলী, ও তারমধ্যে যাবতীয় সৃষ্টি একদিন অনিবার্য রূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ ধ্বংসের সূচনা ও বর্ণনা কুরআনে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ রয়েছে। একমাত্র খোদা ব্যতীত আর যা কিছু সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। অতপর খোদায়ী নির্দেশে এক নতুন জগৎ তৈরী হবে। প্রতিটি মানুষ পূর্ণজীবন লাভ করে খোদার দরবারে উপস্থিত হবে। দুনিয়ার জীবনে সে ভাল মন্দ যা কিছুই করেছে তার হিসেব নিকাশ সে দিন তাকে দিতে হবে খোদার দরবারে। এটাকে বলা হয়েছে বিচার দিবস। এ দিবসের একচ্ছত্র মালিক ও বিচারক স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা।
দ্র: আববাস আলী খান, *মৃত্যু যবনিকার ওপারে*, পৃ: ১৯।

৩৩. মৃত্যুর পর মানব দেহের অস্থি , চর্ম, মাংস ও অনু-পরমানু ক্ষয়প্রাপ্ত হবার বহুকাল পরে তাদের পূর্ণজীবিত হবার কোন সম্ভবনা নেই বলে অবিশ্বাসীরা যে উক্তি করে, তার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন,
১. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ -'আমি তো এটাও জানি যে, মৃত্যুর পর তাদের দেহের কতটুকু অংশ জমিন বিনষ্ট করে। আমার কাছে একটি গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে।
দ্র: সূরা কাফ: ৫০ : ৪।
২. نحن خلقناكم فلولا تصدقون -'বল তো, তাকে কি তোমরা বানিয়ে দাও, না আমি তার স্রষ্টা?
দ্র: সূরা ওয়াকিয়া: ৫৬ : ৫৭।

আলমে বরযখ, কবরের বর্ণনা, মহা প্রলয়, জাহান্নামীদের প্রধান প্রধান অপরাধ,[৩৫] জান্নাতীদের সাফল্যের কারণ, জাহান্নামীদের দুর্দশা, জান্নাতবাসীদের পরম সৌভাগ্য, পরকালে পাঁচটি প্রশ্ন,[৩৬] আত্মা এবং পরকালে শাফায়াত প্রভৃতি বিষয় গুলো এ গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে।

গ্রন্থটি রচনা প্রসঙ্গে আব্বাস আলী খান বলেন, যে সব আকিদাহ বিশ্বাসের উপর ঈমানের প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস অন্যতম। আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস না থাকলে আল্লাহ, রাসূল, আল্লাহর কিতাব প্রভৃতির প্রতি সত্যিকার অর্থে বিশ্বাসই জন্মে না। উপরন্ত প্রবৃত্তির দাসত্ব ও শয়তানী প্ররোচনা থেকে মুক্ত হয়ে নিষ্ঠার সাথে নেক আমল করতে হলে আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া সম্ভব নয়। আবার আখেরাতের প্রতি যেমন তেমন একটা বিশ্বাস রাখলেই চলবে না বরং সে বিশ্বাস হতে হবে ইসলাম সম্মত, কুর'আন হাদীস সম্মত। এ বিশ্বাসে থাকে যদি অপূর্ণতা অথবা তা যদি হয় ভ্রান্ত তাহলে গোটা ঈমান ও আমলের প্রাসাদ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।[৩৭] তিনি বলেন, পার্থিব জীবনটা একমাত্র জীবন নয় বরং মৃত্যুর পরের জীবনই আসল ও অনন্ত জীবন। সেখানে পার্থিব জীবনের নৈতিক পরিনাম ফল অবশ্যই প্রকাশিত হবে। সেখানে আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য প্রতিটি কর্ম বিচারের জন্য উপস্থাপন করবেন। প্রতিটি পাপ পূণ্যের সুবিচারপূর্ণ সিদ্ধান্ত সে দিন করা হবে। সে

---

৩. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة -'হে মানুষ! পুনরুত্থানের দিবস সম্পর্কে যদি তোমাদের মনে কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে,জেনে রাখ যে, আমি তোমাদের প্রথম মাটি থেকে, অতপর শুক্র থেকে, অতপর রক্তপিণ্ড থেকে, তারপর মাংশপিন্ড থেকে পয়দা করেছি, যা আকৃতি বিশিষ্ট কিংবা আকৃতি বিশিষ্ট না। যেন তোমাদের কাছে আমি প্রকাশ করে দিতে পারি।

দ্রঃ সূরা হাজ্জ: ২২ : ৫।

৪. قال من يحي العظام وهي رميم -'সে বলল, কে হাড়কে পুনরায় জীবিত করবে?

দ্রঃ সূরা ইয়াসিন: ৩৬ : ৭৮।

দ্রঃ আববাস আলী খান, *মৃত্যু যবনিকার ওপারে*, পৃঃ ৩২, ৩৩, ৩৭।

৩৪. প্রথমতঃ তুর পর্বত। এ এমন এক ঐতিহাসিক পবিত্র পর্বত যার উপরে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুছা (আ) এর সঙ্গে কথোপকথন করে তাঁকে নবুয়াতের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এতদ প্রসংগে একটি দূর্দান্ত প্রতাপশালী জাতির অধঃপতন এবং অন্য একটি উৎপীড়িত ও নিষ্পেষিত জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের সিদ্ধান্তও এ স্থানে গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্ত তাদের কুকর্মের শাস্তি দান আইন অনুযায়ী হয়েছিল। অতএব পরকালে সত্যতার ঐতিহাসিক প্রমানের জন্য তুর পর্বতকে একটা নিদর্শন হিসাবে পেশ করা হয়েছে।

দ্রঃ আববাস আলী খান, *মৃত্যু যবনিকার ওপারে*, পৃঃ ৩৯-৪০।

৩৫. জাহান্নামীদের প্রধান অপরাধ হলো নবীগণ কর্তৃক প্রচারিত সত্যকে অস্বীকার করা, সত্য ও সত্যের দিকে আহবান কারীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করা, জীবনের প্রতি মুহূর্তে অনুগ্রহ ও দান লাভ করে তাঁর অকৃতজ্ঞ হওয়া, সৎ পথে প্রতিবন্ধকতা করা ও সৎ পথ থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং অপরকে পথ ভ্রষ্ট করা, আপন সম্পদ থেকে খোদা ও মানুষের হক আদায় না করা, জীবনে খোদা কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লংঘন করা এবং খোদার সঙ্গে অন্যকে অংশীদার করা।

দ্রঃ আববাস আলী খান, *মৃত্যু যবনিকার ওপারে*, পৃঃ ৬২।

৩৬. বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে যে প্রধান কয়টি প্রশ্ন করবেন তা হলো : তার জীবনের সময় গুলি সে কোন কাজে ব্যয় করেছে, তার যৌবন কাল কিভাবে ব্যয় করেছে, সে কিভাবে তার অর্থ উপার্জন করেছে, তার অর্জিত অর্থ সে কোন পথে ব্যয় করেছে এবং সে যে সত্য জ্ঞান লাভ করেছিল তার কতটা সে তার জীবনে কার্যকর করেছে।

দ্রঃ আববাস আলী খান, *মৃত্যু যবনিকার ওপারে*, পৃঃ ১০২; মাওলানা আব্দুর রহীম, *হাদীস শরীফ*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: খায়রুল প্রকাশনী, ২৩ প্রকাশ, ২০০৫ খ্রীঃ), পৃঃ ১০১।

৩৭. তদেব, পৃঃ ভূমিকা।

দিনের ভয়াবহ রূপ যদি মনের কোনে চির জাগরুক থাকে আর তার সাথে যদি থাকে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান খোদার ভয়। তাহলেই পাপ কাজ থেকে দূরে সরে থেকে উন্নত ও মহান চরিত্র লাভ করা সম্ভব হবে।[৩৮] তিনি আরো বলেন, দুনিয়ার কলাহল থেকে মুক্ত হয়ে কিছুকাল নির্জন নিরব কারাজীবন কালে মৃত্যু যবনিকার ওপারে গ্রন্থখানি রচনা করেছি। এ গ্রন্থ রচনায় হঠাৎ প্রেরণা লাভ করেছিলাম তাফহীমুল কুর'আনের সূরা কাফ-এর তাফসীর পড়তে গিয়ে। এতদ্ব্যতীত কোন জ্ঞানী ও গুণীর পরামর্শ নেওয়ার অথবা কোন প্রামান্য গ্রন্থের সাহায্য নেওয়ার সুযোগও তখন হয়নি।[৩৯] গ্রন্থখানির শেষ ভাগে গ্রন্থকার শেষ কথা বলে মৃত্যুর পর মানুষ যে নতুন জীবন লাভ করে নতুন জগতে পদার্পণ করবে তার অনিবার্যতার কথা তুলে ধরেছেন। এবং শেষ জীবনকে সুখী ও আনন্দমূখর করার জন্যই ইহ-জগতকে পর-জগতের কর্মক্ষেত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৪০]

পাঁচ. ইসলামী বিপ্লব একটি পরিপূর্ণ নৈতিক বিপ্লব

এটি খান সাহেবের লিখিত একটি মৌলিক ও ইসলামী আন্দোলন সংক্রান্ত গ্রন্থ। এ গ্রন্থে খান সাহেব ইসলামী বিপ্লব যে অন্যান্য বিপ্লবের ন্যায় আংশিক বিপ্লব নয় বরং এটি একটি পরিপূর্ণ ও নৈতিক বিপ্লব, তার একটি খণ্ড চিত্র তিনি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। খান সাহেব বলেন, ইতিহাসের পাতায় অনেক বিপ্লবের কাহিনী উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সে সব বিপ্লবের পটভূমি, বিপ্লবকালীন ঘটনাবলী এবং বিপ্লব-উত্তর পরিস্থিতির নিরপেক্ষ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এসব বিপ্লব জীবনের সকল ক্ষেত্রে কল্যাণ সাধন করতে পারেনি। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা কল্যাণ সাধিত হলেও গণমানুষের হাহাকার ও আর্তনাদ বন্ধ করতে পারেনি। সে বিপ্লব সমাজ সংস্কারের পরিবর্তে বিপ্লবীদের মনে হত্যা, লুন্ঠন, অত্যাচার, নির্যাতন ও মানবীয় মৌলিক অধিকার হরণের অদম্য পিপাসা জাগ্রত করেছে। সুতরাং বলা যায় যে মানবীয় কল্যাণের ক্ষেত্রে ঐ সব বিপ্লব কোন অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি।"[৪১]

নবীদের আগমন

আল্লাহ তা'আলা এ সমস্যা জর্জরিত ও বেদনাক্লিষ্ট মানব সন্তানদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্যে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও জাতির কাছে নবী প্রেরণ করেন। তাঁরা সকল সমস্যার মূল কারণের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার সমাধানের জন্য সত্যের দিকে মানুষকে আহবান জানিয়েছেন। তাঁদের ডাকে যারা সাড়া দিয়েছে, তাঁদের মন মস্তিস্ক, চিন্তাধারা, আচার-আচরণ, জীবনের দৃষ্টি ভঙ্গি পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ হয়েছে।

---

৩৮. তদেব।
৩৯. আববাস আলী খান, *মৃত্যু যবনিকার ওপারে*, পৃঃ ভূমিকা ।
৪০. তদেব।
৪১. আব্বাস আলী খান, *ইসলামী বিপ্লব একটি পরিপূর্ণ নৈতিক বিপ্লব* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সং, ১৯৯৭ খ্রীঃ), পৃঃ ৩।

নবী করিম (সা)-এর বিপ্লব

এভাবে রাসূলুল্লাহ্ল্লাহ্ (সা) যে সমাজে বিপ্লব সাধন করেছিলেন, সে সমাজের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে খান সাহেব বলেন, সে সময় কোন কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল না বরং সর্বত্রই স্বৈরশাসন বলবৎ ছিল। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, নিস্পেষণ করা, প্রভাব প্রতি পক্তিশালীগণ কর্তৃক দরিদ্র অসহায়দেরকে ক্রীতদাস হিসেবে জীবন যাপন করতে বাধ্য করা এবং গোত্রে হানাহানী ও যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকা ছিল তৎকালীন সমাজের চিত্র। তাছাড়া নৈতিকতার কোন বালাই ছিল না। নারী জাতি ছিল সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং তারা ছিল সমাজপতি ও সবলদের ভোগের সামগ্রী । নবজাতক শিশু কন্যাকে স্বহস্তে হত্যা করতে তারা দ্বিধা করতো না। মোট কথা মানুষের সমাজ হিংস্র বন্য পশুর সমাজে পরিণত হয়েছিল।[৪২] এমনই একটি জাহেলী সমাজে নবী (সা) গোটা মানব জাতির সার্বিক সংস্কারের জন্য বিপ্লবের ডাক দেন। যারা নবীর ডাকে সাড়া দিলেন তাঁদের চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-আচরণকে তিনি পরিশুদ্ধ করেন। আর যারা নবীর ডাকে সাড়া দিলেন না তারা সমাজে অনাচার-অত্যাচার সৃষ্টিকারী হিসেবে বিপ্লবীদের উপর অমানবিক নির্যাতন শুরু করে। এর কারণ ছিল জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টি ভঙ্গি ও বিশ্বাস ছিল ভিন্নতর। তারা জীবন বলতে মূলতঃ দুনিয়ার জীবনকেই বুঝাত। পরকালে তারা বিশ্বাসী ছিল না। বিধায় তাদের ব্যক্তি স্বার্থ কেন্দ্রীক চিন্তাধারা তাদেরকে নবীর ডাকে সাড়া দিতে বাঁধা দান করে।[৪৩] অপর দিকে সত্যপন্থীরা চরম প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তারা তাদের চরিত্র সুদৃঢ় ও মজবুত করতে থাকে এবং সত্যের পথে তারা অবিচল ও অটল থাকে। তাদের নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৪৪] 'তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা অতি সহজেই বেহেশতে যেতে পারবে? যতক্ষণ না তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় তোমাদের উপর পরীক্ষা এসেছে। তারা অত্যাচার নির্যাতন ও বিপদ মসিবতের শিকার হয়েছে এবং তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলা হয়েছে। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ ও তাঁর সংগী সাথী ঈমানদারগণ আর্তনাদ করে বলেছে, আল্লাহর মদদ কখন আসবে? তারপর তাদের শান্তনা দিয়ে বলা হয় আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে'? এভাবে দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইসলাম গ্রহণকারীদের চরিত্রবান হিসেবে একদল লোক তৈরী করতে সক্ষম হয়। কিন্তু বিরোধীতাকারীদের অত্যাচার নির্যাতনে জর্জরিত হয়ে অবশেষে মুসলমানদেরকে মক্কা থেকে মদিনায় হিযরত করতে হয়। সেখানে মহানবী (সা) তাদেরকে নিয়ে একটি নগর রাষ্ট্রের (City State) ভিত্তি স্থাপন করেন, যা পরবর্তী দশ বছরে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ন্যায় নীতির ভিত্তিতে মানুষের চিন্তাধারা ও মনমস্তিস্কে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেন, যা মানুষকে সকল প্রকার পাপাচার, অনাচার

---

৪২. আব্বাস আলী খান, *ইসলামী বিপ্লব একটি পরিপূর্ণ নৈতিক বিপ্লব*, পৃ: ৪-৫।

৪৩. তদেব, পৃ: ৮-৯।

৪৪. মূল আয়াতটি এই,

حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ اَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ.

দ্রঃ সূরা আল-বাকারাঃ ২: ২১৪।

থেকে দূরে রেখে খোদার ভয় ও আখেরাতে জবাবদিহির অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অভিলাষ তাঁদেরকে হাসি-মুখে ধন-সম্পদ ও জীবন বিলিয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করে।[৪৫] এধরণের নৈতিক বিপ্লবের ফলে মহানবী (সা) একটি মৃত জাতির মধ্যে নতুন জীবনের সঞ্চার করে। এ সম্পর্কে খান সাহেব বলেন, ঈমান গ্রহণ করার ফলে তাঁদের মধ্যে এমন অপরাজেয় শক্তি, অদম্য সাহস সৃষ্টি করেছিল যার ফলে তৎকালীন দুনিয়ার সর্ববৃহৎ ও শক্তিশালী দু'টি সাম্রাজ্য ইরান ও রোম তাদের করতলগত হয়। মানুষের মুক্তির জন্য তাঁরা দেশের পর দেশ জয় করেছেন কিন্তু বিজয়ীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ শুনা যায়নি। কারণ তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল খোদার সন্তুষ্টি অর্জন। তাঁরা বিভিন্ন যুদ্ধে অতুলনীয় বিরত্ব প্রদর্শণ করেছেন বটে কিন্তু আল্লাহর পথে জীবন দেয়াকে তাঁরা শাহাদাত মনে করতেন।[৪৬] সুতরাং যারা নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যাবতীয় কাজ কর্ম করেন, এমন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী বাহিনীর হাতে পরবর্তীতে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। তাঁরা মজলুম মানুষের হাহাকার আর্তনাদ চিরতরে বন্ধ করে সমাজে সুখ-শান্তি, জানমালের নিরাপত্তা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। অব্বাস আলী খান আরো উল্লেখ করেন, নৈতিক বিপ্লবের ফলে রক্তপিপাসু জাতি হয়েছিল জীবনদাতা, ব্যভিচারী হয়েছিল সতীত্বের প্রহরী, সমাজ বিরোধী হয়েছিল সমাজ সংস্কারক আর দুস্কৃতিকারী হয়েছিল ত্যাগী ও মানবতার সেবক। মাত্র ২৩ বছরের এ ধরণের নৈতিক বিপ্লব দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল।[৪৭] অতএব আমরা বলতে পারি, সারা বিশ্বে যে লুন্ঠন, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, স্বৈরাচার, যৌনাচার ও তজ্জনিত দুরারোগ্য "এইডস" ব্যাধি, মাদকাসক্তি ও চরম নৈতিক অবক্ষয় চলছে, এ অবস্থা থেকে মানবতাকে রক্ষা করতে হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মতাদর্শ ও কর্মপদ্ধতি অনুসারে একটা সার্বিক নৈতিক বিপ্লবের অতি প্রয়োজন। এ ছাড়া মানবতাকে রক্ষা করার বিকল্প কোন পথ নেই।

ছয়. একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ : তার থেকে বাঁচার উপায়

এটি আব্বাস আলী খানের লিখিত ইসলামী আন্দোলন সংক্রান্ত একটি মৌলিক গ্রন্থ। ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনকে মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে এ গ্রন্থটির ব্যাপক অবদান রয়েছে। বিশেষ করে একটি আদর্শবাদী দল কি কি কারণে অন্ধকারে নিমর্জিত হয় এবং এ থেকে বাঁচার উপায় গুলো কি হতে পারে তা তিনি এ গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য এটি দিক নির্দেশনা মূলক গ্রন্থ।

আদর্শবাদী দল

তিনি তার এ গ্রন্থে আদর্শবাদী দলের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা সমূলে উৎপাটন করে তার স্থলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে অন্য একটি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে যে কোন একটি আদর্শ বেছে নিতে হয়। এর সাথে পৃথক চিন্তাধারাও থাকে। এ চিন্তা ও আদর্শের সাথে যারা সকল দিক

---

৪৫. আব্বাস আলী খান, *ইসলামী বিপ্লব একটি পরিপূর্ণ নৈতিক বিপ্লব*, পৃ: ১৬-১৯।
৪৬. তদেব, পৃ: ১৮।
৪৭. তদেব, পৃ: ২২।

দিয়ে ঐক্যমত পোষন করে তারা একটি দল গঠন করে। একে বলা হয় একটি আদর্শবাদী দল।[৪৮] এ দল ইসলামী হতে পারে আবার ইসলাম বিরোধীও হতে পারে। এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় ইসলামী আদর্শবাদী দল। যে কোন আদর্শবাদী দলের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে মৌলিক কিছু গুণ[৪৯] থাকা অপরিহার্য। কিন্তু ইসলামী আদর্শবাদী দলের মধ্যে অতিরিক্ত কিছু গুণাবলী থাকা বাঞ্চনীয়। ইসলামী আদর্শবাদী দলের চরম ও পরম লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।[৫০] অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অভিলাষই হবে তাদের কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবৃন্দ। এ গ্রন্থে খান সাহেব জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশকে একটি আদর্শবাদী দল হিসেবে উল্লেখ করে এ দলের গঠনের প্রেক্ষাপট ও সূচনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অতঃপর এ দলের পতন হওয়ার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করে তা থেকে বাঁচার উপায়ের একটি ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন।

দল গঠনের প্রেক্ষাপট ও সূচনা

এ শিরোনামে তিনি উল্লেখ করেন, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ একটি ইসলামী আদর্শবাদী দল। এ দলের সূচনা হয়েছিল ১৯৪১ সালে অবিভক্ত ভারতে।[৫১] মাওলানা মওদূদী (র) 'তরজুমানুল কুর'আন'-এর মাধ্যমে একটি আদর্শবাদী দল গঠনের আহবান জানান। এ পত্রিকাটি পড়ে ড. 'আল্লামা ইকবাল[৫২] (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রীঃ) মাওলানার প্রতি গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েন। তিনি ১৯৩৭ সালে হায়দারাবাদ থেকে পাঞ্জাবে হিযরত করার জন্য মাওলানা মওদূদীকে আহবান করেন। ঠিক এ সময় জনৈক চৌধুরী নিয়ায আলী তাঁর ষাট-সত্তর একর জমি ইসলামের খেদমতের জন্য ওয়াক্ফ করেন। সেখানে বিভিন্ন ধরণের পাকা ঘর-বাড়ী তৈরী করে বিশেষ পরিকল্পনার অধিনে দ্বীনের বৃহত্তর খেদমতের অভিলাষী ছিলেন তিনি। এ ব্যাপারে চৌধুরী নিয়ায আল্লামা ইকবালের পরামর্শ চাইলে তিনি একমাত্র মাওলানা মওদূদীকেই এ

---

৪৮. আব্বাস আলী খান, *একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ: তার থেকেবাঁচার উপায়* (ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ, ৪র্থ প্রকাশ, ২০০৪ খ্রী:), পৃ: ৫।

৪৯. তারা প্রতিপক্ষের শত নির্যাতন নিস্পেষনে কিছুতেই দমিত হয় না। এ দলের নেতা কর্মীদের হতে হয় নির্ভিক, সাহসী ও ধৈর্য্যশীল। বিশেষ করে নেতাকে হতে হয় গতিশীল, দূরদর্শী, সমসাময়িক সকল সমস্যা সম্পর্কে পূর্ণ-সচেতন এবং চরম সংকট মূহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।
দ্র: আব্বাস আলী খান, *একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ: তার থেকেবাঁচার উপায়*, পৃ: ৫।

৫০. তদেব।

৫১. তদেব।

৫২. বিখ্যাত সর্বভারতীয় উর্দু কবি ও দার্শনীক । তিনি ১৮৭৭ সালের ৯ নভেম্বর অবিভক্ত পাঞ্জাবের শিয়ালকোর্ট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইকবাল প্রথমে পাঞ্জাবে, পরে কেম্ব্রিজ এবং পরিশেষে মিউনিখে আইন ও দর্শন শাস্ত্রে অধ্যয়ন করেন। মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তিনি ১৯০৮ সালে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁ গবেষণার বিষয় শিরোনাম ছিল "ডেভেলোপমেন্ট অব মেটাফিজিক্স ইন পারসিয়ান"। শিক্ষা জীবন শেষে তিনি লাহোর সরকারী কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৩২ সালে তিনি পাঞ্জাব আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি পাকিস্তানের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখেছেন। ইকবালের বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থের মধ্যে বাং-ই-দারা, বাল-ই-জিব্রিল, জবর-ই-কালিম,আসরার-ই-খুদী, দিন-তালিম, শিকোয়াহ ও জবাবে শেকোয়া উল্লেখ যোগ্য। স্যার ইকবাল ১৯৩৮ সালের ২১ এপ্রিল লহোরে ইন্তিকাল করেন।
দ্র: আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য, *শিশু বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০৬-২০৭।

কাজের জন্য যথাযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে মনে করেন। ড. ইকবালের অনুরোধে মাওলানা মওদূদী তাঁর সাথে বিস্তারিত আলোচনার পর তিনি একাজের দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে হায়দারাবাদ পরিত্যাগ করে ১৯৩৮ সালের ১৬ মার্চ পূর্ব-পাঞ্জাবের "পাঠানকোর্ট" নামক স্থানে হিযরত করেন। অতপর "দারুল ইসলাম" নামে সেখানে একটা ট্রাস্ট গঠন করে তিনি তাঁর মহান কাজের সূচনা করেন।[৫৩] "দারুল ইসলাম" ট্রাস্ট ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্যে দল গঠন করার পরিবেশ তৈরী, করে যার ফলশ্রুতিতে ১৯৪১ সালের আগষ্টে মাওলানার কথিত ৭৫ জন উম্মাদকে নিয়ে "জামায়াতে ইসলামী" প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে এ জামায়াতের উত্তরসূরী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।[৫৪] এ দলের পরিচয় দিতে গিয়ে মাওলানা মওদূদী (র) আরো বলেন, এ দলের সদস্যদেরকে ঈমানের দিক দিয়ে সুদৃঢ় ও অবিচল হতে হবে এবং আমলের দিক দিয়ে হতে হবে প্রশংসনীয় ও উচ্চমানের। কারণ তাদেরকে সভ্যতা সংস্কৃতির ভ্রান্ত ব্যবস্থা ও রাজনীতির বিরুদ্ধে কার্যত বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে এবং এ পথে আর্থিক কুরবানী থেকে শুরু করে কারাদণ্ড, এমনকি ফাঁসির ঝুকিও নিতে হতে পারে।[৫৫]

আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ

এ শিরোনামে আববাস আলী খান তাঁর এ গ্রন্থে দলের পতনের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, একটি আদর্শবাদী দলের উন্নতি, অগ্রগতি ও সাফল্যের পিছনে যেমন কতক গুলো কারণ থাকে, তেমনি এ ধরণের দলের বিকৃতি ও পতনেরও অবশ্যই কিছু কারণ রয়েছে। তিনি তার গ্রন্থে একটি আদর্শবাদী দলের পতনের নিম্নে লিখিত কারণগুলি উল্লেখ করেন।

১. দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ না করা। অর্থাৎ ইসলামী আন্দোলনের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তা যদি কেউ তার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ না করে বরং আবেগের বশীভূত হয়ে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করে এবং এ ধারণা থাকে যে, শুধু জামায়াত ভুক্ত হলেই নাযাত পাওয়া যাবে। এধরণের মানসিকতা সম্পন্ন লোকের সংখ্যা বেশী হলে জামায়াতের পতন ও বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী।[৫৬]

২. কুর'আন হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন না করা।

৩. সময় ও আর্থিক কুরবানীর প্রতি অবহেলা।

৪. দলীয় মূলনীতি মেনে না চলা।[৫৭]

---

৫৩. আব্বাস আলী খান, *একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ: তার থেকেবাঁচার উপায়*, পৃ: ৬।
৫৪. তদেব, পৃ: ৮।
৫৫. তদেব, পৃ: ৮।
৫৬. আব্বাস আলী খান, *একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ: তার থেকে বাঁচার উপায়*, পৃ: ১১।
৫৭. একটি আদর্শবাদী দলের অবশ্যই কিছু মূলনীতি থাকে, যা দলের সদস্যদেরকে অবশ্যই মেনে চলতে হয়। এ মূলনীতি লজ্ঘিত হলে দলের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যায় এবং তার বিকৃতি শুরু হয়ে যায়। সুতরাং দলের কোথাও এ মূলনীতি লজ্ঘিত হলে সংগে সংগে তা বন্ধ করতে হবে।
দ্র: আব্বাস আলী খান, *একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ: তার থেকে বাঁচার উপায়*, পৃ: ১২-১৩।

৫. পরস্পরের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা না করা।

৬. ভ্রাতৃত্ববোধের অভাব। অর্থাৎ একটি ইসলামী আদর্শবাদী দলের বৈশিষ্ট্য হলো দলের সদস্যগণ ইসলামের আলোকে গভীর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হবেন। কারণ এর অভাবে পারস্পারিক সম্পর্কের অবনতি ঘটলে দলের প্রাসাদ ভেঙ্গেঁ যায়।[৫৮]

৭. পারস্পারিক সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়াঃ নিম্নলিখিত কারণে এটা হয়ে থাকে যেমনঃ পারস্পারিক হিংসা বিদ্বেষ, গীবত ও পরনিন্দা, পরচর্চা, পরশ্রীকাতরতা, একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখা, কারো বিপদে-আপদে খোঁজ-খবর না নেয়া, পরস্পর বৈষয়িক স্বার্থে ঝগড়া-বিপদে লিপ্ত হওয়া এবং অযথা কারো প্রতি কু-ধারণা পোষন করা। এ ধরণের কারণে শুধু একটি দল নয় বরং মুসলিম জাতিসত্তার ভিত্তিও নড়বড়ে হয়ে যায়।[৫৯]

৮. ইসলামী দল তাঁর প্রকৃত পরিচয় হারিয়ে নিস্ত্রীয়ও প্রাণহীন হয়ে যাওয়া : নিম্ন লিখিত কারণে তা হয়ে থাকে। যেমন: কৃত শপথ পূরণ না করা, নিয়মিত দাওয়াতী কাজ না করা, মাসিক এয়ানাত নিয়মিত পরিশোধ না করা, জামায়াতে ইসলামীর ডাকে ব্যক্তিগত ও বৈষয়িক কাজ পরিহার করে নিদিষ্ট সময়ে যথাস্থানে হাজির না হওয়া এবং প্রতি মুহূর্তে খোদার ভয় ও আখেরাতের জবাবদিহির অনুভূতি মনের মধ্যে জাগ্রত না থাকা।[৬০]

৯. জনশক্তির মধ্যে নৈরাশ্য ও হতাশা সৃষ্টি হওয়া।[৬১]

১০. নেতৃত্বের অভিলাষ।[৬২]

১১. অর্থ-সম্পদের প্রতি লালসা।

১২. জীবন মান উন্নত করার প্রবনতা।

১৩. সহজ সরল জীবন যাপন না করা।

১৪. নেতৃত্বের দুর্বলতা।[৬৩]

---

৫৮. তদেব, পৃ: ১৩।

৫৯. তদেব, পৃ: ১৩-১৪

৬০. তদেব, পৃ: ১৪-১৫।

৬১. দলে জনশক্তির মধ্যে নৈরাশ্য ও হতাশা সৃষ্টি হলে তা বিকৃতি ও পতনের কারণ হয়। ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও পরিশুদ্ধ ইসলামী চিন্তার অভাবে এ হতাশা সৃষ্টি হয়।
দ্র: আব্বাস আলী খান, *একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ: তার থেকেবাঁচার উপায়*, পৃ: ১৫।

৬২. ইসলামী আন্দোলনে শরীক হওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। নেতৃত্বের অভিলাষ পোষন করে যোগদান করলে তা ব্যক্তি স্বার্থের জন্য হবে। ইসলামে তাই কোন প্রার্থী হওয়া নিষিদ্ধ। জামায়াতে অভ্যন্তরীন নির্বাচনে কেউ প্রার্থী হাতে পারে না। প্রার্থী হওয়ার প্রবনতা যদি কারও মধ্যে আকারে ইংগিতে পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তিনি নেতৃত্বের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবেন।
দ্র: আব্বাস আলী খান, *একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ: তার থেকেবাঁচার উপায়*, পৃ: ১৮।

৬৩. দুর্বল নেতৃত্বের কারণে একটি দলের পতন ত্বরান্বিত হয়। দুর্বল নেতৃত্ব একটি দলকে তার সঠিক মানের উপর স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম নয়। এ দুর্বলতার মধ্যে যেমন রয়েছে ইসলামী জ্ঞান ও নৈতিক চরিত্রের দুর্বলতা, ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা, সকলকে নিয়ে কাজ করার যোগ্যতার অভাব, যথা সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতা। এ ধরণের অপরিহার্য গুণাবলীর অভাবে তিনি দলকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হন।
দ্র: আব্বাস আলী খান, *একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ: তার থেকে বাঁচার উপায়*, পৃ: ৩১।

১৫. নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা আন্দোলনের পতন ডেকে আনে।

১৬. বায়তুল মালের আমানতদারীর অভাব এবং আর্থিক লেন-দেনে সততার অভাব।[৬৪]

তিনি আরা উল্লেখ করেন, ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলগণ এসব ক্ষেত্রে ইসলামের মডেল হিসেবে নিজদেরকে উপস্থাপন করতে না পারলে আন্দোলনের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় এবং দলের মধ্যে বিকৃতি দেখা দেয়। এ ধরণের বিকৃতির ছোবল থেকে ইসলামী দলকে নিম্ন লিখিত উপায়ে রক্ষা করা সম্ভব। যেমন:

১. **নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন:** তায়াল্লুক বিল্লাহ বা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন হলো ইসলামী আন্দোলনের প্রাণ। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের উপায় হলো তাঁকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করা, আর তাঁকে স্মরণ রাখার এবং সম্পর্ক গভীর করার সর্বোত্তম উপায় নামাজ।[৬৫]

২. **অতিরিক্ত যিকির[৬৬] আযকার করা**

৩. ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। কারণ আল্লাহর সুন্তুষ্টি লাভের প্রেরণা স্তিমিত হলে আন্দোলনের পতন ত্বরান্বিত হবে। সুতরাং আদর্শবাদী দলের কর্মীদের চরম লক্ষ্যই হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।[৬৭]

৪. **আত্মসমালোচনা:** আত্মসমালোচনা ও সামষ্টিক সমালোচনা একটি আদর্শবাদী দলকে বিকৃতি ও পতন থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। ইসলামের নীতি হলো অপরের সংশোধনের জন্য ভুল ধরিয়ে দেয়া।[৬৮]

৫. পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,[৬৯]

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

-'হে নবী! এটি আল্লাহর বড় অনুগ্রহ যে, তুমি এসব লোকের জন্য খুবই নম্র স্বভাবের হয়েছ। নতুবা তুমি যদি উগ্র স্বভাব ও পাষান হৃদয়ের অধিকারী হতে, তাহলে এসব লোক তোমার চারপাশ থেকে

---

৬৪. রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমানতদারীর অভাবকে ঈমানের অভাব বলে ঘোষণা করেছেন। আমানতের খেয়ানাতও সেই করতে পারে যে পার্থিব স্বার্থকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয়। একটি আদর্শবাদী দলের বায়তুলমালের দায়িত্ব যার থাকে তাকে আমানতদারী হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এদিক দিয়ে পূর্ণ নির্ভর যোগ্য হতে হবে। এর অভাবে দলের পতন অবশ্যম্ভাবী।
দ্র: আব্বাস আলী খান, *একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ: তার থেকেবাঁচার উপায়*, পৃ: ৩৭।

৬৫. তদেব পৃ: ২০

৬৬. যিকির 'আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ স্মরণ করা, মনে রাখা, উল্লেখ করা, বার বার স্মরণ করা ইত্যাদি। কিছু লোক আছেন যারা ইসলামের পাঁচ রুকনের সাথে কিছু যিকির আযকার করাকেই ইসলাম মনে করেন। এটা যেমন ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত তেমনি যিকির আযকার একেবারে পরিহার করাও সঠিক নয়। এ যিকির আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বাড়াতে সহায়ক হয়।
দ্র: আব্বাস আলী খান, *একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ: তার থেকেবাঁচার উপায়*, পৃ: ২৫-২৬।

৬৭. তদেব পৃ: ২৬ ।

৬৮. তদেব পৃ: ২৬।

৬৯. সূরা আল-ইমরান: ৩: ১৫৯।

দূরে সরে যেতো। অতএব তাদের দোষত্রুটি অপরাধ মাফ করে দাও। তাদের মাগফিরাতের দোয়া কর এবং দ্বীনি আন্দোলনের কাজ কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর'।

৬. **মৌলিক বিষয়ে ঐক্যমত পোষন করা :** ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দ আদর্শিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে এমন স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, সেখানে মৌলিক বিষয়ে মতানৈক্যের কারণ নেই। কারণ এখানে ব্যক্তি স্বার্থের কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না।[৭০]

৭. বিরোধী পরিবেশ পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া।[৭১]

৮.সমস্যার ত্বরিত ও সঠিক সমাধান।[৭২]

৯.ত্যাগ **ও কুরবানী করা:** জান-মাল, শ্রম, মেধা, যোগ্যতা, সময়-এর সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে একটি ইসলামী আদর্শবাদী দলকে পতনের কবল থেকে রক্ষা করে সঠিক পথে পরিচালিত করা সম্ভব।

১০. **দাওয়াত ও তাবলীগ :** একটি ইসলামী দলের সর্বপ্রথম কাজ হলো মানুষের সামনে ইসলামের দাওয়াত পরিবেশন করা। কারণ ইসলামী দলের দাওয়াতী কাজ বন্ধ হয়ে গেলে তা একটা প্রাণহীন ও অর্থহীন সংগঠনে পরিণত হয়।[৭৩]

১১. **তরবিয়তী নিজাম :** দাওয়াত প্রদানকারীর মধ্যে যে সব যোগ্যতা ও গুণাবলী অপরিহার্য তা একমাত্র তরবিয়তী নিজাম বা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে এ ধরণের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।[৭৪]

এ প্রবন্ধে যা কিছু বলা হয়েছে তা একটি আদর্শবাদী ইসলামী আন্দোলনকে তার সম্ভাব্য বিকৃতি ও পতন থেকে রক্ষা করার জন্য খান সাহেবের কিছু পরামর্শ। অতীতে যে সব কারণে এধরণের দলের পতন হয়েছে তার অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি উপরিক্ত পরামর্শ গুলো তুলে ধরেছেন। যাতে করে একটি আদর্শবাদী দলের অনুসারীগণ সতর্ক হতে পারে এবং দিক নির্দেশনা খুজে পায়।

সাত. ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব

এটি আব্বাস আলী খানের রচিত ইসলাম সংক্রান্ত অপর একটি মৌলিক গ্রন্থ। বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য এ গ্রন্থটি ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছে। ইসলামকে জানার পাশাপাশি

---

৭০. আব্বাস আলী খান, *একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ: তার থেকে বাঁচার উপায়,* পৃ: ২৮।

৭১. ইসলাম বিরোধী পরিবেশ পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হলে আদর্শবাদী দলের বিকৃতি শুরু হয়। সুতরাং নিজেদের ইসলামের বৈশিষ্ট্যে প্রভাবিত করা, প্রভাবিত হওয়া নয়, স্রোতে ভেসে যাওয়া নয় বরং আপন স্থানে অবিচল থেকে স্রোতের বিপরীত দিকে চলার চেষ্টা করা, অন্যথায় পতন হওয়া স্বাভাবিক।
দ্রঃ আব্বাস আলী খান, *একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ: তার থেকেবাঁচার উপায়,* পৃ: ২৯।

৭২. দলের বিকৃতি ও পতনের আর একটি অন্যতম প্রধান কারণ হলো সংগঠনের মধ্যে কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে তা সংগে সংগে তার সমাধান না করা। ফলে কর্মীদের মধ্যে সৃষ্ট মতবিরোধ পরবর্তীতে জামায়াত দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এ ধরণের সমস্যার ত্বরিত সমাধান হওয়া দরকার।
দ্রঃ আব্বাস আলী খান, *একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ: তার থেকে বাঁচার উপায়,* পৃ: ৩৪।

৭৩. তদেব, পৃ: ৩৮

৭৪. তদেব, পৃ: ৩৯

জাহেলিয়াত সম্পর্কে অবহিত না হলে ইসলামের প্রকৃত রূপ মানুষের সামনে তুলে ধরা সম্ভব নয়। এ অনুভূতি থেকেই খান সাহেব ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত সুনিপূণ ভাবে অতীত ও বর্তমান কালে ইসলামের সাথে জাহেলিয়াতের যে সংঘাত চলছে তার একটা চিত্র তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য যারা আন্দোলন করছে তাদের জন্য করণীয় বিষয়ের প্রতি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস, গ্রন্থটি ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের জন্য মূল্যবান পাথেয় হিসেবে বিবেচিত হবে। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ৩য় বারের মতো বইটি প্রকাশ করে। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬০। এ পর্যায় আমরা গ্রন্থটির মূল আলোচ্য বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে চাই।

ইসলাম ও জাহেলিয়াত

এ শিরোনামে গ্রন্থের প্রারম্ভেই খান সাহেব ইসলাম ও জাহেলিয়াতের পরিচয়, উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক বা পার্থক্য প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপন করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেন, জাহেলিয়াত শব্দটি ইসলামের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইসলাম ও জাহেলিয়াত মূলত: দু'টি পরস্পর বিপরীত মুখী মতবাদ এবং উভয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্নতর। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ ও সংঘাত স্বাভাবিক ও অনিবার্য।[৭৫] মানব সৃষ্টির সুচনা লগ্ন থেকেই এ দ্বন্দ্ব চলে আসছে এবং পৃথিবীতে যতদিন মানবজাতির অস্তিত্ব থাকবে, ততোদিন এ সংঘাত, সংঘর্ষ অব্যাহত থাকবে। এ দু'টি মতবাদের মধ্যে একটি ভাল অন্যটি মন্দ। একটি সত্য ও ন্যায়, অন্যটি মিথ্যা ও অন্যায়। একটি কল্যাণকর অন্যটি অকল্যাণকর, একটি আলো অন্যটি অন্ধকার, একটি সৃজনশীল, অন্যটি ধ্বংশীল। একটি বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার মনোনীত পথ, অন্যটি তাঁর নিষিদ্ধ পথ। এদু'টি মতবাদের প্রথমটি হলো ইসলাম দ্বিতীয়টি হলো জাহেলিয়াত।[৭৬] আর যা ইসলাম তা জাহেলিয়াত নয় এবং যা জাহেলিয়াত তা ইসলাম নয়। সুতরাং খান সাহেব আরো বলেন, ইসলাম হলো জ্ঞান ভিত্তিক, যা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা শিক্ষা দিয়েছেন। পক্ষান্তরে জাহেলিয়াত বলতে বুঝায় যা ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা, শিষ্টাচার ও ইসলামী মন মানসিকতার পরিপন্থী।[৭৭] অতএব সত্য ও মিথ্যা পরস্পর বিরোধী শক্তি। তিনি আরো উল্লেখ করেন, ঈমান ও কুফুর যেমন বিপরীত মুখী, ইসলাম ও জাহেলিয়াত তেমনি বিপরীত মুখী। ইসলাম হলো আল্লাহর দেখান পথ এবং জীবনের এক কল্যাণময় কর্মসূচী। মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও স্বভাব-প্রকৃতির সাথে এটা সংগতিশীল। অপর দিকে কুফুরের অন্ধকার, আন্দাজ-অনুমান ও অলীক কল্পনা থেকে জাহেলিয়াত উৎসারিত। অতএব ইসলাম সত্য ও সুন্দর পক্ষান্তরে জাহেলিয়াত মিথ্যা ও কুৎসিৎ।[৭৮] মানুষকে আল্লাহ

৭৫. আব্বাস আলী খান, *ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৩ খ্রী:), পৃ: ৫।
৭৬. তদেব।
৭৭. তদেব।
৭৮. তদেব, পৃ: ১০

তা'আলা জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেক দান করেছেন, যার কারণে মানুষ শ্রেষ্ঠজীব হিসেবে পরিচিত। এ বিশেষ গুনটি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করেছে।

তাই মানুষ প্রতিটি কাজের জন্য সে নিজে দায়ী। জ্ঞান-বুদ্ধি তার মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে যাকে জ্ঞান বুদ্ধি দান করা হয়নি, তার জন্য এ নীতি প্রযোজ্য নয়। কিন্তু মানুষকে এ জ্ঞান বুদ্ধি দান করে মহান মর্যাদার অধিকারী করা হলেও সে জ্ঞানের সদ্ব্যব্যবহার করে না। শুধু জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক থাকাই যথেষ্ট নয় বরং তার সদ্ব্যবহারই মানুষের প্রকৃত কাজ। এ ব্যাপারে আব্বাস আলী খান দৃষ্টান্তউল্লেখ করতে গিয়ে পরাশক্তি দু'টি দেশের মানুষ তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেকের সদ্ব্যব্যবহার করতে যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন সে সম্পর্কে বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় পরাশক্তি দু'টি দেশ শীর্ষ স্থান অধীকার করলেও আপন সমাজে তারা নৈতিক অধ:পতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। এ পর্যায়ে ১৯৮৮ সালের ২৭ জুনের "নিউজ ইউকে" প্রকাশিত একটি খবর থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের চরম নৈতিক অবক্ষয় সম্পর্কে একটি চিত্র উপস্থাপন করেছেন। খবরে বলা হয়েছে ৭ মিলিয়ন লোকের শহর লন্ডনে গত বছর (১৯৮৭) ১৯৪ টি হত্যাকান্ড এবং ২২৬২৮ টি ভয়ানক হিংসাত্মক অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। অপর দিকে নিউইয়ার্ক শহরে ১৬৭২ টি হত্যাকান্ড এবং ১,৪৮,৩১৩টি হিংসাত্মক অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।[৭৯] এ খবরটি উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ দু'টি উদাহরণ থেকে বুঝা যায় যে, সকল মানুষ তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেকের সদ্ব্যবহার করতে পারে না। কারণ তার জ্ঞান ও চিন্তার জগত অতি ক্ষুদ্র ও সীমিত। চিন্তার এক পর্যায় তার গতিপথ রুদ্ধ হয়ে যায়। মানব জাতির অনেক চিন্তানায়ক সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে নতুন নতুন দর্শন ও মতবাদ আবিষ্কার করেছে, যা মানুষের জীবনে কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর পক্ষ থেকে নবীগণের মাধ্যমে নির্ভুল অহির জ্ঞান পরিবেশন করেছেন। নবীগণ অহির জ্ঞান মানুষের মধ্যে ব্যাখ্যাসহ পরিবেশন করে স্বয়ং তাঁর বাস্তব জীবন দিয়ে সে জ্ঞান কার্যকর করে দেখিয়েছেন।[৮০] মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শণ, মানবীয় চরিত্র গঠন এবং তাদের জীবনকে সুন্দর ও সুখী করার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য রাসূলগণ এ মাটির পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন।

নবীগণের দাওয়াত ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ

এ শিরোনামে তিনি ইসলাম ও জাহেলিয়াতকে সত্য ও মিথ্যা এবং আলো ও অন্ধকারের সাথে তুলনা করে নবীগণের দাওয়াত তথা ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব সংঘাত-এর কিছু বিবরণ উপস্থাপন করে বলেন, আলো ও অন্ধকার যেমন এক মুহূর্তের জন্যও সহাবস্থান সম্ভব নয়, তেমনি ইসলাম ও জাহেলিয়াতের সহাবস্থান কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই যুগে যুগে যখন নবীগণের মাধ্যমে মানুষের নিকট ইসলামের দাওয়াত এসেছে, তখন জাহেলিয়াত তাকে বরদাশ্ত করতে পারেনি। তাই মানব জাতির সমগ্র ইতিহাসই ইসলাম ও

৭৯. তদেব, পৃ: ১২
৮০. তদেব, পৃ: ১৫-১৬

জাহেলিয়াতের তথা সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম।[৮১] আল্লাহর নবীগণই অন্ধকারে নিমজ্জিত মানব জাতির জন্য সঠিক পথের আলোকবর্তিকা নিয়ে আসেন। সেজন্য জাহেলিয়াত তাদের পথে চরম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে নবীগণ তাদের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত হন এবং অনেকে প্রাণ হারান।[৮২]

এ পর্যায়ে তিনি কয়েক গন নবীর দাওয়াত পেশ ও জাহেলিয়াতের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। প্রথমে তিনি হযরত নূহ (আ) এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন।

হযরত নূহ (আ)

হযরত নূহ (আ) তাঁর জাতিকে সম্বোধন করে বলেন, সে (নূহ) বলল, হে আমার জাতির লোকেরা! আমি তোমাদের জন্য পরিষ্কার ভাষায় সাবধানকারী। আল্লাহর বন্দেগী কর ও তাঁকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদের গুনাহ খাতা মাফ করে দিবেন এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখবেন।[৮৩] জবাবে তারা নূহকে (আ) বলেন, আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি।[৮৪] এক পর্যায়ে তারা নূহ (আ)-কে ভয়ানক ভাবে শাসিয়ে বলেন, হে নূহ! তুমি যদি এসব কাজ থেকে বিরত না হও, তাহলে আমরা তোমাকে পাথর মেরে খতম করবো।[৮৫] অতপর নূহ (আ) এবং তাঁর মুষ্টিমেয় অনুসারীদের উপর নির্যাতন শুরু হয়ে যায়। অবশেষে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ সংঘর্ষ এমন এক পর্যায় পৌঁছে যখন নূহ (আ) খোদার আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। নূহ (আ) আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে বলেন, হে আমার খোদা! এ কাফিরদের মধ্য থেকে এ জমিনে বসবাসকারী একজনকেও ছেড়ে দিও না। তুমি যদি এদেরকে ছেড়ে দাও তাহলে এরা তোমার বান্দাহদেরকে গুমরাহ করে দেবে।[৮৬] আল্লাহ তা'আলা তার নির্যাতিত প্রিয় নবীর দোয়া কবুল করেন এবং ভয়ানক বন্যা দিয়ে গোটা জাতিকে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দেন।

হযরত হুদ (আ)

এরপর তিনি হযরত হুদ (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, নূহ (আ)-এর পরবর্তী প্রভাবশালী ও শক্তিধর জাতি ছিল আদ জাতি। এ আদ জাতিকে হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা হুদ (আ)-কে

---

৮১. তদেব, পৃ: ১৮

৮২. তদেব।

৮৩. মূল আয়াতটির এই,

قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِي ۔ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.

দ্রঃ সূরা নূহ: ৭১: ২-৪।

৮৪. মুল আয়াতটি এই, قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

দ্র:সূরা আল-আ'রাফ: ৭:৬০।

৮৫. মুল আয়াতটি এই, قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَانُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ

দ্রঃ সূরা আশ-শু'আরা: ২৬ : ১১৬।

৮৬. মুল আয়াতটি এই, وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ

দ্র:সূরা নূহ: ৭১: ২৬-২৭।

প্রেরণ করেন। তারা জাহেলিয়াতের কালো অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। হুদ (আ) তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করায় উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত এর সূচনা হয়। নূহ (আ)-এর জাতির মত আদ জাতিও নবীর দাওয়াত প্রত্যাখান করে। তারা হুদ (আ) কে বলেন, তুমি কি আমাদের নিকট এজন্যে এসেছো যে, আমরা এক খোদার বন্দেগী করবো এবং ঐ সব খোদাকে পরিহার করব, যাদের বন্দেগী আমাদের বাপ-দাদা করে এসেছে?[৮৭] এক পর্যায়ে তারা আল্লহর নবী যে, সত্য নবী তা প্রমান করার দাবী জানিয়ে বলেন, আচছা ঠিক আছে, তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তুমি আমাদের যে আযাবের হুমকি দিচছ তা নিয়ে এস।[৮৮] বার বার তাদের এ দাবী করাতে তাদের ভাগ্যে তাই ঘটলো। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আদকে ধ্বংস করা হয়েছে এক প্রচন্ড সাইক্লোন বা ঘূর্ণিবাতাস দিয়ে। আল্লাহ্ তাদের উপর তা ক্রমাগত সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত চাপিয়ে রাখেন। তুমি দেখতে পেতে তারা সেখানে এমন ভাবে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। যেমন: পুরাতন শুকনো খেজুর গাছের কান্ড সমূহ পড়ে থাকে।[৮৯] এভাবে দুনিয়ার বুক থেকে আদ জাতির অস্তিত্ত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়।

হযরত সালেহ্ (আ) এর ঘটনা

আরবের প্রাচীনতম জাতি সমূহের মধ্যে সামুদ জাতি দ্বিতীয়। আদ জাতির ধ্বংসের পর তাদের মধ্যে যারা বেচেঁ ছিলেন তারা হযরত হুদ (আ)-এর শিক্ষা-দিক্ষা অনুযায়ী জীবন-যাপন করতেন। কিন্তু কিছু কাল পরে তারা জাহেলিয়াতের খপ্পরে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সালেহ (আ)-কে প্রেরণ করেন। হযরত সালেহ (আ) অন্যান্য নবী রাসূলগণের ন্যায় তাদের সামনে মৌলিক দাওয়াত পেশ করেন। সে (সালেহ) বলল, হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা একমাত্র আল্লহর বন্দেগী কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহা নেই।[৯০] এ দা'ওয়াত পেশ করার পর হযরত সালেহ্ (আ) তাঁর জাতির নিকট ঘৃনার পাত্রে পরিণত হলেন। এবং তার দা'ওয়াতের জবাবে তারা বলেন, হে সালেহ! গতকাল পর্যন্ত তোমার উপর আমরা বড়ই আশা-পোষন করেছিলাম। কিন্তু আজ তুমি আমাদেরকে ঐ সব মাবুদদের পুজা-উপাসনা করতে নিষেধ করছ, যা তাদেরকে আমাদের পূর্ব

---

৮৭. মুল আয়াতটি এই, قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا
দ্রঃ সূরা আল-আ'রাফ: ৭: ৭০।

৮৮. মুল আয়াতটি এই, فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
দ্রঃসূরা আহ্কাফ: ৪৬: ২২

৮৯. মুল আয়াতটি এই, وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝
দ্রঃ সূরা আল-হাক্কাহ: ৬৯: ৬-৮।

৯০. মুল আয়াতটি এই, وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
দ্রঃ সূরা আল-আ'রাফ: ৭: ৭৩।

পুরুষরা পুজা করত।[৯১] এভাবে তারা সালেহ (আ)-এর দা'ওয়াতকে প্রত্যাখান করল। অবশেষে তারা ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা সে উটনীকে মেরে ফেল্লো এবং পূর্ণ ঔদ্বত্য সহকারে তাদের রবের আদেশ লংঘন করলো। তারপর তারা সালেহ (আ)-কে বলল, নিয়ে এস তোমার আযাব যার হুমকি তুমি দিচ্ছ। সত্যিই যদি তুমি নবীগণের একজন হও। অবশেষে প্রলয়ংকারী বিপদ তাদেরকে গ্রাস করলো এবং তারা আপন বাড়ীতে উপুড় হয়ে পড়ে মরে রইলো।[৯২]

হযরত লূত (আ) এর ঘটনা

হযরত সালেহ (আ) এরপর আরও কতিপয় নবীর আগমন হয় এবং তাদের প্রত্যেকের দা'ওয়াতকে তারা প্রত্যাখান করে। অবশেষে হযরত লূত (আ)-এর আগমন হয়। তিনিও পূর্ববর্তী নবীগণের ন্যায় ঠাট্টা, বিদ্রুপ ও বাঁধার সম্মুখীন হন। তার সময় সমাজে ব্যাপক ভাবে সমকামিতা প্রচলিত ছিল।[৯৩] হযরত লূত (আ) শির্ক-কুফুর খণ্ডনের সাথে সাথে তাদের এ ঘৃন্য রুচিবোধেরও তীব্র সামালোচনা করেন। সে তার জাতির লোকদের বলল, তোমরা কি এতোটা নির্লজ্জ হয়ে গিয়েছ যে, তোমরা এমন সব নির্লজ্জ কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে দুনিয়ায় আর কেউ করেনি। তোমরা নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষের দ্বারা তোমাদের যৌন লালসা চরিতার্থ কর। তোমরা আসলে একেবারেই সীমালংঘনকারী।[৯৪] এ ধরণের জাহেলিয়াতের ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও মতবাদ হতভাগা জাতিকে সত্যের আলো থেকে এতোটা দূরে নিক্ষেপ করেছিল যে, তাওহীদের দাওয়াতে তারা সাড়া না দিয়ে বরং সত্যের আহবানকারীকে তারা তাদের জীবনের শত্রু মনে করলো। তখন আল্লাহ তা'আলা তার শাশ্বত নীতি অনুযায়ী তাদেরকে পাকড়াও করলেন এবং তাদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা বলল, আমরা এক অপরাধী জাতির প্রতি প্রেরীত হয়েছি, যেন তাদের উপর পাকা মাটির পাথর বর্ষণ করি যা তোমার খোদার সীমালংঘনকারী লোকদের জন্য চিহ্নিত আছে'।[৯৫]

হযরত শু'আইব (আ)

মাদইয়ান বাসীদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত শু'আইব (আ)-কে প্রেরণ করেন। এ জাতির পেশা ছিল ব্যবসা। কিন্তু তারা ব্যবসায়ে ছিল অত্যন্ত দুর্নীতি পরায়ন। শিরক কুফুরেও তারা ছিল

---

৯১. মুল আয়াতটি এই, قَالُوا يَاصَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا
দ্রঃ সূরা হুদঃ ১১ :৬২।

৯২. মুল আয়াতটি এই, فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَاصَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
দ্রঃ সূরা আল-আ'রাফঃ৭৭-৭৮।

৯৩. আব্বাস আলী খান, *ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব*, পৃঃ২৭।

৯৪. মুল আয়াতটি এই, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ۔
দ্রঃ সূরা আল-আ'রাফঃ ৭ : ৮০-৮২।

৯৫. মুল আয়াতটি এই, قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ۔ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ۔ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ.
দ্রঃ সূরা আয্-যারিয়াঃ ৫১: ৩২-৩৪।

নিমজ্জিত। এদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান জানিয়ে শু'আইব (আ) বলেন, সে বললো! হে আমার জাতির লোকেরা! আল্লহর দাসত্ব আনুগত্য কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কেউ খোদা নেই। আর ওজন ও মাপ-জোকে কম করো না। আজ তোমাদেরকে আমি ভাল অবস্থায় দেখছি। কিন্তু আমার ভয় হয়, কাল তোমাদের উপর এমন দিন আসবে যার আযাব তোমাদের সকলকে ঘিরে ফিলবে।[৯৬] এর জবাবে তার জাতির লোকেরা বলেন, হে শু'আইব! তোমার এ নামায কি হুকুম দিচ্ছে যে, আমরা ঐসব খোদা পরিত্যাগ করব আমাদের পূর্ব-পুরুষ যাদের পুজা করত।[৯৭] এ ভাবে মাদইয়ানবাসী শুধু নবীর দাওয়াতকে অস্বীকারই করেনি, তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কারের ধমকও দিয়েছে। এভাবে যখন তাদের সৎপথে ফিরে আসার আর কোন সম্ভবনাই রইলো না তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন।

হযরত মূসা (আ) এর ঘটনা

ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। এরই ধারাবাহিকাতায় এক সময় মিশর ভুখণ্ডে আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত ইউসুফ (আ)-এর তিরোধানের কয়েকশ বছর পর কিবতী জাতি উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করে এবং ফিরাউনী শাসন কায়েম হয়। এ সময় গোটা জাতি জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। বনী ইসরাইলদের প্রতি তারা চরম নির্যাতন নিস্পেষণ শুরু করে। কিবতীদের ভ্রান্ত সভ্যতা সংস্কৃতির প্রভাবে বনী ইসরাইলগণও বিকৃতির শিকার হয়। তাদেরকে সংস্কার সংশোধন ও পথ নির্দেশনা এবং ফিরাউনী অপশাসনের হাত থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ)-কে সেদেশে প্রেরণ করা হয়।[৯৮] এবং আল্লাহর পক্ষ থেকেও নির্দেশ প্রদান করা হয় যে, ফিরাউনের কাছে যাও সে বিদ্রোহী হয়েছে।[৯৯] হযরত মূসা (আ) তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছান। মূসার দাওয়াতের জবাবে খোদাদ্রোহীদের মতই তারা বলেছিল, এসব কথা তো আমাদের বাপ দাদার আমলে কখনই শুনিনি।[১০০] ফিরাউন মূসার অনুসারীদের প্রতি নির্যাতন নিস্পেষণ শুরু করে এবং এক পর্যায়ে তারা মূসাকে হত্যা করার সকল প্রস্তুতি

---

৯৬. মুল আয়াতটি এই,

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ.

দ্রঃ সূরা হুদ: ১১: ৮৪।

৯৭. মুল আয়াতটি এই, قَالُوا يَاشُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

দ্রঃ সূরা হুদ: ১১: ৮৭।

৯৮. আব্বাস আলী খান, *ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন* দ্বন্দ্ব, পৃ: ৩৫।

৯৯. মুল আয়াতটি এই, اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى

দ্রঃ সূরা আন্-নাযিয়াত: ৭৯: ১৭।

১০০. মুল আয়াতটি এই, وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ

দ্রঃ সূরা কাসাস: ২৮: ৩৬।

গ্রহণ করলে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সমগ্র ইসলামী জনশক্তি নিয়ে মিশর ত্যাগ করার জন্য তাঁর প্রতি নির্দেশ দেয়া হল। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে লোহিত সাগরের উপর তাঁর অলৌকিক লাঠি দ্বারা আঘাত করা মাত্র এপার-ওপার একটি সুন্দর ও শুকনো রাজপথ তৈরী হয়ে যায়। গোটা ইসলামী জনশক্তি নিরাপদে সমুদ্র পার হয়ে যায়।[১০১] অতপর ফিরাউন তার বিরাট বাহিনীসহ রাজপথ দিয়ে চলা শুরু করলে হঠাৎ সমুদ্র তার স্বাভাবিক রূপ ধারণ করে এবং সমগ্র বাহিনী সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ হারায়।[১০২] উপরিক্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষই অব্যাহত ভাবে চলে আসছে। ইসলাম বিরোধী শক্তির হাতে সত্যের পতাকাবাহীগণ নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হয়েছে বটে, কিন্তু অবশেষে বাতিল শক্তিই ধ্বংস হয়েছে।

বিশ্বনবীর আগমন

ইসলাম ও জাহেলিয়তের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের এক পর্যায়ে ৭ম শতাব্দির প্রারম্ভে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে মক্কা শহরে আবির্ভূত হন হযরত মোহাম্মদ (সা)। এসময় বিশ্ব ছিল জাহেলিয়াতের ঘন-অন্ধকারে নিমজ্জিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জন্য সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রেরণ করেন এবং সর্বশেষ হেদায়েত নামা পাঠান। তিনি মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন আল-ইসলাম মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করেন।[১০৩] তিনি যুক্তি, প্রমান, ঐতিহাসিক সাক্ষ্য ও বিভিন্ন নিদর্শনসহ হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ইসলামের দাওয়াত আরব জাতির নিকট পেশ করেন। কিন্তু অতীতের ন্যায় আরব জাতিও এ দা'ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে। এর কারণ হিসেবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদের তো মন আছে, কিন্তু তা দিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না। চোখ আছে বটে কিন্তু তা দিয়ে দেখে না। তাদের কান আছে, তা দিয়ে শুনে না। তারা পশুর ন্যায় বরং তার চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত। তারা চরম গাফলতির মধ্যে ডুবে আছে।[১০৪] তাদের এ ধরণের মানসিকতার চিত্র উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, যারা খোদার পথে চলতে অস্বীকার করেছে তাদের অবস্থা এরূপ, রাখাল জন্তুগুলিকে ডাকে কিন্তু তারা এ ডাকের আওয়াজ ব্যতীত আর কিছু শুনতে পায় না। তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। এ জন্যে কোন কথা বুঝতে পারে না।[১০৫] এ আয়াতের মর্ম হলো যে, তারা মৃত্যুকে গ্রহণ করতেই চায় না। তাদের হৃদয়ের

---

১০১. আব্বাস আলী খান, *ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব*, পৃ: ৪০।
১০২. তদেব।
১০৩. তদেব, পৃ: ৪১।
১০৪. মূল আয়াতটি এই, لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون
দ্র: সূরা আল-আ'রাফ: ৭: ১৭৯।
১০৫. মূল আয়াতটি এই, ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون
দ্র: সূরা আল-বাকারা: ২ : ১৭১।

প্রবেশ পথ তালা বন্ধ থাকে। তারপর তাদের আর ভাল মন্দ বুঝবার শক্তিই থাকে না। আর এটাই হলো হৃদয়ের অন্ধত্বতা। এর কারণ হলো তাদের জাতীয় ও পারিবারিক গোড়ামী। তারা মনে করত ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতিনীতি ও রসম-রেওয়াজ তাদের পূর্ব-পুরুষ থেকে যা চলে আসছে তাই সঠিক। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নতুন দ্বীনের দাওয়াত যদি আমরা প্রত্যাখ্যান করতে পারি তা হবে আমাদের সৌভাগ্যের কারণ।[১০৬] আল্লহ্ তা'আলা বলেন, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে একটা রীতিনীতির অনুসারী পেয়েছি। আর আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি।[১০৭] এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) নবুওয়াতের ঘোষণা দিলেন। এ ঘোষণা মক্কার কাফির মুশরিকদের কাছে এক চরম বিস্ময় বলে মনে হল। তাদের দৃষ্টিতে এ মানুষটি ছিলেন সমাজের সবচেয়ে ভাল মানুষ, সত্যবাদী, পরম বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য এবং অতুলনীয় চরিত্রের অধিকারী, তাঁর মুখে এমন অবাস্তব ও অবান্তর কথা কেন ? তাদের কথা আমাদের সর্বজনপ্রিয়, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত লোকটির মুখে যখন এ ধরণের অবান্তর কথা শুনা যাচ্ছে তখন নিশ্চয় তাঁর মস্তিস্ক বিকৃত হয়েছে অথবা জিনে ধরেছে।[১০৮] এভাবে নবী মোহাম্মদ (সা) এর বিরুদ্ধে মানুষের মনকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলার এক অভিযান শুরু হয়। এ ভাবে জাহেলিয়াতের পতাকাবাহীরা ঠাট্রা-বিদ্রুপ উপহাস সহকারে ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে। তারপর নবীর বিরোধীতা শুরু করে এবং তা ক্রমশ নির্যাতন, নিস্পেষণের রূপ গ্রহণ করে। কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার উপর মুছিবতের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ত। কিন্তু তাদের শত বিরোধীতা ও অত্যাচার নির্যাতন সত্ত্বেও মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমশ: বৃদ্ধিই পাচ্ছিল।[১০৯] এর প্রধান কারণ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ আল্লাহর বাণী আল-কুর'আন। কুর'আনের প্রতিটি কথা অতীব সত্য ও অকাট্য যুক্তিপূর্ণ। সত্যের একটা আলাদা স্বাধ থাকে, যা সত্যানুসন্ধানীদেরকে সহজেই আকৃষ্ট ও বিমোহিত করে। তাই যারা মনোযোগ সহকারে কুর'আন শ্রবণ করে ও চিন্তা ভাবনা করে তাদের মনের দুনিয়ায় এক বিপ্লব ঘটে যায় এবং কুর'আনের আহবানে স্বত:স্ফুর্ত ভাবে সাড়া দেয়। ইসলামের দুশমনরা যখন উপলব্ধি করলো যে, সমাজের সর্বোত্তম ও সকলের শ্রদ্ধাভাজন এক ব্যক্তির মুখে মানুষ এমন সব কথা শুনছে যার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা পূর্ব-পুরুষদের ধর্মত্যাগ করছে, তখন তারা দিশেহারা হয়ে কুর'আনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। তারপর তারা কুর'আন শ্রবণের বিরুদ্ধে এক নিষেধাজ্ঞা জারী করে।[১১০] তাদের সম্পর্কে কুর'আনে উল্লেখ করা হয়েছে, সত্যের

---

১০৬. আব্বাস আলী খান, *ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব*, পৃ: ৪৩।

১০৭. মুল আয়াতটি এই, وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون
দ্র: সূরা যুখরুফ: ৪৩: ২৩।

১০৮. আব্বাস আলী খান, *ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব*, পৃ: ৪৬।

১০৯. তদেব, পৃ: ৪৭।

১১০. তদেব, পৃ:৪৮।

অমান্যকারীরা বলে, কুর'আন কখনো শুনবে না। তখন তোমরা হৈহুল্লা করবে। তাহলে তোমরা এ কাজে জয়ী হবে।[১১১] এ সব সত্য অস্বীকারকারী জাহান্নামে চিরদিন বসবাস করবে। জাহান্নামে পৌঁছানর পর তারা বলবে, হে আমাদের রব! সেই জিন ও মানুষগুলোকে আমাদের একটু দেখিয়ে দাও। যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। আমরা তাদেকে পায়ের তলায় নিস্পেষিত করব। যেন তারা ভালোমত লজ্জিত ও অপমানিত হয়।[১১২]

তিনি উপরোক্ত ঘটনা সমুহ বর্ণনার পর মন্তব্য করে বলেন, প্রাচীন জাহেলিয়াতের ধারক বাহকদের ন্যায় বর্তমান আধুনিক জাহেলিয়াতের ধারক বাহকরাও কুর'আনকে মোটেই ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। এমনকি মুসলিম নামধারী মেকিমুসলমানরাও কাফিরদের অনুসরণে কুর'আন প্রচার প্রসার বন্ধ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাদের পক্ষে কুর'আনের প্রচার ও প্রসার বন্ধ করা অথবা তাকে সামন্যতম বিকৃত করা তাদের কারো পক্ষে সম্ভব নয়।[১১৩]

জাহেলিয়াতের মুকাবিলায় অবিচল থাকার উপায়

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ও সাহাবাকেরামগণ জাহেলিয়াতের মুকাবিলায় ইসলামের পথে অবিচল থাকার যেসব উপায় পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তার আলোকে অতিগুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় আব্বাস আলী খান এ অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন।

১. **প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা :** প্রতিটি কাজের জন্য আখেরাতে আল্লাহ তা'আলার নিকট জবাবদিহি করতে হবে, এ তীব্র অনুভূতি মনে সদা জাগ্রত থাকলে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ভাজন কাজ ও আচরণ থেকে বাচাঁ যায়। এটাকে বুদ্ধমত্তা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "বুদ্ধিমান তো সে ব্যক্তি, যে তার প্রবৃত্তিকে বশীভুত করে রাখে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য কাজ করে"।[১১৪]

২. **ধন-দৌলত ও মর্যাদা সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভংগি :** দুনিয়াটা মানুষের জন্য কর্মক্ষেত্র, প্রতিদান ক্ষেত্র নয়। এখানে তাকে কাজ করে যেতে হবে। যার পূর্ণ প্রতিদান সে আখেরাতে লাভ করবে।[১১৫]

৩. **গোটা জীবনে ইসলামের অনুসরণ :** বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বিপ্লবী ঘোষণা ছিল যে, ইসলাম মানব জাতির জন্য এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও মুহূর্তে নিজেদেরকে

---

১১১. মুল আয়াতটি এই, وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون
দ্রঃ সূরা হা-মীম-আসসিজদা: ৪১: ২৭।

১১২. মুল আয়াতটি এই, وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين
দ্রঃ সূরা হা-মীম-আসসিজদা: ৪১: ২৯।

১১৩. আব্বাস আলী খান, *ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন* দ্বন্দ্ব, পৃঃ ৪৮-৪৯।

১১৪. আব্বাস আলী খান, *ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন* দ্বন্দ্ব, পৃঃ ৫১।

১১৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫২

আল্লাহর আনুগত্যের অধীন করে দিতে হবে। রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা-দিক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্পকলা প্রভৃতি গড়ে উঠবে মানুষের স্রষ্টা ও প্রভূ আল্লাহ তা'আলার নিরংকুশ আনুগত্যের অধীনে।[১১৬]

৪. **মানব জাতির ঐক্য :** ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ একই মা-বাবার সন্তান। আল্লাহ্ বলেন, 'হে মানব জাতি! তোমাদের সেই প্রভূকে ভয় করা উচিৎ, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে পয়দা করেছেন'।[১১৭]

৫. **আইনের চোখে সবাই সমান :** মানব জাতির ঐক্য ও সাম্যের স্বভাবিক দাবী এই যে, আইন গত ও মর্যাদাগত ভাবে সকল মানুষ সমান। আইনে কেউ বড়, কেউ ছোট নয়। ইসলামে সকলের জান-মাল, ইজ্জত ও আবরু সমান শ্রদ্ধার পাত্র। আল্লাহ্র আইন সকলের উপর সমভাবে প্রযোজ্য।[১১৮]

৬. **জিহাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর কলেমা বুলন্দ করা**

৭. **আল্লাহর পথে ব্যয়**

আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার জন্য আল্লাহ তা'আলা বার বার মানুষের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, এমন কে আছে যে, আল্লাহকে কর্জ হাসানা দেবে? আল্লাহ তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দিতে পারেন এবং তার জন্য অতীব উত্তম প্রতিফল রয়েছে।[১১৯]

উপরিক্ত আলোচনায় দেখা যায় জাহেলিয়াতের মুকাবিলায় ইসলাম জীবন সম্পর্কে যে ধারণা ও দৃষ্টি ভংগি পোষন করে জনাব আববাস আলী খান তা সুক্ষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তিনি তার অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করেছেন।

ইসলামের এককরূপকতা ও একমুখীনতা

ইসলামের মেজাজ-প্রকৃতি হচ্ছে একেবারে এক মুখো। সকল দিক, সকল আদর্শ, মতবাদ ও দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহমুখী হওয়াই ইসলামের দাবী। আব্বাস আলী খান বলেন, ইসলাম তাঁর অনুসারীদের চিন্তা, চেতনা ও কর্মে একই রং ও সাদৃশ্য দেখতে চায় যা তাদের মধ্যে এক বিশেষ স্বাতন্ত্র স্বকীয়তা সৃষ্টি করবে। বাইরের কোন আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-ধারা ও ধ্যান ধারণার কোন সামান্যতম

---

১১৬. পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৪।

১১৭. মূল আয়াতটি এই, يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
দ্র: সূরা আন-নিসা: ৪: ৩।

১১৮. আব্বাস আলী খান, *ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব*, পৃ: ৫৬।

১১৯. মূল আয়াতটি এই, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم
দ্র: সূরা আল-হাদীদ: ৫৭: ১১।

সংমিশ্রণ ইসলাম বরদাশত করে না।[১২০] এর তৎপর্য হলো, ইসলামের অনুসারীদের চিন্তা ও কাজের দিক দিয়ে একমাত্র আল্লাহমুখী হওয়ার প্রবনতা যেন সংরক্ষিত থাকে।

মুসলমানদের ঐক্য ও পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত

জাহেলিতের আক্রমন থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং পুরাপুরিভাবে ইসলামের পথে চলার জন্য মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য অপরিহার্য। এরই জন্য মুসলমানদের জামাতবদ্ধ জীবন যাপন করা ফরজ করা হয়েছে। কুর'আনে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রশ্মি শক্ত করে ধর এবং দলাদলিতে লিপ্ত হয়ো না।[১২১] ইসলামী জামায়াত, সমাজ ও রাষ্ট্রকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে মুসলমানদের পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলে নেতৃত্বের প্রতি অনস্থা সৃষ্টি হবে এবং অনৈক্য ও দলাদলির পথ প্রশস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে নবী। তুমি তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা কর, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং দ্বীনের কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর।"[১২২] এ নীতি স্বয়ং নবী পাক মেনে চলতেন এবং নবীর পরে খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও এ নীতি পুরাপুরি মনে চলেছেন।

জাহেলিয়াতের পূনরুত্থান

ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব সংঘাত যেহেতু চিরস্থায়ী ও চিরকালীন সে জন্য জাহেলিয়াত ইসলামের দ্বারা পরাজিত ও পরাভূত হওয়ার পর পূণরায় ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। আব্বাস আলী খান বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জাহেলিয়াতের প্রভাব মুক্ত করে তাকে জীবনের সঠিক পথে পরিচালনার জন্য যুগে যুগে নবী রাসূলুল্লাহ্ প্রেরণ করেছেন। তারা মানুষের চিন্তাধারা আকীদাহ বিশ্বাস স্বভাব-চরিত্র ও আচার-আচরণ জাহেলিয়াতের প্রভাব থেকে মুক্ত ও পরিছন্ন করে আল্লাহর মনোনীত পথে পরিচালিত করে জীবনকে সুখী ও সুন্দর করেন।[১২৩] কিন্তু নবী রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিরোধানের পর তাঁদের আদর্শ ও শিক্ষা থেকে মানুষ ধীরে ধীরে দূরে সরে যায় এবং জাহেলিয়াত তাদের নানা ভাবে গোমরাহ করার সুযোগ লাভ করে। এক পর্যায়ে মুসলমানরা তাদের জাতীয় স্বতন্ত্র ও পরিচয় হারিয়ে ফেলে। জাহেলিয়াত তার পরাজয়ের গ্লানী মুছে দিয়ে পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তারা ইসলামী শরীয়তের উপর ইসলামী মূলনীতি ও ধ্যান-ধারণার উপর এবং মুসলমানদের জাতীয় ঐক্যের

---

১২০. আব্বাস আলী খান, *ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন* দ্বন্দ্ব, পৃ: ৭০।

১২১. মুল আয়াতটি এই, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
দ্রঃ সূরা আলে-'ইমরান: ৩: ১০৩।

১২২. মুল আয়াতটি এই, فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
দ্রঃ পূর্বোক্ত: ৩: ১৫৯।

১২৩. আব্বাস আলী খান, *ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন* দ্বন্দ্ব, পৃ: ৭৭।

উপর চতুর্মূখী হামলা চালায়। তাদের ধারণা নবুওয়াতে মুহাম্মদীর বিশ্বাসকে যদি নড়বড়ে করা যায়, তাহলে ইসলামের অন্যান্য মৌল বিশ্বাসগুলি মন থেকে মুছে ফেলা সহজ হবে।[১২৪] এ উদ্দেশ্যে জাহেলিয়াত কয়েকটি রণক্ষেত্র তৈরী করে। এর মাধ্যমে তারা পুরাপুরি না হলেও আংশিক বিজয় লাভ করতে সক্ষম হয়। যেমন-নতুন ধর্মের প্রবর্তন, মিথ্যা নবীর পূণরাবির্ভাব, শিরক ফিন্নবুওয়াত, খেলাফাত থেকে রাজতন্ত্র এবং অনৈসলামী তাসাউফ। এগুলো হলো ইসলামের বিরুদ্ধে জাহেলিয়াতের রণক্ষেত্র। এর মাধ্যমে জাহেলিয়াত পুনরায় বিস্তার লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। জনাব আববাস আলী খান জাহেলিয়াতের পুনরুত্থানের প্রকৃতি, স্বরুপ উল্লেখ করে জাহেলিয়াতের পুনরুত্থানের পথ, পন্থার প্রতি সতর্ক করেছেন।

জাহেলিয়াতের মারাত্মক অস্ত্র

জাহেলী তাসাউফের মাধ্যমে অনেক মুসলমান বিচ্যুতি হয়েছে ঠিকই কিন্তু পরবর্তী কালে জাহেলিয়াতের অতি মারাত্মক অস্ত্র যা ইসলামের মূল বুনিয়াদকেই নড়বড়ে করে দিয়েছে। আববাস আলী খান জাহেলিয়াতের এ সকল অস্ত্র হিসেবে নিম্ন লিখিত বিষয় গুলি চিহ্নিত করে তার মারত্নক প্রভাব থেকে দূরে থাকার প্রতি সতর্ক করে দিয়েছেন। এ বিষয় গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

এক. সেকিউলারিজম

এর মর্ম অর্থ হচ্ছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্ব স্রষ্টার বিধান ও পথ নির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের রচিত বিধান ও পথ নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন যাপন করা। এক কথায় বলা যায় দুনিয়া, সমাজ ও তৎসম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপারে খোদা ও ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। এ তথ্যের ভিত্তিতে মানুষের সাথে দুনিয়ার সম্পর্কের সকল স্তর খোদা ও ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এর ফলে প্রথমত: মানুষকে লাগামহীন স্বাধীনতা দান করা হয়েছে। আর এর মূল কথা হলো (Might is Right, Survival of the fittest) জোর যার মূল্লক তার। জোর করে কোন কিছু হস্তগত করাই ন্যায়সংগত।

দ্বিতীয়ত : প্রবৃত্তির দাসত্ব তৃতীয়ত : স্বার্থপরতা ও সুবিধাবাদ চতুর্থত : চরম নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি হয়।[১২৫]

জাতীয়তাবাদ

জাহেলিয়াতের অন্যতম অস্ত্র জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আববাস আলী খান তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন, জাহেলিয়াতের প্রথম অস্ত্র সেকিউলারিজমের পর দ্বিতীয় অস্ত্র জাতীয়তাবাদ। যা খৃষ্টীয় পোপ ও রোমান সম্রাটদের বিশ্বব্যাপী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়ার বিস্ফোরণ ঘটে, তার থেকে জাতীয়তাবাদ তথা

---

১২৪. তদেব, পৃ: ৭৮।

১২৫. তদেব, পৃ: ৮৭-৯১।

জাতিপুজার সূচনা হয়। জাতীয়তাবাদের কারণে জাতির স্বার্থ হাসিলের জন্য যে কোন দেশ জবর দখল করাকে নেক কাজ মনে করা হয়। এ মতবাদ মুসলমানরা গ্রহণ করলে সেটা জাহেলিয়াতের কৃতিত্ব বলতে হবে।[১২৬]

গণতন্ত্র

জাহেলিয়াতের তৃতীয় মারাত্মক অস্ত্র গণতন্ত্র তথা জনগণের সার্বভৌমত্ব। নিরংকুশ শাসন ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ তা'আলার একচ্ছত্র আধিপত্য খতম করার জন্য গণতন্ত্রের ধারণা পেশ করা হয়। এতে বলা হয়েছে জনগণের সুযোগ সুবিধা ও অভাব অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রেখে জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হবে।[১২৭]

আববাস আলী খান জাহেলিয়াতের অস্ত্র হিসেবে উপরোক্ত বিষয় গুলোর কুফল আলোচনার পর তা থেকে মুসলমানদের সতর্ক করে তাদের দায়িত্বের প্রতি নির্দেশ করে বলেন, উপরোল্লিখিত তিনটি মতবাদ জাহেলিয়াতের আবিস্কার। এর মাধ্যমে সকল ক্ষেত্রে খোদার প্রভুত্ব কর্তৃত্ব ও আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এবং জাতি ও জনসাধারণকে খোদার আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামের মূলনীতি হলো ধর্মহীনতার মুকাবিলায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে খোদার দাসত্ব ও আনুগত্য, জাতি পুজার মুকাবিলায় মানবতা এবং জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের মুকাবিলায় খোদার স্বার্বভৌমত্ব ও জনগণের খেলাফাত প্রতিষ্ঠিত করা।[১২৮]

সুতরাং দুনিয়ায় শান্তি, আখেরাতে মুক্তি ও চিরন্তন সুখের জন্য বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত বিধান অনুযায়ী গোটা মানব জীবন গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই।

জাহেলিয়াতের নতুন রণকৌশল

জাহেলিয়াতের কলা কৌশল যুগে যুগে পরিবর্তিত আকারে ইসলামকে ধবংস করার জন্য আবর্তিত হয় সে দিকে গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আববাস আলী খান তাঁর এ গ্রন্থে বলেন, জাহেলিয়াতের নতুন রণকৌশল হলো মুসলমানদের দ্বারাই ইসলামের উপর আঘাত করা। কারণ জাহেলিয়াত ইসলামের উপর আক্রমন করলে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে সে আক্রমন প্রতিহত করার সম্ভবনা থাকে। তাই কোথাও ইসলামী পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা দেখা দিলে এক শ্রেণীর নামধারী মুসলমান সর্বাগ্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এমনকি শক্তি প্রয়োগ করে হত্যা কাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন নির্মূল করার চেষ্টা চালায়।[১২৯]

---

১২৬. তদেব, পৃ: ১১৭-১২০।

১২৭. তদেব, পৃ: ১২০-১২১।

১২৮. তদেব।

১২৯. তদেব, পৃ: ১২৮-১৩০।

উপরিক্ত আলোচনা গুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় জাহেলিয়াত তার সকল শক্তি ও অস্ত্র দিয়ে ইসলামের অগ্রগতি রুখবার চেষ্টা করেছে। বর্তমানেও বিশ্ব ব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণ রোধে ইসলাম বিরোধী শক্তি গুলো নানা কৌশলে মুসলমানদের মধ্যে লুকায়িত মুনাফিক শক্তির সাহায্য পুষ্টে তাদের রণ কৌশল অব্যহত রয়েছে। আববাস আলী খান তাঁর ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব গ্রন্থে এ অতীতের ইতিহাস উল্লেখ পূর্বক ইসলামকে প্রতিরোধ এমনকি ধ্বংশের জন্য ইসলাম বিরোধী শক্তি গুলির অপতৎপরতা, বর্তমান তাদের রণকৌশল, ভবিষ্যতে তাদের কর্ম তৎরতার বিষয় গুলি অত্যন্ত জীবন্ত ভাবে উপস্থাপন করেছেন। সাথে সাথে মুসলমানদের এ সকল অপতৎপরতা মুকাবিলার যোগ্যতা অর্জন ও কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

আট. ঈমানের দাবী

এটি আব্বাস আলী খানের রচিত ঈমান বিষয়ক একটি মৌলিক গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিতে তিনি কুর'আন ও হাদীসের আলোকে সুনিপুনভাবে ঈমানিয়াতের বিশ্লেষণ, ঈমানের পরিচয়, ঈমানের দাবী, মুমিনের গুণাবলী, ঈমান ও কুফুরের পার্থক্য, ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা, মুমিনদের জন্য সুসংবাদ সহ বিভিন্ন বিষয় অত্যন্ত সাবলীল ভাবে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি পড়ার মধ্য দিয়ে একজন মানুষ সত্যিকার ঈমানদার হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারবে এবং ঈমানের প্রকৃত দাবী সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা লাভ করতে সক্ষম হবে।[১৩০]

নয়. মাওলানা মাওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস

এটি আব্বাস আলী খানের লিখিত মাওলানা মওদূদী সংক্রান্ত জীবনী গ্রন্থ। গ্রন্থটি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ ঢাকা হতে ১৯৬৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ২০০৩ সাল পর্যন্ত গ্রন্থটি পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২২ এবং মূল্য ১০০ টাকা।[১৩১] লেখক বইটিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে মাওলানা মওদূদী (র)-এর জীবন পরিক্রমার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছেন এবং দ্বিতীয় ভাগে মাওলানার বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত সাহিত্যের বিবরণ সহ আরো অনেক বিষয়ের আলোচনা করেছেন।[১৩২] গ্রন্থটি সম্পর্কে লেখক আব্বাস আলী খান বলেন, ১৯৬৭ সালে মাওলানার (র) জীবনী ও কর্ম সাধনার উপরে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত সহ গ্রন্থখানী প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় বইটি ছিল এ ধরণের প্রথম গ্রন্থ। কিন্তু মাওলানার জীবনের উপর নতুন করে কলম ধরার দুঃসাহস আমার ছিল না। কারণ মুসলিম বিশ্বে মাওলানার স্থান এত উপরে যে মুসলিম মিল্লাতের জন্যে াঁর বিষ্যৎ বংশধরদের জন্য রেখে যাওয়া অবদান এত বিরাট ও বিশাল যে তাঁর পূর্ণ চিত্র অংকন করা আমার জন্য

১৩০. আববাস আলী খান, *ঈমানের দাবী* (ঢাকা: বিশ্ব তথ্য কেন্দ্র, ২০০৫ খ্রী:), পৃ: ভূমিকা।

১৩১. আববাস আলী খান, *মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস* (ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, ৫ ম সং, ২০০৩ খ্রী :), পৃ: ৬; নাজমুস সায়াদাত সম্পাদিত, *আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৩৫১।

১৩২. আব্বাস আলী খান, *মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস*, ২য় সংস্কার, পৃ: ভূমিকা।

অত্যন্ত কঠিন।[১৩৩] এছাড়া তিনি মুসলিম মিল্লাত ঁার ংশ রদের ন্য 1 কছু রার এবং বলার তার কোন কিছুই তিনি ফেলে রেখে যাননি। তাঁর সাহিত্য ও চিন্তাধারা বিশেষ করে তাঁর বিপ্লবী াফসীর তাফহীমুল কুর'আন ও সীরাতে সরওয়ারে আলম আগামী কয়েক শতাব্দির জন্য মুসলিম মিল্লাতের দিক দর্শনের কাজ করতে থাকবে।[১৩৪] জীবন ও সমাজের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের জন্য তিনি পুরাপুরি সঠিক পথের (বাহনুমায়ী) সন্ধান দিয়ে গেছেন। যার জন্য গোটা ইসলামী জগত এক বাক্যে তাঁকে ইসলামী জগতের নেতা, শতাব্দীর সংস্কারক ও ইতিহাস স্রষ্টা বলে স্মরণ করছে ও করবে।[১৩৫] তিনি আরো উল্লেখ করেন, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-এর দাওয়াত বাণী ও আদর্শ ছিল যেহেতু আন্ত র্জাতিক, বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য, তাই তার ব্যক্তিত্ব কোন ভৌগলিক, দেশভিত্তিক সীমারেখায় আবদ্ধ ছিল না বরঞ্চ তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক। সে জন্য তিনি ছিলেন সকল আঞ্চলিকতা, স্বজনপ্রীতি ও একদেশদর্শির্তার বহু উর্ব্ধে। তাই সারা বিশ্বের মুসলমানদের কাছে মাওলানা মওদূদী একটা অতিপ্রিয় নাম, সকলের আকর্ষণ ও শ্রদ্ধার পাত্র।[১৩৬] এ গ্রন্থখানি একজন ব্যক্তির শুধু জীবন চরিত্রই নয় বরঞ্চ একটি জীবন একটি ইতিহাস ও একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন।[১৩৭] মাওলানা মওদূদী (র)-এর পূর্বপুরুষের আবাসভূমি ছিল দিল্লীতে। তিনি জন্মগ্রহণ রেন ালিত লিত ন াক্ষিণ্যাত্যের হায়দারাবাদে।[১৩৮] ইসলামের মহান আদর্শ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে চির কালের জন্য জন্মভূমি পরিত্যাগ করে কর্মস্থল হিসেবে বেছে নেন পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠানকোটকে। ভারত বিভাগের পর তিনি লাহোরে হিযরত করেন। কিন্তু কোন আঞ্চলিক ভূখন্ডের মায়া তাঁকে আদর্শের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।[১৩৯] জীবনের শেষ তেত্রিশ বছর লাহোরে কাটিয়ে তিনি লাহোরী বা পাঞ্জাবী হয়ে যাননি। তিনি ছিলেন সারা জাহানের, তিনি ছিলেন বিশ্বমানবতার।[১৪০]

তিনি সব সময় সত্যের প্রচার করেছিলেন। মিথ্যা, অবিচার, দুর্নীতি ও যুলুম নিস্পেষণের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন। তাঁর সত্য ভাষণ কখনও অপ্রিয় করেছে আপনজনকে, অপ্রিয় করেছে বন্ধু-বান্ধব,

---

১৩৩. তদেব।
১৩৪. তদেব, পৃ: ৯।
১৩৫. তদেব।
১৩৬. তদেব।
১৩৭. তদেব।
১৩৮. আব্দুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত, *আববাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ*, পৃ: ৭৪; নাজমুস সায়াদাত সম্পাদিত, *আববাস আলী খানের জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৩৫২।
১৩৯. তদেব ।
১৪০. তদেব।

অপ্রিয় করেছে অনেক বুযুর্গানে কওমকে।[১৪১] তাঁর মাতৃভাষা ছিল উর্দু যার আজীবন তিনি সেবা করেছেন। তিনি উর্দু ভাষাকে নতুন রূপ দিয়েছেন, নতুন অলংকারে ভূষিত করছেন। কিন্তু তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন সকল ভাষার প্রতি। তবে তিনি মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উর্দু তাঁর মাতৃভাষা হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার পক্ষে স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১৪২] অখন্ড পাকিস্তান আমলে পূর্ব-পাকিস্তানের বাহিরাগত মুসলমানদের আচরণ সম্পর্কে, ভাষা সমস্যা, চাকুরী সমস্যা ও দেশ রক্ষা সমস্যা সম্পর্কে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে সুস্পষ্ট মন্তব্য করেছেন। তিনি পূর্ব-পাকিস্তানকে তাঁর দেহের একটি অংগের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছিলেন পাকিস্তান আমার দেহ ও প্রাণের তুল্য। আমার দু'টি হতের মধ্যে যেমন আমি পার্থক্য করতে পারি না বরং দু'টি হাতের মধ্যে যেটি অসুস্থ্য হউক, তা পুরা শরীরের একটি রোগ। এর কারণ অনুসন্ধান করা ও সঠিক চিকিৎসা করা আমার কর্তব্য। আর তা না করার অর্থ হচ্ছে নিজের সাথে শত্রুতা করা।[১৪৩]

তিনি মধ্য প্রাচ্য ভ্রমণ কালে সেখানকার জন সাধারণের ও সুধীবৃন্দের সামনে আরব জাতীয়তাবাদের নির্ভীক সমালোচনা করেন। অপর দিকে বিদেশে অবস্থানরত পাকিস্তান দূতাবাসের কর্মচারীদের কর্মতৎপরতারও সমালোচনা করছেন।[১৪৪]

আববাস আলী খান তার এ গ্রন্থে মাওলানা মওদূদীর আরো কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন, তাঁর চরিত্রের আরো একটি সুন্দর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি নিজকে কখনোও ভুলের উর্ধে মনে করতেন না। তাই তিনি সর্বদাই জামায়াতের কর্মী সম্মেলনে, মজলিশে শুরার অধিবেশনে নিজকে সমালোচনা করার জন্য পেশ করতেন। যারা তাঁর জন্য সদা প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকতেন তাদেরকেও তিনি পূর্ণ সুযোগ দিতেন। যদি তাঁর কোন ভুলত্রুটি তাদের চোখে ধরা পড়ে থাকে তা দ্বিধাহীন চিত্তে যেন বলে ফেলতে পারেন। এভাবে তিনি বহুদিনের বদ্ধমূল কুসংস্কারকে ভেঁঙ্গে চুরমার করেছেন।[১৪৫] তিনি দিবা-রাত্রি দ্বীনের খেদমতে এমনভাবে নিমগ্ন থাকতেন যে, ঘর সংসারের, সন্তানাদির এবং আপন স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেয়ার ফুরসতই ছিল না তাঁর। মুসলিম মিল্লাত বশ্বমানবতার খদমতের ন্য তনি নজেকে স্পূর্ণ উৎস্বর্গ করেছিলেন।[১৪৬]

---

১৪১. তদেব।

১৪২. তদেব।

১৪৩. নাজমুস সায়াদাত সম্পাদিত, *আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৩৫৩; আববাস আলী খান, *মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস*, পৃ: ১০।

১৪৪. তদেব।

১৪৫. তদেব।

১৪৬. তদেব।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আববাস আলী খান বোঝাতে চেয়েছেন যে, সাইয়্যেদ ও মুরশিদ মওদূদীর ব্যক্তিত্ব কোন একটি দেশের মধ্যে সীমিত ছিল না। তিনি ছিলেন না হিন্দুস্তানী বা পাকিস্তানী । ছিলেন না আরবী অথবা আজমী বরং তিনি ছিলেন মুসলিম বিশ্বের, গোটা বিশ্বমানবতার।[১৪৭]

এ গ্রন্থ খানির প্রথম ভাগে লেখক যে বিষয় গুলোর আলোচনা করেছেন তা হলো: মাওলানা মওদূদীর বংশ পরিচয়, বংশ পরম্পরা, মাওলানার জন্ম ও শিক্ষা লাভ, মওদূদীর বাল্য শিক্ষা, সুদৃঢ় নৈতিক চরিত্র অটুট মনোবল, মওদূদীর কর্মময় জীবনের সুত্রপাত, খিলাফাত আন্দোলন ও মাওলানা মওদূদী, হিযরত আন্দোলন ও মাওলানা মওদূদী, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদী, আল-জিহাদ ফীল ইসলাম, মাওলানার স্বাধীন জীবন, মাওলানার সংগ্রামী জীবন, আল্লাহর পথে জিহাদ, তর্জুমানুল কুর'আন,[১৪৮] তর্জুমানুল কুর'আনের প্রকাশনা, দারুল ইসলামে মাওলানা মওদূদী, দারুল ইসলামে কর্মসাধনা, মাওলানার হিযরত, মাওলানার বিবাহ, পাকিস্তান আন্দোলনে মাওলানার অমর অবদান, মওলানা মাদানীর একজাতীয়তাবাদ, মাওলানা মওদূদী ও মুসলিম লীগ, মাওলানা মওদূদীর ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের পর, ইসলামী আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি, জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা, জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন, জামায়াতে ইসলামীর মজলিশে শুরা, জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত,[১৪৯] নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলন, জামায়াতের লক্ষ্য হুকুমাতে ইলাহিয়ার প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি ।ভ, কটি সাক্ষাৎকার, ঐতিহাসিক ১৪ আগষ্টে মাওলানা, ভারত বিভাগের পর, মাওলানা মওদূদীর প্রথম কারাবরণ, আদর্শ প্রস্তাব গৃহীত হবার পর ইসলাম বিমুখ শাসকদের ভূমিকা, মাওলানার যুক্তি, 'আলিমদের ঐক্যবদ্ধ দাবী, সর্বদলীয় কনভেনশন কতৃক ডাইরেক্ট এ্যাকশন, মাওলানা মওদূদীর প্রতি মৃত্যু দন্ডাদেশ,[১৫০] ফাঁসী

---

১৪৭. তদেব।

১৪৮. মাওলানা মওদূদী (র)-এর লিখিত গ্রন্থ আল জিহাদ ফিল-ইসলাম গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণীত হয়ে তিনি পাঁচ-ছয় বছর যাবত গভীর অধ্যয়ন ও জ্ঞান-অর্জনের পর ১৯৩২ সালে দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ থেকে মাসিক প্রত্রিকা "তর্জুমানুল কুরআন" প্রকাশ করে বিরামহীন সংগ্রাম শুরু করেন। একাকী আর্থিক দৈন্যের ভিতর দিয়ে একটি সুপ্ত জাতিকে জাগ্রত করে, সত্যের পথে পরিচালিত করতে তিনি যে বিপ্লবী আহবান জানিয়ে ছিলেন তর্জুমানুল কোরআনের পাতায় পাতায় তার স্বাক্ষর পাওয়া যায়।
দ্রঃ আববাস আলী খান, *মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস*, পৃঃ ৬২।

১৪৯. মানব সমাজের নিকট সাধারণ ভাবে এবং মুসলিমদের নিকট বিশেষ ভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে খোদার দাসত্ব ও নবীদের আনুগত্য স্বীকার করা, বর্ণচোরা মনোভাব ও মুনাফেকী ত্যাগ কর এবং খোদার সাথে কাউকেও শরীক কর না এবং খোদা বিমুখ লোকগুলোকে নেতৃত্ব কতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে প্রকৃত ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের হাতে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত করা, যেন জীবন সঠিক পথে পরিচালিত হয়।
দ্রঃ আববাস আলী খান, *মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস*, পৃঃ ১১৪।

১৫০. ২৮ শে মার্চ হঠাৎ সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ মাওলানা মওদূদী এবং জামায়াতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করেন। কাদিয়ানী সমস্যা পুস্তিকার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ প্রচার এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অভিযোগে মাওলানা মওদূদী এবং তাঁর সহকর্মী মালিক নসরুল্লাহ খান আজিজ ও জনাব নকী আলীকে সামরিক আদালতে অভিযুক্ত করা হয়। উক্ত অভিযোগেই মাওলানা মওদূদীর প্রতি ৮ মে সামরিক আদালত কর্তৃক ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়।
দ্রঃ আববাস আলী খান, *মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস*, পৃঃ ১৩৭।

কক্ষে মাওলানা মওদূদী,[১৫১] ফাঁসীর আদেশে দেশ-বিদেশে প্রতিক্রিয়া, মাওলানার মুক্তি, মাওলানার পূর্ব পাকিস্তান সফর, বহিরাগতদের প্রতি মাওলানার হুশিয়ারী, ভাষা সমস্যা, সরকারী চাকুরী সমস্যা, দেশ রক্ষা সমস্যা, ইসলামী শাসনতন্ত্র গৃহীত হবার পর, মাওলানা দ্বিতীয় বার পূর্ব পাকিস্তানে, মাওলানার বিদেশ ভ্রমণ, পাকিস্তান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন, পাকিস্তানে সামরিক শাসন, মাওলানা মধ্যপ্রাচ্যে দ্বিতীয়বার, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাওলানার অবদান, সামরিক শাসনের পর, নিখিল পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলন, লাহোর সম্মেলনে মাওলানা মওদূদীর উদ্বোধনী ভাষণ, জামায়াতে ইসলামী বে-আইনী ঘোষিত, জামায়াতের মামলা, মাওলানা মওদূদীর জবাব, আটকের ব্যাপারে আইন সঙ্গত আপত্তি, আটক করার কারণ সম্পর্কে কতিপয় সাধারণ আলোচনা, বল প্রয়োগে ক্ষমতা দখল, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধীতা, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি, ইসলামী জমিয়াতে তালাবা, সেনাবহিনীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি, লীডারশীপ গাইরে ইসলামী, তর্জুমানুল কোরআনের প্রবন্ধ, তৃতীয় অভিযোগের অতিরিক্ত জবাব, অভিযোগের উত্তরে কাশ্মীর নেতৃবৃন্দ, মাওলানা ও জামায়াত নেতাদের মুক্তি, বিগত পাক-ভারত যুদ্ধে মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা, মাওলানা মওদূদীর আযাদ কাশ্মীর সফর, পত্রের নকল, যুদ্ধকালে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান, বহির্বিশ্বে পাকিস্তানের খেদমত, পাক-ভারত যুদ্ধের পর থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত, মাওলানার গ্রেফতার, চিকিৎসার উদ্দেশ্যে মাওলানার বিদেশ ভ্রমণ, আটষট্রির (৬৮) আগষ্ট থেকে ডিসেম্বর, লণ্ডনের দিনগুলো, ইউকে ইসলামিক মিশনের সম্মেলন, গোলটেবিল বৈঠক, মাওলানার ইন্তিকাল,[১৫২] মাওলানার জানাযায় অভিজ্ঞতার আলোকে, বাফেলোতে একটি স্মরণীয় সাক্ষাৎকার, মাইয়েত লাহর।[১৫৩]

গ্রন্থটির দ্বিতীয় ভাগে যে সব বিষয় গুলোর আলোকপাত করা হয়েছে তা হলো: মাওলানার মধ্যে লেখনি শক্তির প্রেরণা, মাওলানার বিপ্লবী সাহিত্য, তাঁর সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, মাওলানার কয়েকটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত

---

১৫১. মর্দে মুমিন যখন দ্বীন-দুনিয়ার বাদশাহ আল্লাহর দরবারে নতশীরে 'ইবাদতে মশগুল, তখন তাঁকে জানানো হলো মৃত্যুর পরওয়ানা। মৃত্যুদন্ডাদেশে আল্লাহর প্রিয় বান্দা মাওলানার চোখে মুখে নেই কোন ভীতির চিহ্ন, নেই কোন উদ্বেগ, অম্লান বদনে হাসিমুখে ফাঁসীর আদেশ মেনে নিলেন ধন্যবাদের সাথে। ফাঁসীর কক্ষে মাওলানার কোন উদ্বেগ নেই। প্রাণ-নাশের জন্য কোন চিন্তা-ভাবনা নেই। চোখে মুখে কালিমার কোন চিহ্ন নেই। কুর'আন শরীফের পরিবর্তে সাইয়েদ আহমদ শহীদের (র) জীবনী পড়তে পড়তে অতি স্বাভাবিক ভাবে পরম সুখে নিদ্রা গেলেন। মাওলানা এ সময় তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অগনিত ভক্ত অনুরক্ত ফাঁসির আদেশে অধীর হয়ে পড়লে তিনি সান্তনা দিয়ে বলেন, জীবন মৃত্যুর ফয়সালা আসমানে হয়, জমীনে হয় না।
দ্রঃ আববাস আলী খান, *মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস*, পৃঃ ১৪১-১৮৬।

১৫২. মাওলানা আজীবন যে কঠোর শারিরীক ও মানসিক পরিশ্রম করেন তার জন্য তার স্বাস্থ্য অকালেই ভেঙ্গে পড়েছিল। তিনি দীর্ঘ দিন যাবত মূত্রাশয়ের পিড়ায় ভোগেন। যার ফলে হাটু ও কোমরের বেদনা বলতে গেলে চিরস্থায়ী হয়ে পড়েছিল। ৬৮ সালে লণ্ডনে মূত্রাশয় অপারেশনও করা হয়। অবশেষে ১৯৭৯ সালে ২২ সেপ্টম্বর আমেরিকায় বাফেলো শহরের এক হাসপাতালে আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষী মাওলানা মওদূদী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন এবং ২৬ সেপ্টেম্বর লাহোরে জানাযার পর তাঁর দাফন কার্য শেষ করা হয়।
দ্রঃ আববাস আলী খান, *মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস*, পৃঃ ২৬৩-২৬৪।

১৫৩. তদেব, পৃঃ ১৭-২০।

পরিচয়, তাফহীমুল কুর'আন[১৫৪], কুর'আনের বারটি মৌলিক পরিভাষা, ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা, আল জিহাদ ফীল ইসলাম, ইসলামী রেঁনেসা আন্দোলন, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব, ইসলাম পরিচিতি, ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, ইসলামী জীবন পদ্ধতি, পর্দা ও ইসলাম।[১৫৫] মাওলানা ও তাঁর সাহিত্যের প্রভাব অন্যান্য দেশে, ভারত সিংহল, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, মারিশাস, সিভিল কোরিয়া, জাপান, সুদান, মাওলানা মওদূদী ও তাসাউফ, মাওলানা কি তাসাউফ বিরোধী ছিলেন? অধ্যাত্মিক সংস্কার-সংশোধন, আল্লাহর াথে ম্পর্ক, ালাহ ত 'আলার স থে স পর্ক নিরূপনের উপায়[১৫৬], মাওলানা

---

১৫৪. তাফহীমুল কুর'আন রচনা মাওলানার একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তিনি ১৯৪৩ সাল থেকে ধারাবাহিক ভাবে মাসিক পত্রিকা তর্জুমানুল কুরআনে এ তাফসীর লেখার সূচনা করেন এবং দীর্ঘ ত্রিশ বছরে তা শেষ করেন। বলতে গেলে তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করেন এই অমূল্য গ্রন্থ রচনায়। ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এ হলো তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। এ গ্রন্থ খানিতে অধিকতর উপযোগী প্রামান্য ও তথ্যবহুল করার জন্য তিনি তাঁর সমগ্র শক্তি ব্যয় করেছেন। মধ্য প্রাচ্য আরদুল কুর'আন (কুর'আনে বর্ণিত ঐতিহাসিক স্থানগুলি) স্বচক্ষে ঘুরে ফিরে দেখেছেন এবং সে সব ঐতিহাসিক স্থানের আলোকচিত্র তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। মাওলানা তাফহীমুল কোরআনে কালামে ইলাহীর ব্যাখ্যা প্রসংগে কোন মনগড়া কথার অবতারণা করেননি। অতীতের মুসলিম মনীষী বা সালফে সালেহীনের অভিমত, সহীহ হাদীস ও সীরাত পাক অনুসরণ করেছেন। কুর'আনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফিকাহ সম্পর্কিত প্রশ্নের সম্মুখীন হলে মাওলানা ফিকাহ শাস্ত্রের ইমাম চতুষ্টয়ের মূল গ্রন্থাবলী আলোচনা করতেন। তাফহীমুল কুর'আনের বৈশিষ্ট্য এই যে,আধুনিক মন মানসিকতাকে সামনে রেখে মাওলানা এর টীকায় বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা দান করেছেন। 'আরবী অভিধান, ব্যকরণ ও তর্কশাস্ত্রের জটিল তত্ত্বের কোন প্রকার অবতারণা না করে সহজ সরল ভাষায় আধুনিক যুগের সমস্যা গুলোর সমাধান পেশ করেছেন। তিনি প্রত্যেকটি সূরার প্রারম্ভে তার একটি পরিচিতি, উপক্রমিকা বা মুখবন্ধ সন্নিবেশিত করেছেন। সূরাটির কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়বস্তু, তার পশ্চাৎ পটভূমিকা, শানে নুযুল, যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সুরাটির অবতারণা তার পূর্ণ বিবরণ প্রথমেই উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এ গ্রন্থে তিনি নবী মোস্তফা (সা)-এর সীরাত পাকের উপরে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। কুর'আন পাকের ধারক ও বাহক নবী মোস্তফা (সা)-এর সত্যিকার পরিচয় দান করে তাঁর প্রতি পাঠকের অগাধ প্রেম ও ভালবাসার সঞ্চার করেছেন। মাওলানার লিখিত বিপ্লবী সাহিত্য গুলোর মধ্যে তাফহীমুল কুর'আন শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে।

দ্র: আববাস আলী খান, *মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস*, পৃ: ২৯৪-২৯৭।

১৫৫. গ্রন্থখানী মাওলানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক অবদান। গ্রন্থ খানিতে আধুনিক কালের একটি বিতর্কিত বিষয়ের উপর তিনি শক্ত করে কলম ধরেছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভেই তিনি মানব সমাজের মৌলিক সমস্যা আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন মানবীয় তমুদ্দুনের প্রধানতম ও জটিলতম সমস্যা দু'টি। এ দু'টি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের উপর নির্ভরশীল মানবজাতির উন্নতি ও সার্বিক কল্যাণ। তাই এর সমাধানের জন্য জগতের চিন্তাশীল সুধী সমাজ বিব্রত ও চিন্তিত। প্রথম সমস্যাটি হলো সামাজিক জীবনে নারী পুরুষের সম্পর্ক কিভাবে হতে পারে । আর দ্বিতীয় সমস্যাটি হচ্ছে মানব জাতির ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিগত সম্পর্ক। এ দুয়ের সমাঞ্জস্য বিধানে যদি সামান্যতম অসঙ্গতিও রয়ে যায় তাহলে এর তিক্ততা মানব জাতিকে ভোগ করতে হবে দীর্ঘ কাল ধরে। অতঃপর মাওলানা প্রাচীন গ্রীস, রোম, খ্রিষ্টীয় ইউরোপ দেশগুলোর সমাজ ব্যবস্থার এক অতি বেদনা দায়ক চিত্র অংকন করেছেন। মূলত: এ গ্রন্থখানি মানুষের চিন্তার জগতে এক বিরাট আলোচনা সৃষ্টি করেছে।

দ্র: আববাস আলী খান, *মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস*, পৃ: ৩০৩।

১৫৬. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির উপায় বর্ণনায় মাওলানা বলেন, 'এ সম্পর্ক পরিমাপ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা নিজেই প্রতিটি মুমিন ব্যক্তির অন্তরে করে রেখেছেন। আপনি জাগ্রত অবস্থায় দিনের বেলায় তা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। তাহলো নিজের হিসাব নিকাশ ঠিক করার পরে আপনি আল্লাহর সাথে যে চুক্তিতে আবদ্ধ আছেন, তার সাথে মিলিয়ে দেখুন, আপনি তা কত খানি পালন করেছেন? আল্লাহ তা'আলার আমানত সমূহ কত টুকু রক্ষা করতে পেরেছেন? আপনার সময়, শ্রম, দক্ষতা, যোগ্যতা, ধন-সম্পদ ইত্যাদির কতটুকু আল্লাহর তা'আলার বিধান অনুযায়ী ব্যয়িত হচ্ছে? আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহ ঘেষণা করা হয় তখন আপনার ক্রোধ, মর্মপীড়া, উদ্বেগ, অশান্তি কিরূপ ও কতখানি হয়? ইত্যাদি প্রশ্নের মাধ্যমে বলা যায় আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক কত টুকু?'

দ্র: আববাস আলী খান, *মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস*, পৃ: ৩২২।

মওদূদীর পয়গাম, শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা, নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ, পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে মাওলানা, খোদাহীন শিক্ষা ব্যবস্থা, নীতি বর্জিত শিক্ষা, পূর্বতন শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে দ্বীনিয়াত সংযোজন, শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ, দ্বীন ও দুনিয়ার পার্থক্য বিলুপ্তি করণ, দেশ রক্ষা সম্পর্কে মাওলানার মূল্যবান পরামর্শ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় সমান অধিকার, অর্থনৈতিক সমস্যা ও ইসলাম, অন্যদের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী, বেগম মওদূদী, মাহেরুল কাদেরী, বশীরুল ইবরাহীমি, ড. মুহাম্মদ আতাউর রহমান নদভী, আগা সুবেশ কাশ্মীরী, মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী, মাওলানা মানাজির আহসান গিলানী, মাওলানা মোহাম্মদ মনজুর নোমনী,অধ্যাপক আল-ফ্রেডস্মীথ, মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, রাজা গজনফর আলী খান, এ. কে. ইব্রাহীম, শরীফ উদ্দীন পীরজাদা, মাওলানা আমের উসমানী দেববন্ধ, মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়ব, দারুল উলুম দেওবন্ধ, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস বিহারী, মাওলানা আবদুল কুদ্দুস বিহারীর সাক্ষাৎ, মাওলানা যাফর আহমদ আনসারী, ড. ইব্রাহীম আগাহ, ইয়াসিন ওমর, ড. সিরাজুল হক বাংলাদেশ, মওদূদীর পত্রাবলী, কতকগুলো মূল্যবান কথা, একটি সাক্ষাৎকার, কিছু ঐতিহাসিক উক্তি, আমার প্রিয় গ্রন্থ[১৫৭], মাওলানা মওদূদীর অবদান।

পরিশিষ্ট, মাওলানা মওদূদী (র)-এর জীবন পঞ্জী, বিষয় ভিত্তিক মাওলানা মওদূদীর গ্রন্থপঞ্জী। মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে বাংলা ভাষার কয়েকটি বই।[১৫৮] গ্রন্থটি লেখক আব্বাস আলী খান মাওলানা মওদূদী এবং স্বীয় পিতা মাতা ও চাচার জন্যে উৎস্বর্গ করেছেন।[১৫৯]

দশ : ইসলামী আন্দোলন ও তার দাবী

এটি আব্বাস আলী খানের একটি লিখিত ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন সংক্রন্ত মৌলিক গ্রন্থ। গ্রন্থটি জনাব খান সাহেবের একটি ভাষণ। তিনি ১৯৯৭ সালের ২৫-২৭ ডিসেম্বর টঙ্গীস্থ জামেয়া ইসলামীয়ায় কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলনে রুকন ভাই ও বোনদের উদ্দেশ্যে ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে বক্তব্য

---

১৫৭. মাওলানা মওদূদী বলেন, আমি জাহেলিয়াত যুগের অনেক বই পুস্তক পড়া-শুনা করেছি। প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বহু সংখ্যক বই-পুস্তকের আলমারী উজাড় করে পড়া-শুনা করেছি। কিন্তু যখন চোখ খুলে কুর'আন পাক পড়লাম, তখন সত্যিই মনে হলো যে, এ যাবত যা কিছু পড়া-শুনা করেছি তা সবই অতি নগন্য। জ্ঞানের মূল এখন আমার হস্তগত হয়েছে। কান্ট, হেগেল, নিটশে, মার্কস এবং দুনিয়ার অন্যান্য শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলগণ আমার কাছে একবারে শিশু মনে হয়েছে। তাদের প্রতি করুনা হয় যে,তাঁরা যে সব সমস্যার সমাধানের জন্যে সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন এবং সে সবের উপর বিরাট গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং যে সবের সমাধান পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। পক্ষান্তরে এ মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এ সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দু'এককথায় পেশ করা হয়েছে। এ সব বেচারা যদি এ মহাগ্রন্থ সম্পর্কে অজ্ঞ না থাকতেন, তাহলে তারা তাদের জীবন এভাবে ব্যর্থতায় কাটিয়ে দিতেন না। আমার সত্যিকার প্রিয় গ্রন্থ এই একটি।
দ্রঃ আববাস আলী খান, *মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস*, পৃঃ ৩৯০।

১৫৮. তদেব, পৃঃ ২২।

১৫৯. তদেব, পৃঃ ১৩।

দিয়েছিলেন।[১৬০] এ ভাষণটি বই আকারে ১৯৯৮ সালের মে মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ বইটি প্রকাশ করেন। মোট পৃষ্ঠা ২৪, মূল্য- ৮(আট) টাকা।[১৬১] বই টিতে লেখক ইসলামী আন্দোলনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছেন। বিষয় গুলো হলোঃ ইসলামী আন্দোলন[১৬২], ইসলামী আন্দোলনের সূচনা, খুলাফায়ে রাশেদীনের ইসলামী আন্দোলন, ভারত উপমহাদেশে ইসলামী আন্দোলন, বর্তমান শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলন, ইসালামী আন্দোলনের দাবী[১৬৩], মুসলিম জাতি সত্ত্বার পদমর্যাদা ও দায়িত্ব, বিপ্লবের ন্য লাক তরী,[১৬৪] লোক তৈরীর পদ্ধতি, চিন্তা ও চরিত্রের পরিশুদ্ধি, ব্যক্তি ও দলের অনিবার্য গুনাবলী[১৬৫], পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত, মুহাসাবা,[১৬৬]

---

১৬০. আব্বাস আলী খান, *ইসলামী আন্দোলন ও তার দাবী* (ঢাকাঃ জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, ১৯৯৮ খ্রীঃ), পৃঃ ৪।

১৬১. তদেব, পৃঃ ২।

১৬২. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর, দাসত্ব, আনুগত্য, হুকুম ,শাসন ও আইন মেনে চলা। কিন্তু ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন-শাসনের পরিবর্তে যদি মানুষের আইন-শাসন প্রচলিত থাকে, তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা এবং সংগ্রামের মাধ্যমে তা উৎখাত করে সেখানে আল্লাহর প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব ও আইন-শাসন কায়েম করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা একজন মুসলমানের ঈমানের দাবী। এ সংগ্রামকে বলে ইসলামী আন্দোলন।
দ্রঃ আব্বাস আলী খান, *ইসলামী আন্দোলন ও তার দাবী*, পৃঃ ৫।

১৬৩. খোদা-দ্রোহিতার উপরে যে ব্যবস্থা দুনিয়ার কয়েম আছে, তা পরিবর্তন করে খোদার আনুগত্যের উপরে তা কায়েম করতে হবে। অন্য কথায়, পরিপূর্ণ ইসলামী বিপ্লবই এ আন্দোলনের দাবী। অতপর বাতিল ব্যবস্থার উৎখাতের সংগ্রাম করতে গেলে বাতিল ব্যবস্থার ধারক-বাহক এবং এ ব্যবস্থার সাথে যাদের যাদের স্বার্থ জড়িত তাদের সকলের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড আঘাত অবশ্যই আসবে। আন্দোলনের দাবী এসব আঘাত এবং সম্ভাব্য সকল বিপদ-মসীবত হাসি মুখে বরণ করে সত্যের পথে অবিচল থাকা।
দ্রঃ আব্বাস আলী খান, *ইসলামী আন্দোলন ও তার দাবী*, পৃঃ ৭-৮।

১৬৪ বিপ্লবের জন্য কাংখিত লোক তৈরী না হলে বিপ্লব কিছুতেই সম্ভব নয়। ইসলামী বিপ্লব করতে হলে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে ইসলামী মন-মস্তিষ্ক, চিন্তা-চেতনা ও চরিত্রের যোগ্যতা সম্পন্ন কিছু লোক তৈরী করা একান্ত প্রয়োজন। যারা দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় কার্যাবলী সুচারু রূপে পরিচালনা করার যোগ্যতা সম্পন্ন হবেন, মজবুত ঈমানের অধিকারী হবেন এবং ইসলামের প্রতি একনিষ্ঠ থাকবেন।
দ্রঃ আব্বাস আলী খান, *ইসলামী আন্দোলন ও তার দাবী*, পৃঃ ৯।

১৬৫. আন্দোলন কারীর ব্যক্তিগত গুণাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথমঃ হচ্ছে ইসলামের সঠিক ধারণা ও জ্ঞান দ্বিতীয়তঃ ইসলামের প্রতি অবিচল বিশ্বাস তৃতীয়তঃ দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকেই জীবনের উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। পাশা-পাশি দলীয় ভাবে তারা পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। দলের লোকদের মধ্যে আন্তরিক ভালবাসা, পারস্পারিক সুভাকাংখ্যা এবং পরস্পরের জন্য ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা থাকতে হবে।
দ্রঃ আববাস আলী খান, *ইসলামী আন্দোলন ও তার দাবী*, পৃঃ ১১-১২।

১৬৬. মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই মানুষের ভুল হওয়া স্বাভাবিক। উপরন্তু শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। স্বাভাবিক মানবীয় দুর্বলতা অথবা শয়তানের ওয়াসওয়াসার কারণে ইসলামী আন্দোলনের লোকদের ভুল হতে পারে এবং হয়ও। তাই তাদের পরস্পরের সংশোধনের উদ্দেশ্যে ভুল ধরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও জামায়াতে ইসলামীতে আছে। এটাকে মুহাসাবা বলা হয়। মানুষ ভাল কাজের সাথে যদি কিছু মন্দ কাজ কারো চোখে পড়ে, তাহলে সংশোধনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলে দেয়া। মুহাসাবা এ অর্থেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
দ্রঃ আববাস আলী খান, *ইসলামী আন্দোলন ও তার দাবী*, পৃঃ ১৩।

নিরলস ও অবিরাম সংগ্রাম, আল্লাহর সাথে গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টি, নেতৃত্বের আনুগত্য,[১৬৭] জনগণের আস্থা আর্জন, হিযরত, জিহাদ, শাহাদাত ও শাহাদাতের অভিলাস জান্নাতের নিশ্চয়তা দান করে।[১৬৮]

এগার. স্মৃতি সাগরের ঢেউ

স্মৃতি সাগররে ঢেউ গ্রন্থটি জীবনী, স্মৃতিচারণ ও ভ্রমণ কাহিনী সংক্রান্ত লিখিত আব্বাস আলী খানের একটি মৌলিক রচনা। ১৯৭৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে এপ্রিল মাসে। গ্রন্থটিতে লেখক নিজের গোটা জীবনে বিভিন্ন স্মৃতির কথা অত্যন্ত মনমুগ্ধকর ভাষায় পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বইটিতে তিনি ৩৩টি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[১৬৯] বিষয় গুলো হলোঃ সূচনা, শিক্ষা ও চাকুরী, দার্জিলিং এ কয়েক মাস ,নজরুলের সাথে পরিচয়, জাপানী বোমা ও নিউমোনিয়া, দিল্লির লাড্ডু, তমলুক, সরকারী চাকুরী ছাড়ার পর, হাই স্কুলে চাকুরী, সঠিক পথের সন্ধান, জামায়াতে যোগদান, মাছিগোট সম্মেলন, কপোত কপোতি, আলতাফ গওহর, কালা-কানুন ও কায়েদে আজম, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, পৃথক নির্বাচনের ইতিহাস, ভারতীয় সংগ্রেস, বংগভংগ, ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়, গান্ধীর রাজনীতি, বংগভংগ ও বৃটিশ পার্লামেন্ট, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মুসলমান ও হিন্দু পৃথক জাতি, কংগ্রেসের জন্ম, গোলটেবিল বৈঠক, কংগ্রেস শাসন, পাকিস্তান আন্দোলনের উদ্দেশ্য, গান্ধীর ভিতর ও বাইর ,পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ, রাখে আল্লাহ মারে কে ? পীর অলীদের মাজারে, সর্বশেষ সেকাল ও একাল।[১৭০]

স্মৃতি সাগরের ঢেউ গ্রন্থের পটভূমি সম্পর্কে লেখক আব্বাস আলী খান লিখেছেন, দুর্ভাগ্যই বলুন আর সৌভাগ্য বলুন, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে দুশউনিশ দিন কাটিয়ে ছিলাম। বায়াত্তরের ৩১ জানুয়ারী রাত ১২ টায় জেল খানার ভিতরে ডিপুটি জেলারের কামরায় আমাদেরকে বসতে দেয়া হলো। এরপর ঘন্টা খানেক পর একটি দোতলায় পৃথক পৃথক সেলে আমাদেরকে লকআপ করা হলো। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর আমরা দশজন ফ্যামেলিসহ ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে উঠলাম। কিছু দিন আগে এটাকে আর্ন্তজাতিক রেডক্রসের নিউট্রল জোন ঘোষণা করা হয়েছিল। সারা দেশে তখন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। ঢাকা পতনোন্মুখ। দিবালোকে রাশিয়ান মিগ-২১ এর উপর্যোপরি হামলায় ঢাকা বাসীদের এক প্রাণান্তকর অবস্থা। ১৬ ডিসেম্বর সন্ধায় আমাদের হোটেল ঘেরাও করা হলো। ঘেরাওকারীদের

---

১৬৭. ইসলামী আন্দোলনকে গতিশীল ও বেগবান করতে হলে যেমন যোগ্য ও ত্যাগী নেতৃত্বের প্রয়োজন তেমনি নেতৃত্বের আনুগত্যও প্রয়োজন। ইসলামী আন্দোলন যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরিচালিত হয়, সে জন্য এটা 'ইবাদতের মধ্যে শামিল। এ আন্দোলনের নেতৃত্বের দায়িত্ব কোন ব্যক্তির উপর অর্পণ করা হয় ইসলামী পদ্ধতি অনুযায়ী। অতএব এ নেতৃত্বের আনুগত্য করাও ইবাদত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যে আমীরের আনুগত্য করলো, সে রাসূলের আনুগত্য করলো। আর রাসূলের আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য।
দ্রঃ আববাস আলী খান, *ইসলামী আন্দোলন ও তার দাবী*, পৃঃ ১৬; রিয়াদুস সালেহীন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬০।

১৬৮. তদেব,পৃঃ৩।

১৬৯. নাজমুস সায়াদাত সম্পাদিত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ; ৩৬৪।

১৭০. তদেব, পৃঃ ৩৬৮।

একমাত্র লক্ষ্য ছিল আমরা। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ঘেরাও কারীদের মুখে মুহু:মুহু: ধ্বনি হচ্ছিল গভর্ণর ড. মালেক ও তাঁর মন্ত্রীদের মুন্ডু চাই। জীবনের মায়া ত্যাগ করে বিবি বাচ্চা সহ আমরা মৃত্যুর জন্য তৈরী হলাম। এদিকে রেডক্রসের দায়িত্বশীলগণ অনেক অনুরোধ করে ঘেরাও কারীদের ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলেন। তাদেরই অনুরোধে দু'টি ট্যাংকসহ ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর একটি দল এসব ঘেরাও কারীদের ছত্র-ভঙ্গ করে দেয়। ফলে আমরা মৃত্যুর দুয়ার থেকে এ যাত্রা বেঁচে গেলেও নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে ছিলাম। কারণ ইন্টারকনের ডাইনিং হলে খেতে বসে দেখতাম কাঁধে স্টেনগান আর কোমরে রিভলভার ঝুলিয়ে দু'চার জন এসে আমাদের সাথে খেতে বসেছে। আর কটমটিয়ে লাল চোখ দিয়ে চারিদিকে তাকাচ্ছে। আমাদের দু'চার জন সাথী বেগতিক দেখে একদিন রাতের আধারে গাঁ ঢাকা দিয়ে হোটেল থেকে কেটে পড়লেন। শেষটায় ঠিক হলো আমাদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তার জন্য ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হবে। ১৯ শে ডিসেম্বর রাত চারটায় ইন্টারকন হোটেল থেকে সকলের আলক্ষ্যে আমাদেরকে ক্যান্টনমেন্টে স্থানান্তরিত করা হলো। পাক সেনা বাহিনীর পরিত্যাক্ত কোয়াটার গুলি আমাদেরকে দেয়া হলো ফ্যামিলিসহ থাকার জন্য। প্রথম দুদিন রেডক্রস আমাদের মেহমান দারী করলো। চাদর-বালিশ, কম্বল, হাড়ি-পাতিল, বাসন-কোসন, বালতি-বদনা সব কিছুই সাপ্লাই করলো রেডক্রস। আমাদের সুখ-সুবিধার জন্য রেডক্রসের কর্মচারীগণ ছিলেন অত্যন্ত ব্যস্ত ও তৎপর। এর দুদিন পর থেকে ভারতীয় সোনবাহিনীর পক্ষ হতে রেশন দেয়া শুরু হলো। চাল, ডাল, ঘি, আটা-ময়দা, চা-চিনি তরিতরকারী পেতে লাগলাম ঠিকমত। মাছ, মুরগী, আন্ডা কিন্তে পাওয়া যেত। এক সময় আমাদেরকে জানানো হলো আমরা যুদ্ধবন্দী এবং আমাদেরকে যেতে হবে ভারতে। ইচ্ছা করলে ফ্যামিলিসহ যেতে পারব। তার জন্য তৈরী হলাম। যাইহোক দেড়মাস কাটালাম ক্যান্টনমেন্টে। বাহির জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। রেডিওর পালিশ করা খবর গুলো শুধু শুনতে পেতাম। হঠাৎ বায়াত্তরের ৩১ জানুয়ারী রাত দশটার পর আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ডেকে নেয়া হলো ড. মালেকের কুঠিতে। সেখানে বসাছিল ভারতীয় সেনা বাহিনীর জনৈক ব্রিগেডিয়ার এবং ঢাকার এস. পি.। ব্রিগেডিয়ার জানালেন আমরা আর যুদ্ধবন্দী নই। আমাদেরকে তিনি বাংলাদেশ সরকারের কাছে হস্তান্তর করেছেন। ঢাকার এস. পি. চট করে বললেন তিনি আমাদেরকে এক্ষুনি নিয়ে যাবেন জেলে। বহু অনুরোধ সত্ত্বেও আমাদেরকে আর ঘরে ফিরে যেতে দেয়া হল না। প্রত্যেকের ঘরে ছেলে-পুলে মায়ের কোলে ঘুমাচ্ছে। পুরুষ মানুষ বলতে কারো ঘরে কেউ নেই। আমাদেরকে যেন টোপ দিয়ে ডেকে এনে বেঁধে ফেলা হলো। আমরা ঘরের সবাইকে পুরাপুরি দুনিয়ার মালিক প্রভূর উপর সপর্দ করলাম। অবশ্যই পরদিন রেডক্রস জানতে পেরে সবাইকে তাদের আত্মীয় স্বজনদের বাড়ী পৌছিয়ে দিল। আমরা তিন চার দিন পর তা জানতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়ায় মাথা নত করলাম। জেলের ভিতরে প্রথমে সেলে রাখা হলো, নয় মাস পর একটি বিরাট হল ঘরে স্থানান্তরিত করা হলো যেখানে ১৫ থেকে ১৬ জন হইহুল্ল করে থাকা যেত। প্রথম দিকে কোন সংবাদ পত্র দেয়া হত না, এমনকি জেলের লাইব্রেরীর বই পুস্তকও না। এটা এক প্রকার কবরের মত বলা চলে। কবরের ন্যায় জেল খানায়ও দু'জন মুনকার নাকির আসত। তবে রাতের আধারে আসত ঘন ঘন। অর্থাৎ দু' ঘন্টা পর পর একজন। প্রথম প্রথম তাদের সাথে সম্পর্ক ভাল না

থাকায় জীবনটা নিঃসঙ্গ, নিরানন্দ ও মনটা ছিল চিন্ত-ভাবনা ও উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে ঘর্ণিবত। কিন্তু এতদস্বত্ত্বেও মন দুর্বল হয়ে পড়েনি ক্ষনিকের জন্যে। এ জেলের মধ্যে এক নিঃসংগ ও কর্মহীন মানুষ আমি। সাথে নিয়ে এসেছি কালামে এলাহী। আর জাষ্টিস কায়ানীর একখানা ইংরেজী বই। আর ছিলো কলম ও কালি। পরে কাগজ জোগাড় হয়ে গেল। অগত্যা বসে বসে কাগজের উপর কালির আঁচড় দিয়ে সময় কাটাতে লাগলাম। শেষটাই সেই আঁচড় গুলো প্রসাব করল "স্মৃতি সাগরের ঢেউ"।[১৭১]

গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণে আব্বাস আলী খান আরও বলেন, আলোচনা দীর্ঘ হলেও আপন স্মৃতির কথার সাথে অতীতের কিছু তিক্ত ইতিহাস প্রসংগক্রমে বলতে হয়েছে। ভবিষ্যত বংশধরকে তাঁদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকেফহাল করা অত্যন্ত প্রয়োজনবোধ করছি এ করণে যে, অতীত ইতিহাস জানা না থাকলে জাতি দিক ভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই ইতিহাসের যে স্তরগুলো আমরা অতিক্রম করে এসেছি, তার চিত্র বর্ননা করার চেষ্টা করেছি। জাতীয় জীবনে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণে এটা কাজে লাগতে পারে। আশা করি এ ইতিহাস আমাদের যুব সমাজের জ্ঞান-চক্ষু খুলে যাবে।[১৭২]

বইটি সম্পর্কে বাংলাদেশের জনপ্রিয় কবি, বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবি আল-মাহমুদ বলেন, জনাব আব্বাস আলী খানের স্মৃতি সাগরের ঢেউ বই খানি পড়ে এর অন্তর্নিহিত সাহিত্য রসে আপ্লুত হতাম। আমার ধারণা ছিল একজন রাজনৈতিক নেতার আত্মস্মৃতি স্বভাবতই জটিল রাজনৈতিক ঘটনায় ভরপুর থাকবে। কিন্তু পড়তে গিয়ে এক ধরণের ঔপন্যাসের গুণ আমাকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল। তাঁর ভাষা স্বচ্ছ। বক্তব্য ঋজু ও উপস্থাপনা নির্ভিক। এ বই আমাদের সাহিত্যে নতুন জীবন বোধে পাঠককে আকৃষ্ট করবে।

দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার সম্পাদক, বুদ্ধিজীবি ও শিক্ষাবিদ জনাব আবুল আসাদ বলেন, স্মৃতি সাগরের ঢেউ কালের একটি বাতায়ন। এ বাতায়নে অতীতের অনেক খানি দেখা যায়। বিশ শতকের প্রথমার্ধের ঝড়ো দিনগুলোর সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের একটা অন্তরঙ্গঁ চিত্র খান সাহেব তাঁর এ স্মৃতি চারনায় সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর স্বচ্ছ ও রসঘনো ভাষায় ইতিহাসের উপাদান গুলো গল্পের মত সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। রাজনীতিকের হাত থেকে আসা এ ধরণের সাহিত্যে একটা নতুন স্বাধ ও বিশিষ্টতা থাকে। খান সাহেবের স্মৃতি সাগরের ঢেউ-এ এ স্বাদ ও বিশিষ্টতা সকলেরই নজরে পড়বে।[১৭৩]

বার. বিদেশে পঞ্চাশ দিন

গ্রন্থখানি লেখকের বিদেশে ভ্রমণ কাহিনী সংক্রান্ত রচিত। গ্রন্থটি প্রকাশ কাল (২য়) ১৯৯৭ সাল। মোট পৃষ্ঠা ৯৫ ও মূল্য ৪৮ টাকা। লেখক ৮ আগষ্ট থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর মোট ৫০ দিন ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ক্যানাডা ও ফ্রান্স সফর করেছিলেন। এ দীর্ঘ সফরে তিনি ঘুনেধরা পাশ্চত্য সভ্যতা, সংস্কৃতি, সমাজ ও

---

১৭১. আব্বাস আলী খান, *স্মৃতি সাগরের ঢেউ*, পৃঃ ৫-৮; নাজমুস সায়াদাত সম্পাদিত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃঃ ৩৬৫-৩৬৭।

১৭২. তদেব, পৃঃ ৩-৪

১৭৩. নাজমুস সায়াদাত সম্পাদিত, *আব্বাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃঃ ৩৬৮।

পারিবারিক ব্যবস্থা গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করে ছিলেন, সেই পর্যবেক্ষণই তিনি পাঠক সমাজে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি সেখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামের প্রতি যে অদম্য আকর্ষণ রয়েছে তারও একটা ধারণা এ বইটিতে উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে তিনি আমেরিকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে বলেছেন, আমেরিকা শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক থেকে উন্নত নয় বরং একটি ধনী দেশ ও স্বাধীন দেশ। স্বাধীন ভাবে সবকিছু করার ও বলার সুযোগ সেখানে রয়েছে এবং নির্বিঘ্নে জীবন উপভোগ করার সকল উপায় উপকরণ সেখানে বিধ্যমান। তাই যুব সমাজের মোহ মস্কো পিকিং বেজিং থেকে ওয়াশিংটনের প্রতি বেশি রয়েছে।[১৭৪] দেশটির অবকাঠামো বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক উল্লেখ করেন ছোট বড় পঞ্চাশটি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত আমেরিকা। বৃটেন থেকে ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে এবং ১৯৮৯ সালে এক নতুন সংবিধানের মাধ্যমে একটি ফেডারেল ইউনিয়নের অধীন হয়। ২৪ কোটি লোকের বসবাস আমেরিকা মুলত: নদ-নদী ও হ্রদের দেশ। বয়স্কদের মধ্যে ৯৯.৫ ভাগ লোক শিক্ষিত। দেশটিতে অঢেল প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। বিশেষ করে স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া-পেট্রল, প্রাকৃতিক গ্যাস-ফসফেট, সীসা, লোহা, সিমেন্ট ও পাথর রয়েছে। শুধু তাই নয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এবং যুদ্ধের জন্য আধুনিক অস্ত্র নির্মাণেও আমেরিকা সর্বাগ্রে রয়েছে। বস্তুগত দিক দিয়ে উন্নত, সমৃদ্ধশালী ও ধনাঢ্য দেশ হলেও সেখানে বেকারত্ব প্রকট। তবে আমেরিকানদের সবচেয়ে বড় সংকট তাদের নৈতিক অবক্ষয়। সমকামিতাসহ চরম যৌন অনাচার, মাদকাসক্তি এবং এইডসের মতো দুরারোগ্য ব্যধি জাতি সত্তাকে ঘুনের মতো খেয়ে ফেলেছে।[১৭৫] এ দীর্ঘ ৫০ দিনে লেখক যে ৪ টি দেশ ভ্রমণ করেছেন "বিদেশে পঞ্চাশ দিন" গ্রন্থে সে বিষয় গুলি উল্লেখ করেছেন তার একটা সূচীপত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো:সম্মেলনের দাওয়াত, কেনেডি বিমান বন্দরে, ম্যারিনা অজিলভা, রোড আইল্যান্ড যাত্রা, সম্মেলনে ভাষণ, রাতে ডিনার, লন্ডন যাত্রা, আমেরিকায় দ্বিতীয় বার, ওয়াশিংটন যাত্রা, একটি ঘটনা, সম্বর্ধনা সভা, প্রবাসী প্রকৌশলীদের প্রদত্ত সম্বর্ধনা, সন্ধার কর্মসূচী, ন্যাশনাল এয়ার স্পেস মিউজিয়াম, ভয়েস অব আমেরিকা, জেফার্সন মেমোরিয়াল, ইহুদীদের সম্পর্কে আমেরিকার মনীষীগণ, ক্যানাডয়ে কয়েক দিন, নিয়াগারা ফসল, এক জোড়া মানুষ, আমেরিকায় তৃতীয় বার, হেনরী ফোর্ড মেমোরিয়াল, কানাডায় দ্বিতীয় বার, কইমাছ, ইনসমনিয়া, বিদায় কথাটি, কানাডার কথা, নিউইয়ার্কে গণ সম্বর্ধনা, ড. রাও এর চেম্বারে, সুন্নীদের বাসায়, শুক্রবার ১৫ই সেপ্টেম্বর, নিউইয়ার্কে কাঁঠাল, লন্ডনের যাত্রী, প্যারিসে দেড়দিন, আইফেল টাওয়ার, প্যারিসের কেন্দ্রীয় মসজিদে, আলীজাহ মুহাম্মদ, মুহাম্মদ আলী ক্লে।[১৭৬]

---

১৭৪. তদেব, পৃ: ৩৬৭-৩৬৮।

১৭৫. আববাস আলী খান, *বিদেশে পঞ্চাশ দিন* (ঢাকা: সৌমী প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রী:), পৃ: ভূমিকা-৩।

১৭৬. আববাস আলী খান, *বিদেশে পঞ্চাশ দিন*, পৃ: ভূমিকা-৪; নাজমুস সায়াদাত সম্পাদিত, *আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৩৭০-৩৭১।

তের. যুক্তরাজ্যে একুশ দিন

এটি আব্বাস আলী খানের আরো একটি ভ্রমণ কাহিনী সংক্রান্ত রচনা গ্রন্থ। এটি ১৯৮৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। আধুনিক প্রকাশনী বইটি প্রথম প্রকাশ করে। বইটির বিনিময় মূল্য ২৪ টাকা মাত্র। যুক্তরাজ্যে সববাস রত বাংলাদেশী মুসলিম কমোনিটির আহবানে তিনি সেখানে যান এবং সেখানে দীর্ঘ ২১ দিন থাকা অবস্থায় তাদের দেয়া বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করেন। পাশা-পাশি তিনি যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করেন তার উপর ভিত্তি করে গ্রন্থ খানি রচিত।[১৭৭] যুক্তরাজ্যে তাঁর সফর সূচীর একটি বিবরণ নিম্নে তুলে ধলা হলো: যাত্র শুরু, বোম্বে বিমান বন্দরে, এথেন্সে, হিথ্রো বিমান বন্দরে, কার্লাইল যাত্রা, ফসিস সম্মেলনে ভাষণ, গ্লাসগো রওনা, প্রমোদ ভ্রমণে লেক-কেট্রিন, মুসলিম স্কুল ট্রাষ্ট ও দাওয়াতুল ইসলাম অফিস, বৃটিশ মিউজিয়াম, বৃটিশ লাইব্রেরী, বামিংহাম ভ্রমণ, লিষ্টার ভ্রমণ, মানচেষ্টার ভ্রমণ, পানের আয়োজন, বুষ্টন ভ্রমণ, হাউস অফ কমন্স, মুসলিম এডুকেশন ট্রাষ্ট ও ইম্প্যাকট অফিস। ইসলামিক কালচার এণ্ড এডুকেশন ট্রাষ্ট, ম্যাডাম তুসাউদের মমিঘর, লণ্ডন প্লানেটারিয়াম, নরউইচ ভ্রমণ, নও-মুসলিম ইউসুফ ইসলাম, ইষ্ট লণ্ডন মসজিদে ভাষণ, আফগান প্রেস এজেন্সি, লণ্ডন থেকে বিদায়।[১৭৮] সুতরাং আববাস আলী খানের রচিত গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনার মাধ্যমে তাঁর জ্ঞানের গভীরতার প্রমান পাওয়া যায়।

---

১৭৭. নাজমুস সায়াদাত সম্পাদিত, *আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম*, পৃ: ৩৭১।
১৭৮. তদেব।

উপসংহার

উপসংহার

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুর আ'লামিনের জন্য যার একান্ত মেহেরবানীতে আমি আমার এ গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি যিনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পথ দেখিয়েছেন।

ইসলাম সকল মানুষের বাস্তবমুখী জীবনের পথ নির্দেশক। হযরত মুহাম্মদ (সা), খোলাফায়ে রাশেদীন এবং যুগে যুগে তাদেরই অনুসারী মুমিনগণের বাস্তব অনুসরণের মাধ্যমে ইসলাম কালজয়ী আদর্শ হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। মূলতঃ ইসলামের মৌলিক আকিদা ও মানবতাবাদী নীতি-আদর্শ ও দায়িত্ববোধ তাঁদেরকে আল্লাহ প্রেম, অধ্যাবসয়, কঠোর পরিশ্রম ও মানবকল্যাণে নিজেদেরকে উৎসর্গিত হতে অনুপ্রাণিত করেছে। এ পথই প্রতিটি মুমিনের অনুসরণীয় আদর্শিক পথ। যুগে যুগে সত্যাশ্রয়ী মুমিনগণ পথহারা মানুষকে এ পথে আহবান জানিয়েছেন। আববাস আলী খান সেই আহবানকারীদের মধ্যে অন্যতম।

খান সাহেব ছিলেন বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি। তিনি এ দেশের লক্ষ লক্ষ ইসলামী জনতার মহান শিক্ষকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে সত্যিকার আধ্যাত্মিকতা বা তাজকিয়ায়ে নফসের দাবী পূরণে পূর্ণভাবে সক্ষম ও সহায়ক মনে করেই তিনি মনে প্রাণে ইসলামী আন্দোলনকে গ্রহণ করেছিলেন। ব্যাপক পড়া-শুনা ও গবেষণার পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেকে ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করে রাসূল (সা) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর আদর্শের অনুসারী হয়ে দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের আরাম আয়েশকে পরিহার করে আখেরাতমুখী জীবন গঠনে স্বচেষ্ট ছিলেন। নানা ঘাত-প্রতিঘাত, চড়াই উৎরাই সত্ত্বেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আন্দোলনের ময়দানে অটল ও অবিচল থাকতে সক্ষম হন।

আববাস আলী খান একজন সত্যনিষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সুসাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও যোগ্য সংগঠক ছিলেন। বিশেষ করে তাঁর চিন্তা-চেতনা ও দর্শন বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর বলিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে তিনি ইসলাম ও গণতন্ত্রের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাছাড়া আশির দশকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন এবং কেয়ারটেকার আন্দোলনে বলিষ্ট ভূমিকা রাখার কারণে স্বৈরশাসক কর্তৃক কারাবরণ সহ অনেক নির্যাতন অকপটে সহ্য করেছেন। শুধু তাই নয়, রাজনীতির মত

জটিল ও সংকটাপন্ন অঙ্গনে কাজ করলেও গবেষণা ও সামাজিক কর্মকান্ডে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর এ বিশাল কর্মময় জীবনের ইতিবৃত্ত সঠিক ভাবে এবং ব্যাপক ভাবে বর্ণনা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তবুও আমাদের স্বল্প জ্ঞান দিয়েই আমরা এ কাজে আত্মনিয়োগ করেছি এই ভেবে যে, আমাদের আলোচনা দ্বারা পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন এবং আববাস আলী খানের আদর্শ ধারণ করতে অনুপ্রাণিত হবেন। তদুপরি এ ধরণের একজন মহান ব্যক্তিত্বের কর্মময় জীবন সর্বোতভাবে সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

আববাস আলী খান আজ দুনিয়াতে নেই। তিনি এ দেশের মাটিতে শায়িত আছেন কিন্তু তাঁর লেখনির দ্বারা সারা বিশ্বের ইসলাম প্রিয় মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। সর্বপরি তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যোগ্য লোক তৈরীর কাজ সম্পন্ন করেছেন, যারা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় পারদর্শী। আমরা তাঁর এ বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের বিশেষ করে শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তাধারা, আদর্শ ও সমাজকল্যাণ মূলক কর্মকাণ্ডের একটি সঠিক তথ্য যথাসম্ভব নির্ভুল সূত্র হতে আহরণ করে যাচাই বাছাই পূর্বক এ অভিসন্দর্ভে সন্নিবেশিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমরা আশা করি এ গবেষণা কর্মটি আরো অনেক গবেষকের এ কাজে আত্ম নিয়োগ করার সুযোগ করে দিবে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, আববাস আলী খান প্রকৃত পক্ষে স্বীয় মেধা, মনন, সৃজনশীল ও আদর্শিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অনাগত মানব সভ্যতা ও সমাজের জন্য তাঁর সুমহান কীর্তি রেখে গেছেন এবং লেখনি ও বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁর দর্শন ও চিন্তাধারাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। পাঠক যদি তাঁর চিন্তাধারা ও দর্শনকে গ্রহণ করে, তাহলে তাঁর নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ সাধিত হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুণ এবং অনিচ্ছা সত্ত্বে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকলে তা ক্ষমা করে দিন। আমীন!

গ্রন্থপঞ্জী

গ্রন্থপঞ্জী

আল-কুর'আনুল কারীম

আববাস আলী খান — ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাঙ্খিত মান, ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দ।

আববাস আলী খান — মাওলানা মওদূদী একটি জীবন একটি ইতিহাস, ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ।

আববাস আলী খান — জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

আববাস আলী খান — বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৪র্থ প্রকাশ, ২০০২ খ্রীষ্টাব্দ।

আববাস আলী খান — জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

আববাস আলী খান — স্মৃতি সাগরের ঢেউ, ২য় সং, ঢাকা: বই বিতান প্রকাশনী, ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ।

আববাস আলী খান — যুক্তরাজ্যে একুশ দিন, ঢাকা: আল ইহসান প্রকাশনী, ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

আববাস আলী খান — বিদেশে পঞ্চাশ দিন, ঢাকা: শৌমী প্রকাশনী, ২য় সং, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

আববাস আলী খান — মৃত্যু যবনিকার ওপারে, ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, ৬ ষ্ঠ সং, ২০০১ খ্রীষ্টাব্দ।

আববাস আলী খান — মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান, ঢাকা: সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

আববাস আলী খান — জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস সংক্ষিপ্ত, ঢাকা: সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ৩য় সং, ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।

আববাস আলী খান — ইসলামী বিপ্লব একটি পরিপূর্ণ নৈতিক বিপ্লব, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সং, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

আববাস আলী খান — একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণ:তার থেকে বাঁচার উপায়, ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, ৪র্থ প্রকাশ, ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ।

আববাস আলী খান — ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দ।

আববাস আলী খান — ঈমানের দাবী, ঢাকা: বিশ্বতথ্য কেন্দ্র, ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দ।

আববাস আলী খান — ইসলামী আন্দোলন ও তার দাবী, ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।

অলি আহাদ — জাতীয় রাজনীতি, ১৯৪৫-৭৫, ঢাকা: সাইদ হাসান প্রকাশক, তা. বি.।

আইয়ুব, মিয়া মুহাম্মদ, ড. — বাংলাদেশ পরিক্রমা, ঢাকা: ইউনিভার্সাল বুক এজেন্সী , ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ।

আকবর উদ্দীন অনুদিত — বাংলার ইতিহাস, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম সং, ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দ।

আনসার আলী, এস. এম. — বাড়ীর পাশে আরশী নগর, জয়পুরহাট: ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।

আবু জাফর, অধ্যাপক	মহানবীর (সা) মহাজীবন, ঢাকা: পালাপদল পাবলিকেশন্স, ২০০২ খ্রীষ্টাব্দ।
আবুল আ'লা সাইয়েদ, মওদূদী	ইসলামী বিপ্লবের পথ, ঢাকা: খায়রুল প্রকাশনী , ২০০১ খ্রীষ্টাব্দ।
আবুল আ'লা সাইয়েদ, মওদূদী	আল্লাহর পথে জিহাদ, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৪ সং, ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ।
আবুল আ'লা সাইয়েদ, মওদূদী	কুর'আনের মৌলিক চারটি পরিভাষা, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ৯ম প্রকাশ, ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ।
আবুল আ'লা সাইয়েদ, মওদূদী	জামায়াতে ইসলামীর উনিশ বছর, ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রচার বিভাগ, ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দ।
আবুল কালাম পাটয়ারী, ড.	রাসূল (সা)-এর দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম, কুষ্টিয়া: আল হেলাল পিন্টিং প্রেস, ২০০২ খ্রীষ্টাব্দ।
আবুল ফজল হক, ড.	বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ, ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ।
আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, মাওলানা	জামায়াতে ইসলামী বিরোধীতার অন্তরালে, ঢাকা: খেলাফাত পাবলিকেশন্স, ৫ম প্রকাশ, ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ ।
আবুল ফজল জামালউদ্দীন ইব্ন মানযূর	লিসানুল আরব, বৈরুত: দারুস সাদির, তা. বি.।
আনোয়ার হোসেন, সৈয়দ	বঙ্গবন্ধু : নেতা ও নেতৃত্ব, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ।
আনোয়ারুল ইসলাম, এম. প্রফেসর	জিহাদের গুরুত্ব ও শহীদের মর্যাদা, রাজশাহী: ইসলাম প্রকাশনা, ২০০১ খ্রীষ্টাব্দ।
আসাদ, আবুল	একশ বছরের রাজনীতি, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি:, ২য় সং, ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দ।
আবদুস শাকুর, অধ্যক্ষ আ. ন. ম.	বাংলা ভাষায় মাওলানা মওদূদী রহ: চর্চা ও আববাস আলী খানের অবদান, চট্রগ্রাম: আল আকাবা প্রকাশনী, ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।
আব্দুস শহীদ নাসিম	আববাস আলী খান স্মারক গ্রন্থ মৃত্যুহীন প্রাণ, ঢাকা: সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ১৯৯৯খ্রীষ্টাব্দ।
আব্দুল করিম	বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ।
আকরাম খাঁ, মো:	মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ঢাকা: আজাদ অফিস, ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ।
আব্দুর রহীম, ড.	বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০১ খ্রীষ্টাব্দ।
আব্দুল ওয়াহাব, মুহাম্মদ সম্পাদিত	এ শতকে ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন, বগুড়া: স্টুডেন্ট ওয়েল ফেয়ার প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।
আব্দুল মা'বুদ, মুহাম্মদ	আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।
আব্দুল হাকিম খান বাহাদুর	বাংলা বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ।
আব্দুল হাকিম খান বাহাদুর	বাংলা বিশ্বকোষ,৩য় খণ্ড, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ।
আব্দুল হক (সন্ধা) মুহাম্মদ.	এ শতকের ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন, বগুড়া: স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার প্রকাশনী , ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।
আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য সম্পাদিত	শিশু বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৯৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।
আব্দুল্লাহ আল-মুতি ও অন্যান্য সম্পাদিত	শিশু বিশ্বকোষ, ঢাকা: বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

আব্দুর রহমান আল যাজায়েরী — কিতাবুল ফিকহে আলাল মাযাহেবিল আরবা, ১ম খণ্ড, কায়রো: আল মাকতাবাতুস সাকাফী, ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ।

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ — ইসলামে হজ্জ ও ওমরা, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন, ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ।

ইব্‌ন খালদুন — আল-মুকাদ্দিমা, বৈরুত: দারুল কলম, ৪র্থ সং, ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ।

ইব্‌ন হিশাম, অনুবাদ: আকরাম ফারুক — সীরাতে ইবনে হিশাম, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০২ খ্রীষ্টাব্দ।

ইন্নাস আলী, ড. — বাংলার সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকা: কনফিডেন্ট পাবলিকেশন্স প্রা: লি:, ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ।

ইয়াহিয়া আখতার, মুহাম্মদ — রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিকীকরণ: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, ঢাকা: নিবেদন প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ।

ইয়াকুব আলী, এ. কে. এম. ড. — বরেন্দ্র অঞ্চলে মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্য, ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০০২ খ্রীষ্টাব্দ।

ইউসুফ আলী, মোহাম্মদ, অধ্যাপক — ইসলামী বিপ্লব সাধনে সংগঠন, ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, ২০০১ খ্রীষ্টাব্দ।

ইউসুফ ইসলাহী, মাওলানা — আসান ফেকাহ, ২য় খণ্ড, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ।

ইসমাইল হোসেন — বিশ্ব নবীর পরিচয়, ঢাকা: রশিদ বুক হাউজ, ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ ।

এমাজ উদ্দীন আহমেদ, ড. — রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, ঢাকা: বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লি:, ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ।

ওয়ালী উল্লাহ, মুহাম্মদ — আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ৩য় সং, ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ।

কাইয়ুম, আব্দুল ও অন্যান্য — সফল যারা কেমন তারা, ঢাকা: সম্প্রীতি পাবলিকেশন্স, ২০০২ খ্রীষ্টাব্দ।

খতীব আত্-তাবরিযমী — মিশকাতুল মাসাবীহ, করাচী : নূর মুহাম্মদ লাইব্রেরী, তা. বি.।

গোলাম আযম, অধ্যাপক — জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য, ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দ।

গোলাম আযম, অধ্যাপক — পলাশী থেকে বাংলাদেশ, ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, ৯ম সং, ২০০২ খ্রীষ্টাব্দ।

গোলাম আযম, অধ্যাপক — স্টাডি সার্কেল, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দ।

গোলাম আযম, অধ্যাপক — রুকনিয়াতের দায়িত্ব, ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ।

গোলাম আযম, অধ্যাপক — বাইয়াতের হাকিকাত, ঢাকা: আল আজমী পাবলিকেশন্স, ৪র্থ সং, ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ।

গোলাম আযম, অধ্যাপক — জীবনে যা দেখলাম, ১ম খণ্ড, ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশনী, ২০০২ খ্রীষ্টাব্দ।

গোলাম আযম, অধ্যাপক — জীবনে যা দেখলাম, ২য় খণ্ড, ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ ।

গোলাম আযম, অধ্যাপক — বাংলাদেশের রাজনীতি, ঢাকা: আল আযমী পাবলিকেশন্স, ৩য় সং, ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দ।

গোলাম আযম, অধ্যাপক — কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি উদ্ভাবন, প্রস্তাবনা ও আন্দোলন, ঢাকা: আল আযমী পাবলিকেশন্স, ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ ।

গোলাম হোসাইন সলিম — রিয়াজ-উস-সালাতীন, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম সং, ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দ।

জয়নুল আবেদীন, অধ্যাপক এস এম — বাংলাদেশের রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থা (খ্রিষ্ট পূর্ব ৬০০ থেকে ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ), ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ।

দোহা, এস. এম. — জিয়াউর রহমান ও জাতীয়তাবাদ, ঢাকা: হিমি বুকস এণ্ড বুকস, ২০০২ খ্রীষ্টাব্দ।

নাজির আহমদ, এ কে এম — ইসলামী আন্দোলনের তিন প্রথিকৃত, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ।

নাজমুস সায়াদাত সম্পাদিত — আববাস আলী খান জীবন ও কর্ম, ঢাকা : প্রফেসরস পাবলিকেশন্স, ২০০৬ খ্রীষ্টাব্দ।

নূর-উল-ইসলাম, মোস্তফা — সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, ঢাকা: বাংলা একাডেমী , ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ।

নূরুল ইসলাম, মো: সম্পাদিত — পঁচিশ বছর পুর্তি স্মারক প্রেরণার মিছিল, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির প্রকাশনা বিভাগ, ২০০২ খ্রীষ্টাব্দ।

নীহার রঞ্জন রায়, ড. — বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব, কলিকাতা: দে-জ পাবলিশিং, ২য় সং, ১৪০২ বাং সন।

ফজলুর রহমান, মো: আশরাফী মাওলানা — বিশ্বের মনীষীদের কথা, ১ম খণ্ড, ঢাকা: আর, আই, এস পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।

বেলাল হোসেন, মোহাম্মদ, ড. — 'উলুমুল হাদীস, রাজশাহী: সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ।

বিজয় কিষ্ণ বণিক, ড. — শের-ই-বাংলা একটি যাদু ঘর, ঢাকা: মা মণি প্রিন্টার্স, ২০০২ খ্রীষ্টাব্দ।

রফিকুল ইসলাম, এস. এম. — সেন যুগে বাংলার সামাজিক জীবন, রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, P.H.D ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত ইতিহাস বিষয়ক গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

রমেশ চন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ, ১ম খণ্ড, কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টাস এণ্ড পাবলিশার্স প্রা: লি:, ৯ম সং, ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দ।

রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ড. — বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্য যুগ, কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স প্রা: লি:, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।

রঈস উদ্দীন খান, এ কে এম — বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা, ঢাকা: খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ৮ম সং, ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দ।

রফিকুল ইসলাম (পিএসসি) মেজর — শেখ মুজিব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম, ঢাকা: কাকুলী প্রকাশনী, ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

রহীম, এম এড. — বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ।

রহীম, এম. এ ও অন্যান্য — বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ৭ম সং, ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দ)।

শফিকুল্লাহ, মুহাম্মদ, ড. — 'উলুমুল-কুর'আন, ১ম খণ্ড, রাজশাহী: আল মাকতাবাতুশ শাফিয়্যাহ, ২০০১ খ্রীষ্টাব্দ।

শফিকুর রহমান, মো: — জাতীয় রাজনীতি শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।

শহিদুল ইসলাম, হাফিজ মাওলানা — আল-কুর'আন সংকলনের ইতিহাস, ঢাকা: আর. আই. এস. পাবলিকেশন্স, ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ।

মোহসিন, এ কে এম. ড. ও অন্যান্য সম্পাদিত — বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দ।

মতিউর রহমান নিজামী, মাওলানা — ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন, ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, ১৩ তম প্রকাশ, ২০০৪খ্রীষ্টাব্দ।

মাসুদ মজুমদার ও অন্যান্য সম্পাদিত — বঙ্গ ভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ, ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস কেন্দ্র, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

মান্নান তালিব, আব্দুল — বাংলাদেশে ইসলামের আগমন, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সং, ২০০২ খ্রীষ্টাব্দ।

হক চৌধুরী, আব্দুল — চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রুপরেখা, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দ।

মনসুর আহমদ, আবুল — বাংলাদেশের কালচার, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ৩য় সং, ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

মনসুর মুসা সম্পাদিত — বাঙলাদেশ, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১ম সং, ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

মুনতাসির মামুন সম্পাদিত — বঙ্গভঙ্গ, ঢাকা : সমাজ নিরক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ।

মাহফুজুল করিম, কে এম — পীর মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার রহ:-এর ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদান, চট্টগ্রাম: হোমল্যান্ড পাবলিকেশন্স , ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ।

মাযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক — বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপ্রথিক যারা, ১ম খণ্ড, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দ।

মাযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক — স্মৃতির পাতায় জননেতা আববাস আলী খান, ঢাকা : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ২০০২ খ্রীষ্টাব্দ।

মহিউদ্দীন আন্-নববী — রিয়াদুস সালেহীন, অনুবাদ: মান্নান তালিব, আব্দুল, ২য় খণ্ড, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ।

মিরাজ উদ্দীন আহমদ — জননেত্রী শেখ হাসিনা, ঢাকা : ভাস্কর প্রকাশনী, ২০০০খ্রী: ।

মোল্লা জীওয়ান — নূরুল আনোয়ার, দেওবন্দ: কুতুব খানা রহীমিয়্যাহ, তা. বি.।

মোসলে উদ্দীন আহমদ, খান — মহানবীর সীরাত কোষ, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

সাঈদ-উর-রহমান — পূর্ব বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,

সা'দী আবু জাইয়্যেব — আল-কামুসুল-ফিকহী, করাচী: ইবাদাতুল কুর'আন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়্যাহ, তা. বি.।

সুধীর কুমার মিত্র — হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ, কলিকাতা: মিত্রানী প্রকাশন, ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ।

সিরাজুল হক, ড. সম্পাদিত — বাংলাদেশের ইতিহাস, (১৭০৪-১৯৭১), ৩য় খণ্ড ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দ।

সিদ্দিক হাসান, নবাব — হুসুলুল মামূল, কুস্তানতুনীয়া: মাতবা'তুল জাওয়াহির, ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দ।

হারুন-অর-রশীদ, ড. — বাংলাদেশের রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০), ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০১ খ্রীষ্টাব্দ।

হাসান মোহাম্মদ, ডক্টর — জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতৃত্ব,সংগঠন ও আদর্শ, ঢাকা: একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দ।

হাসান মোহাম্মদ, ডক্টর — জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র , ২০০১ খ্রীষ্টাব্দ।

হাসান মোহাম্মদ, ডক্টর — ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা ও বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৭২-১৯৮৬), চট্টগ্রাম: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, কলা, v-3, ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দ।

হামজা আলভী — পাকিস্তান ও ইসলাম : জাতি সত্তা মতাদর্শ ও রাষ্ট্র, সমাজ নিরক্ষণ, নভেম্বর, ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ — সদস্য সম্মেলনের প্রস্তাব, ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ।

শফিউল আলম ভুঁইয়া, মুহাম্মদ — আরকানুল ঈমান, ঢাকা: ব্রাদার্স পেপার এণ্ড পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।

মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত্-তিরমিযী — আল-জামি'উত্-তিরমিযী, দিল্লী: আমিন কোম্পানী, তা. বি.।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, — সহীহ আল-বুখারী, অনুবাদ: আবুল আব্বাস যইনদ-দীন আহমদ যবীদরী, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ — সংগঠন পদ্ধতি, ঢাকা: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশনা বিভাগ, ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ।

মোস্তাফা আস সিবাঈ,ড. — আস্-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহু ফীত তাশরী'ঈল ইসলামী, বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল ইসলাম, ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

আব্দুল হক ফরিদী, আ ফ ম ও অন্যান্য সম্পাদিত — সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ।

রাওয়াস কাজালী, মুহাম্মদ, ড. — মু'জামুল লুগাতিল ফুকাহা, করাচী: ইবাদাতুল কুরআ'ন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়্যাহ, তা. বি.।

জহিরুল ইসলাম, মুহাম্মদ — ছাত্র সংবাদ, ক্যাম্পাস পরিচিতি, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ সংখ্যা, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

শফিকুল ইসলাম মাসুদ, মু: — ছাত্র সংবাদ, জুলাই সংখ্যা, ২০০৪ খ্রী।

সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত — বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, ১ম খণ্ড, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ।

সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত — বাংলাপিডিয়া জাতীয় জ্ঞানকোষ,২য় খণ্ড, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ।

সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত — বাংলাপিডিয়া জাতীয় জ্ঞানকোষ, ১০ম খণ্ড, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ।

সম্পাদিত — ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ।

প্রসপেকটাস — তা'লীমুল ইসলাম ট্রাস্ট, জয়পুরহাট: ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।

ফজলুর রহমান, মো: ও আব্দুল কাইয়ুম সম্পাদিত — সফল যারা কেমন তারা, ঢাকা: সম্প্রীতি পাবলিকেশন্স, ২০০২ খ্রীষ্টাব্দ।

মাহমুদা খাতুন — মুসলমানদের আগমনে বাংলার সামাজিক রূপান্তর একটি পর্যালোচনা, গবেষণা প্রত্রিকা, ২য় সংখ্যা, কলা অনুষদ,রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

সেলিম উদ্দীন, মু: সম্পাদিত — ছাত্র সংবাদ, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির দাওয়াতী কার্যক্রম বিভাগ, ২ নভেম্বর সংখ্যা, ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ।

দৈনিক সংগ্রাম	৬ অক্টোবর, ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।
দৈনিক সংগ্রাম	৮ অক্টোবর, ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।
দৈনিক ইত্তেফাক	৬ অক্টোবর, ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।
পরিচিতি	বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা, সেপ্টেম্বর-২০০৬ খ্রীষ্টাব্দ।
শফিকুল ইসলাম, জি এম	ইসলাম প্রচারে হযরত শাহ সুলতান বলখী (রহঃ) এবং হযরত শাহ নিয়াত উল্লাহ রহঃ এর অবদান, রাজশাহীঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত এম. এ. অভিসন্দর্ভ, ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ।
Bangladesh Bureau of Statistics	Statistical Pocket Book of Bangladesh,1987, Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, 1988 .
Fazlur Rahaman	Islamic Methedology in History, Karachi: Central Institute of Islamic Research ,1965 .
Ghalam Azam, Professor	A Guide to Islamic Movement, Dhaka: Azami Pablication, 1968.
Jamat-e-Islami Bangladesh	Introducing Jamat-e-Islami Bangladesh,Dhaka : Publication Department of Jamat-e-Islami Bangladesh, 1981 .
Mazumder, R.C ede.	Histry of Bangale, Dhaka: University Dhaka, 1943.
Muhammad Ali, Mawlana	The Religion of Islam, Lahor: The Ahmediyyahh Anjuman Isha'at Islam, 1930.
Khurshid and Zafor Ishaq eds.	Islamic perspective :Studies honor of Mawlana Abul Ala Modudi, Leicester: U.K The Islamic Foundation , 1979 .
Kamaruzzaman, Muhammad	Islam and Democracy, Dhaka: Al-Falah Printing Press, 2005.
S.Hossian	Every day life in pall ampair, Dhaka: Asiatic Sosity of Pakistan, 1968.
Prospectus	Taleemul I slam Trust,Jaipurhat : 1984.

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

জাতির উদ্দেশ্যে রেডিও ও টেলিভিশনে ভাষণ

১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে রেডিও ও টেলিভিশনে প্রদত্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খানের ভাষণ।

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম

প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,

আসসালামু আলাইকুম। সর্ব প্রথম আমি সেই মহান আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো শুকরিয়া জানাই, যিনি আমাদেরকে স্বৈরশাসন উৎখাত করে নিজেদের মরযী অনুযায়ী সরকার গঠনের সুযোগ দান করেছেন। একটি কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবীতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সফল হওয়ায় সকল বিরোধী দল, জোট, ছাত্র, জনতা, শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষকসহ সকল পেশাজীবীকে আমি আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

স্বৈরশাসনের অবসান ও দেশবাসী ভোটাধিকার বহাল করার এ আন্দোলনে সফলতা অর্জনে যাদের ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে সম্ভব হয়েছে আজ আমি তাদের সবার কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। যাদের জীবনের বিনিময়ে এ সাফল্য এলো আল্লাহ পাক তাদেরকে আখিরাতে সফল করুন। পরবর্তী সরকার তাদের পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করবেন বলে আমি আশা করি।

কেয়ারটেকার সরকারের দাবী

১৯৭৩ সাল থেকে যতবার এ দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, ক্ষমতাসীন দলীয় সরকারের পরিচালনায় হওয়ায় তা সত্যিকার অর্থে নিরপেক্ষ ও অবাধ হয়নি বলে বিরোধী দল সব সময়ই অভিযোগ করেছে। আমাদের সৌভাগ্য যে, এবারই প্রথম একটি নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন হতে যাচ্ছে। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার জন্য দেশবাসীর নিকট ওয়াদাবদ্ধ। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ১৯৮৩ সালের ২০শে নভেম্বর বায়তুল মোকাররমের এক সমাবেশে সর্ব প্রথম জামায়াতে ইসলামীই এ দাবী জানিয়েছিল। পরে এ দাবী জাতীয় দাবীতে পরিণত হয়। আমাদের সে ঐতিহাসিক দাবী পূরণ হওয়ায় আল্লাহর প্রতি গভীর শুকরিয়া জানাই।

আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে সর্বস্তরের সরকারী ও আধা-সরকারী কর্মচারীগণ আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার সাথে একাত্ম হয়ে জনগণের বিজয়কে ত্বরান্বিত করায় তাদের সবাইকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানানো আমি কর্তব্য মনে করি। তারা এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, তারা জনগণেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রিয় দেশবাসী,

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের সাথে কয়েক দফা আলোচনায় আমার আস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। তিনি যে নির্বাচন কমিশন গঠন করেছেন তা সকল প্রকার প্রভাবমুক্ত থেকে নির্বাচন পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন বলে আমি আশা করি। নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সবার আন্তরিক প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে। রিটার্নিং অফিসার,

সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসারসহ নির্বাচনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত সরকারী কর্মচারীগণ পূর্বের ন্যায় অন্যায় চাপের সম্মুখীন হবার কোন সংগত কারণ এখন বিদ্যামান নেই।

আবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক দল ও তাদের মনোনীত প্রার্থীদের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইতিপূর্বে দেখা গিয়েছে যে, সরকার দলীয় প্রার্থীদের মতো অন্যান্য অনেক প্রার্থী ভোট কেন্দ্রে সন্ত্রাসের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। প্রার্থীরা মাস্তান নিয়োগ করে ব্যালট ডাকাতির ব্যবস্থা না করলে সন্ত্রাসের কোন কারণই থাকতে পারে না।

সবচেয়ে বড় কথা হলো ভোটদাতাদেরকে নিজের মরযী অনুযায়ী ভোট দেবার সুযোগ দান। 'আমার ভোট আমি দেব' এবং 'যাকে ইচ্ছা তাকে দেব'- ভোটারদের এ অধিকার বহাল করার উদ্দেশ্যেই যদি আমরা আন্দোলন করে থাকি তাহলে ভোট কেন্দ্রে সন্ত্রাস ও জালভোট দেবার চেষ্টা এবং ব্যালট ডাকাতি রুখতে হবে। আপনারা যাতে নিজেদের ভোট নিজেরা দিতে পারেন সে বিষয়ে সতর্ক ও সজাগ থাকবেন। এ অধিকারে কেউ বাধা দিলে তাদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আপনাদেরকেই সাহসী ভূমিকা পালন করতে হবে। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে আমি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছি যে, ঐসব অপকর্মকে আমরা ঈমান ও নৈতিকতার সম্পূর্ণ বিরোধ মনে করি।

যেমন করেই হোক ক্ষমতা দখল করাই যাদের উদ্দেশ্য তারাই সন্ত্রাস ও জালভোটের আশ্রয় গ্রহণ করে। জামায়াতে ইসলামী রাসূল (সা) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ কায়েমের উদ্দেশ্যেই ক্ষমতা হাতে নিতে চায়। তাই জনগণ যাতে তাদের ভোটাধিকার স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারে সে জন্য জামায়াত জনগণের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করবে।

আইন-শৃংখলা রক্ষার গুরুত্ব

আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত তাদের আন্তিরিক ও যোগ্য ভূমিকার উপরই নিরপেক্ষ নির্বাচন নির্ভর করে। যারা আইন নিজের হাতে তুলে নেয় তাদেরকে দমন করতে ব্যর্থ হলে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান কিছুতে সম্ভব হবে না। রাজনৈতিক দলসমূহ যদি নির্বাচন বিধি ও রাজনৈতিক আচরণবিধি নিষ্ঠার সাথে পালন করে তাহলে আইন-শৃংখলা রক্ষা করা অবশ্যই সহজ হবে। আইন-শৃংখলার স্বার্থেই অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার হওয়া অপরিহার্য। অবৈধ অস্ত্রধারীরা রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন প্রার্থীদের পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে তাদের অস্ত্র প্রয়োগের কোন সুযোগই থাকবে না। নির্বাচনে যে সব প্রার্থী সন্ত্রাসের আশ্রয় নিতে চায় তারাই অবৈধ অস্ত্রধারীদের অভিভাবক।

অবৈধ অস্ত্র কাদের কাছে আছে তা পুলিশের জানা থাকলেও রাজনৈতিক মুরব্বীদের ভয়ে পুলিশ তা উদ্ধার করতে সাহস পাচ্ছে না। নির্বাচনের পর ক্ষমতায় আসবে বলে নাকি কোন কোন দল পুলিশকে হুমকি দিচ্ছে। আমি জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিচ্ছি যে, অবৈধ অস্ত্র আপনারা নির্ভয়ে উদ্ধার করুন এবং অস্ত্রধারীরা যে দলেরই হোক তাদের গ্রেফতার করুন।

জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী উদ্দেশ্য

জামায়াতে ইসলামী এমন একটি সরকার গঠন করতে চায় যা আল্লাহর কুরআন, রাসূল (সা) এর সুন্নাহ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুযায়ী বাংলাদেশকে একটি পূর্ণাংগ কল্যাণ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলবে। বিশ্ব নবী ও তাঁর খলিফাদের পরিচালিত রাষ্ট্রের মতো আদর্শ ও শান্তিময় সমাজ বিশ্বে আজ পর্যন্ত কোথাও

কায়েম হয়নি। মানব রচিত আইন ও অসৎ নেতৃত্বই যাবতীয় অশান্তির মূল কারণ। রাসূল (সা) দীর্ঘ তের বছরে এক দল ঈমানদার, সৎ ও চরিত্রবান লোক তৈরী করেন। তাঁদের নিয়ে আল্লাহর আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনা করার কারণেই তিনি জনগণের সত্যিকার কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জামায়াতে ইসলামী তাঁরই অনুকরণে দীর্ঘদিন থেকে ঈমানদার, সৎ ও চরিত্রবান লোক তৈরী করার আপ্রাণ চেষ্টায় রত আছে।

এ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী যাদের মনোনয়ন দিয়েছে তাঁরা নিজে পদপ্রার্থী হয়নি। নির্বাচন প্রার্থী হিসাবে দরখাস্ত করার জন্য জামায়াতের পক্ষ থেকে আহবানও জানান হয়নি। জামায়াতই তাঁদেরকে মনোনয়ন দিয়েছে। আমি আশা করি জামায়াতের মনোনীত প্রার্থীগণ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন।

জামায়াতে ইসলামী টাকা ওয়ালা হওয়ার কারণে কাউকে মনোনয়ন দেয়নি। তাই জামায়াতের কর্মীগণ নিজেরা খরচ করছেন এবং কুপনের মাধ্যমে জনগণ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করার চেষ্টা করছেন। জামায়াত কুপনের সাথে 'ভোট চাই, নোটও চাই' শীর্ষক আবেদন পেশ করছে। যারা নির্বাচনে মোটা অংকের টাকা নিজেদের পকেট থেকে খরচ করে এবং টাকা ছড়িয়ে ভোট যোগাড় করে তারা নির্বাচিত হলে সুদ আসলে এ টাকা জনগণের সম্পদ থেকে উসল করবে-এটা সকলেই জানা কথা।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা যদি জামায়াতে ইসলামীর হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেন তাহলে জামায়াত কিভাবে দেশ ও জনগণের খেদমত করবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কর্মসূচী নির্বাচনী মেনিফেস্টো আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। জামায়াতে ইসলমী সরকার গঠন করলে প্রধান যে সাত দফা দায়িত্ব পালন করবে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার পর মেনিফেস্টো ভিত্তিক আর ও কিছু কথা পেশ করতে চাই।

আল্লাহর খলিফার দায়িত্ব পালন

জামায়াতে ইসলামী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ পাক প্রতিটি বস্তু ও জীবের রুবুবিয়াত বা লালন পালনের মহান দায়িত্ব পালন করছেন। আল্লাহর খলিফা হিসাবে মানব সমাজে তাঁর দায়িত্বের একাংশ পালন করার জন্যই রাষ্ট্র গঠন ও সরকার পরিচালনা প্রয়োজন। আল্লাহর বিধান জারী করার জন্যই রাসূল (সা) মদীনায় রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। আল্লাহর রচিত বিধানকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জারি করাই হলো খলিফার দায়িত্ব। এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্যই জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করতে চায়।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আপনারা জামায়াতে ইসলামীর হাতে ক্ষমতা অর্পন করলে জামায়াত সর্ব প্রথম জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাবে। ভাত, কাপড়, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থাই মানুষকে সত্যিকার মানুষ হিসাবে ইজ্জত ও নিরাপত্তা বোধ দান করে। তাই জামায়াতে ইসলামী প্রাকৃতিক সম্পদ, দেশের পুঁজি ও জনগণের শ্রম আল্লাহর আইন মতো কাজে লাগিয়ে এমন ইনসাফের সাথে ব্যবহার করবে যাতে কোন মানুষ ঐ সব মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত না থাকে। মানব সমাজের

জন্য এমন সরকারই আল্লাহ্ পছন্দ করেন। এ মহান দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে রাষ্ট্র ও সরকারের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এ দায়িত্ব পালন না করে নাগরিকদের উপর ইসলামী বিধান অনুযায়ী শাস্তি দেবার অধিকার সরকারের নেই। এ কারণেই কেউ অভাবের কারণে চুরি করেছে বলে প্রমাণিত হলে তাকে শাস্তি দেয়া ইসলামে নিষেধ।

এ বিরাট দায়িত্ব বাস্তবে পালন করার উদ্দেশ্যে দেশের অর্থনীতিকে জনকল্যাণ ভিত্তিক পরিকল্পনা অনুযায়ী পুনর্গঠন করা হবে।

ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক প্রগতিশীল অর্থনীতি মানেই হলো জনগণের প্রায়োজন পূরণে সক্ষম ইনসাফপূর্ণ ও শোষণহীন ব্যবস্থা। এর লক্ষ্য হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণ ও অপচয়কে সফলভাবে রোধ করা এবং সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির পীড়ন ও যুলুম থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করা। লাগামহীন অর্থনৈতিক আযাদী ভোগ করার পুঁজিবাদী নীতি এবং শোষণ থেকে মুক্তির দোহাই দিয়ে রাজনৈতিক দাসত্ব ও অর্থনৈতিক গোলামী কায়েমের সমাজতান্ত্রিক অপকৌশলের হাত থেকে বাঁচতে হলে ইসলামী অর্থনীতি চালু করা প্রয়োজন।

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অশুভ পরিণাম ও তিক্ত অভিজ্ঞতার পর জামায়াত এ দেশে ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করারই সঠিক মনে করে। নীতিগতভাবে ইসলামী বিধানের নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী মালিকানার অধিকার থাকবে। কিন্তু জনকল্যাণের দৃষ্টিতে কোন কোন শিল্প কারখানা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন থাকা প্রয়োজন সে বিষয়ে জাতীয় সংসদই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

জনগণের মৌলিক যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে ২৫ দফা সম্বলিত ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।

সরকারের দ্বিতীয় দায়িত্ব

দেশের স্বাধীনতার হেফাযত করা এবং দেশবাসীকে পরাধীনতার আশংকা থেকে মুক্ত রাখা সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। দেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা, সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা এবং বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা সরকারেরই কাজ। বাংলাদেশ এমন একটি বিরাট দেশ দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছে যে দেশটিতে উগ্র সাম্পদায়িক শক্তি দিন দিনই প্রাধান্য বিস্তার করছে।

বাংলাদেশ এ প্রতিবেশী দেশের জনগণের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও ঐ দেশের সরকারের আধিপত্যবাদী মনোভাবের দরুন তা বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এ অবস্থায় জামায়াত এমন একটি বলিষ্ট সরকার কায়েম করতে চায় যে কারো তাঁবেদার হতে প্রস্তুত নয় এবং সরকার সমান মর্যাদা নিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

এ লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যেই আমরা সশস্ত্র বাহিনীকে সর্বদিক দিয়ে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে চাই। পেশাগত যোগ্যতার সাথে সাথে তাদের মধ্যে ইসলামী জিহাদের চেতনা সৃষ্টি করাও প্রয়োজন মনে করি, যাতে তারা এ জাতির আযাদীর জন্য জীবন দেয়াকে উজ্জ্বত ও আখিরাতের সাফল্য মনে করে। জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে এ জাতীয় চেতনার ঐক্য ব্যতীত শুধু অস্ত্র ও সামরিক ট্রেনিং দ্বারা আযাদী রক্ষা অসম্ভব।

সশস্ত্র বাহিনীর সাহয্যক শক্তি হিসাবে জনগণ যাতে দেশ রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে পারে সে উদ্দেশ্যে ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সের সকল পুরুষকে নিম্নতর প্রতিরক্ষামূলক ট্রেনিং এবং ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সের সকল মহিলাকে শরিয়তের সীমারেখার মধ্যে আত্মরক্ষামূলক ট্রেনিং দেয়া হবে।

সরকারের তৃতীয় দায়িত্ব

রাষ্ট্রই হলো সংগটিত সমাজের চুড়ান্ত রূপ। রাষ্ট্র ও সরকার গঠনের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো সুশৃংখল সমাজ কায়েম করা যেখানে প্রত্যেকেই জান-মাল, ইজ্জত-আবরু ও যাবতীয় মানবাধিকারের পূর্ণ নিরাপত্তা ভোগ করবে। এ নিরাপত্তার অভাব দেখা দিলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তারই নাম নৈরাজ্য। নৈরাজ্য কথাটি দ্বারা একথাই প্রকাশ পায় যে, সেখানে কোন রাষ্ট্র বা সরকারের অস্তিত্ব নেই।

বৃটিশের গোলামী যুগে মানুষ যতটুকু নিরাপত্তা বোধ করত তাও এখন নেই। বিশেষ করে, বিগত স্বৈরশাসন কালে, যুলুম, অবিচার, শোষন, সন্ত্রাস ও নৈতিক উচ্ছৃংখলতা এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, রাজধানী ঢাকাতে পর্যন্ত নাগরিকদের জান-মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা নেই। আমরা সবাই যেন অস্ত্রধারী মাস্তানদের হাতে জিম্মী। প্রকাশ্যে খুন, ছিনতাই, লুটপাট, নারী অপহরণ ইত্যাদিতে যারা লিপ্ত আছে তারা দাপটের সাথে সর্বত্র বিচরণ করছে।

জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনের মাধ্যমে সৎ লোকের শাসন কায়েম করতে চায় যাতে সরকার 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন'-এর মহান দায়িত্ব পালন করতে পারে। সৎ লোকের সরকার গঠিত হলে প্রশাসন বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য হবে না এবং এ প্রশাসনই জনগণের জান, মাল ও ইজ্জত-আবরুর হেফাজত করতে সক্ষম হবে।

সরকারের চতুর্থ দায়িত্ব

আল্লাহ তায়ালা মানুষের চিন্তা, কথা ও কাজে যে উন্নত নৈতিক মান পছন্দ করেন জনগণকে সে মানে গড়ে তোলা ইসলামী সরকারের অন্যতম প্রধান কাজ। শৈশবকাল থেকে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় দুনিয়াবী যোগ্যতা বিকাশের সাথে সাথে সবাইকে উন্নত চরিত্রের নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা হবে। পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন ও সিনেমাসহ সকল গণ-মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে নাগরিকদের মধ্যে দেশপ্রেম, জনসেবা ও জাতি গঠনের উপযোগী বানাবার সাথে সাথে তাদের মনে পরকালে আল্লাহর দরবারে দুনিয়ার জীবনের জন্য জওয়াবদিহি করার চেতনা সৃষ্টি করা হবে। আখিরাতে জওয়াবদিহির এ চেতনাকে চরিত্র গঠনের মূল ভিত্তি বলে কুরআন পাকে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামী গণশিক্ষার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তার দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। একটি হলো জনগণের মন-মগজ ও চরিত্র গঠন, যাতে তারা আন্তরিকতা ও নিঃস্বার্থতার সাথে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতে পারে। আর একটি হলো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিককে তার রুচি, মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ দান করা, যাতে প্রত্যেকেই স্বনির্ভর হয়ে দেশের উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে।

জামায়াতে ইসলামী দেশ পরিচালনার সুযোগ পেলে এ দেশের বিরাট জনশক্তিকে জন সম্পদে পরিণত করবে। মানুষ শুধু পেট নিয়েই পয়দা হয় না। তার মন-মগজ ও দু'টো হাতকে উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে যোগ্য বানালে একজন মানুষ দশজনের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। দুনিয়ার বহুদেশে জনসংখ্যার

অভাব রয়েছে। এদশের জনশক্তিকে পরিকল্পিতভাবে কাজ শিখালে তারা বিদেশ থেকেও প্রচুর সম্পদ আহরণ করতে পারবে। বাংলাদশের তুলনায় কম প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও জাপান দুনিয়ার প্রধান কয়টি ধনী দেশের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের কোটি কোটি নারী ও পুরুষকে কাজ করার যোগ্য করে তুললে তারা এদেশকেও একটি ধনী দেশে পরিণত করতে সক্ষম হবে ইনশা-আল্লাহ।

সরকারের পঞ্চম দায়িত্ব

জনসংখ্যার অর্ধেকই মহিলা। আল্লাহ তায়ালা মানুষ হিসাবে নারী ও পুরুষকে সমান মর্যাদা দান করেছেন। নারী সমাজকে জাতীয় জীবনে যথার্থ ভূমিকা পালন করার উপযোগী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে তাদের জন্য পৃথক শিক্ষ কাঠামো গঠন করা হবে। নারীর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্বার্থে তাদেরকে নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে জীবিকা অর্জনের পূর্ণ সুযোগ দেয়া হবে।

আল্লাহর আইন সমাজে চালু না থাকায় নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে ইসলামী মূল্যবোধ বহাল নেই। তাই শরীয়তের সম্পূর্ণ বিরোধী যৌতুক প্রথা চরম সামাজিক ব্যধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শরীয়ত স্বামীর উপর স্ত্রীকে মোহর দেয়া ফরজ করে দিয়েছে। অথচ আজকাল মোহর আদায় না করে যৌতুকের নামে স্ত্রীর কাছ থেকেই স্বামী মোহর দাবী করছে। ইসলামের দৃষ্টিতে যৌতুক দাবী করা নির্লজ্জ যুলুম। এটা সাধারণ ভদ্রতারও চরম বিরোধী। পাত্র ও পাত্রী পক্ষ থেকে উপহার দেয়া একটা সৌজন্য ও মহব্বতের ব্যাপার। চাপ দিয়ে উপহার আদায় করা আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্টকারী একটি জঘন্য কুপ্রথা। আল্লাহর আইন চালুর মাধ্যমে মূল্যবোধের বিকাশ সাধন ব্যতীত নিছক সরকারী নির্দেশের সাহায্যে এ কুপ্রথা দূর করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

ইসলাম উত্তরাধিকারের যে অধিকার নারীকে দিয়েছে তা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম না করলে সঠিকভাবে বহাল হবে না। বিবাহ, তালাক, মীরাস, পরিবার ও সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে মহিলাদের যেসব অধিকার ইসলাম দিয়েছে তা থেকে বঞ্চিত থাকার দরুন নারী সমাজ আজ অবহেলিত। ইসলামী আইন জারি করে নারীদের ঐ সব অধিকার পূর্ণরূপে বহাল করা হবে।

সরকারের ষষ্ঠ দায়িত্ব

বাংলাদেশে হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও বিভিন্ন উপজাতির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সংখ্যালঘু নাগরিক সংখ্যাগুরু মুসলিম জনগণের সাথে অত্যন্ত সম্প্রীতির সাথে বসবাস করছেন। দেশের শাসনতন্ত্রে তাদের সর্ব প্রকার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া সত্ত্বেও তাদের অধিকারের প্রতি সংখ্যাগুরুদের সজাগ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য বলে জামায়াতে ইসলামী মনে করে। প্রতিবেশী দেশে মুসলিমদের উপর যত জুলুমই করা হোক না কেন এর জন্য এ দেশের হিন্দু নাগরিককে দায়ী করার কোন কারণ নেই। অন্য দেশের প্রতিশোধ এদেশে নেবার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। যারা এ জাতীয় কুচিন্তা করে তারা আসলেই অধার্মিক। কোন ধার্মিক মুসলমান এমন ইসলাম বিরোধী চিন্তা করে না। কত্মণ এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সা) সতর্ক করে বলেছেন যে, অমুসলিমদের উপর কোন জুলুম করা হলে তিনি জালিমদের বিরুদ্ধে আখিরাতে আল্লাহর দরবারে নিজেই মুকাদ্দামা দায়ের করবেন। তাই জামায়াতে ইসলামী সকল অমুসলিম ভাই-বোনদের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণ করা পবিত্র ঈমানী দায়িত্ব মনে করে।

সকাররের সপ্তম দায়িত্ব

সরকার পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরণের কাঠামো দুনিয়ায় প্রচলিত আছে। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টারী পদ্ধতি ও আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি বিশ্বে গণতান্ত্রিক সরকার কাঠামোর নমুনা হিসাবে স্বীকৃত। পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে বৃটিশ ক্রাউন (রাজা বা রাণী) শুধু শাসনতন্ত্রের অভিভাবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন, দেশ শাসন করেন না। সেখানে নির্বাচিত পার্লামেন্ট প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ পরিচালনা করে। বহুদেশে এ পদ্ধতি চালু থাকলেও বৃটিশ ক্রাউনের বিকল্প সব দেশে না থাকায় শাসনতান্ত্রিক জটিলতার আশংকা থেকে যায়।

আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি সে দেশের বিশেষ ইতিহাস ঐতিহ্যের সৃষ্টি। তাই ভিন্ন পরিবেশ ও ঐতিহ্যের দরুণ ঐ পদ্ধতি কোন দেশেই হুবহু চালু হতে পারেনি।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিশ্বের বহু দেশে সামরিক ও বেসামরিক একনায়কগণ রাষ্ট্র সরকার প্রধান ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে নিয়ে স্বৈরশাসন চালু রেখে দাবী করেছেন যে, তারা প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির গণতন্ত্র কায়েম করেছেন।

বাংলাদেশে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির নামে প্রধানমন্ত্রীকে প্রেসিডেন্টের উপর প্রভুত্ব করতে যেমন দেখা গেছে, তেমনি প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির নামে প্রধানমন্ত্রীকে প্রেসিডেন্টের আজ্ঞাবহ বানানো এবং পার্লামেন্টকে রাবার স্ট্যাম্পে পরিণত করাও সম্ভব হয়েছে।

প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির নামে এদেশে একই ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, সশস্ত্র বাহিনী প্রধান ও সরকারী দলীয় প্রধান হতে চরম একনায়কত্ব ও স্বৈরশাসন চালিয়েছে। তাই জামায়াতে ইসলামী পার্লামেন্টারী ও প্রেসিডেন্সিয়ান পদ্ধতির পরিভাষা নিয়ে বিতর্ককে একবারেই অর্থহীন মনে করে।

সরকার-পদ্ধতি প্রত্যেক দেশের জনগণের মরযী অনুযায়ী সে দেশের নিজস্ব প্রয়োজন পুরণের উপযোগী হওয়াই উচিত। কোন দেশের পদ্ধতি অন্য দেশে হুবহু নকল করা বাস্তবেও সম্ভব হয় না। তাই জামায়াত বাংলাদেশের উপযোগী একটি পদ্ধতি চালু করতে চায়।

এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো: রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধানের দায়িত্ব এক ব্যক্তির হাতে থাকবে না। শাসনতন্ত্রের উপর সরকারের যে কোন বিভাগের অন্যায় হস্তক্ষেপ রোধ করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র প্রধানের যে বলিষ্ট মর্যাদা থাকা প্রয়োজন তা জাতীয় সংসদের নির্বাচিত ব্যক্তির পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। জাতীয় সংসদ যেমন জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, তেমনি রাষ্ট্র প্রধানকে জনগণের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হতে হবে, যাতে তিনি গোটা দেশবাসীর নেতা হিসাবে গণ্য হতে পারেন, জাতীয় সংসদের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেন এবং বৃটিশ ক্রাউনের অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী হয়ে শাসনতন্ত্রের অভিভাবকের মহান দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হন।

এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো: জনগণের নির্বাচিত জাতীয় সংসদের উপরই দেশ শাসনের দায়িত্ব থাকবে এবং সংসদের নেতাই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সরকার প্রধানের দায়িত্ব পালন করবেন। শাসনতন্ত্রের বর্ণিত ক্ষমতার বাইরে রাষ্ট্র প্রধান দেশ শাসনের ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,

এখন আমি জামায়াতের নির্বাচনী মেনিফেস্টো থেকে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো পেশ করছি: দেশ গড়ার মূলনীতি সম্পর্কে জামায়াত ঘোষণা করেছে যে:

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বজায় রাখাকে সরকার দ্বীনি ও জাতীয় কর্তব্য মনে করবে।

২. দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ গণমানুষের আদর্শ ইসলামকে দেশের শাসননীতির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করবে।

৩. সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদ সরবারাহ্ সংস্থাগুলোর নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে এবং

৪. সকল দলের মত প্রকাশ করার অধিকার নিশ্চিত করবে।

ইসলামী আইন জারির মূলনীতি

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা প্রচার করে থাকে যে, ইসলামী সরকার কায়েম হবার সাথে সাথেই সব চোরের হাত কেটে দেয়া হবে এবং যিনাকারীদেরকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। এ প্রচারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অযৌক্তিক। প্রকৃত কথা হচ্ছে, ইসলামী আইন মেনে চলার জন্য জনগণের মন-মগজ তৈরী এবং পরিবেশ অনুকূল করা ছাড়া ইসলামী আইন জারি করা অবাস্তব। ইসলামী আইন জারি করার জন্য জামায়াত নিম্নরূপ কর্মনীতি গ্রহণ করবে:

১. জামায়াত বিশ্বাস করে যে, অসৎ শাসকের হাতে ভাল আইনও যুলুমের হাতিয়ারে পরিণত হয়। তাই চরিত্রহীন, দূর্নীতিবাজ ও অসৎ নেতৃত্ব থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য ইউনিয়ন থেকে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত সকল স্তরে নির্বাচনের মাধ্যমে সৎ লোকদের নেতৃত্ব কায়েম করা হবে।

২. শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে জনগণের চিন্তা, বিশ্বাস ও কর্মকে পরিশুদ্ধ করা হবে।

সামাজিক নিরাপত্তার এমন ব্যবস্থা করা হবে যাতে মানুষের খাওয়া, পরা বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির কোন অভাব না থাকে এবং অভাবের কারণে কেউ হারাম পথে রোজগার করতে বাধ্য না হয়।

৩. নারী ও পুরুষের শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্র এমনভাবে আলাদা করে দেয়া হবে, যাতে বিবাহ ব্যতীত তাদের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি সুযোগ না থাকে।

৪. যে সব সমস্যার কারণে আল্লাহ্ ও রাসূলের পথে চলা কঠিন মনে হবে, সে সব সমস্যা সমাধানের সব রকম ব্যবস্থা করা হবে।

এতসব ব্যবস্থা করার পরও যারা ইসলামী আইন অমান্য করবে, শুধু তাদেরকেই আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্ধারিত শাস্তি দেয়া হবে, যাতে ন্যায় বিচারের অভাবে সমাজে অপরাধ বেড়ে না যায়।

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রকে সংশোধন করা

১. আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র এবং কুরআন ও সুন্নাহকে আইনের উৎস বলে ঘোষনা করা হবে।

২. মৌলিক অধিকার ক্ষুন্নকারী সকল বিধিনিষেধ ও কালাকানুন রহিত এবং

৩. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করা হবে।

৪. দেশের প্রচলিত আইনকে সংস্কার করা হবে যাতে অল্প সময়ে ও সহজে মানুষ কোর্ট কাচারীতে সুবিচার পায়।

৫. বিবাহ, তালাক, খোলা ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে মহিলাদের আল্লাহর দেয়া অধিকার বহাল হয় এবং

৬. সব রকম নারী নির্যাতন বন্ধ হয়।

বিচার বিভাগকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্য

১. নিম্ন ও উচ্চ আদালতের বিচারকগণকে স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনার নিশ্চয়তা বিধান এবং

২. নিম্ন আদালতের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগের দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের উপর ন্যস্ত করা হবে।

প্রশাসনের সংশোধন করার লক্ষ্যে

১. সকল সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত দফতর থেকে ঘুষ, খেয়ানত ও দূর্নীতির উচ্ছেদ করা হবে।

২. জেলাগুলোকে নৈতিক ও মানসিক সংশোধন কেন্দ্রে পরিণত করা হবে।

আইন-শৃংখলা রক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে

নাগরিকদের নৈতিক ও চারিত্রিক মানোন্নয়নের এমন সুব্যবস্থা করা হবে যাতে তাদের মধ্যে খোদাভীতি, কর্তব্যবোধ, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও জনগণের প্রতি দরদ সৃষ্টি হয়।

গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতি গঠনের প্রধানতম মাধ্যম হিসাবে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে

- ❒ সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য চরিত্রবান যোগ্য দায়িত্বশীল লোক তৈরী করার লক্ষ্যে সর্বস্তরের নৈতিক শিক্ষা শামিল করা হবে।
- ❒ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদেরকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে জীবন সংগ্রামে যোগ্য ভূমিকা পালনের উপযোগী বানানো হবে।
- ❒ মহিলাদের জন্য পৃথক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।
- ❒ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব নমুনা হিসাবে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান এবং মাদ্রাসা সমূহকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আওতাভূক্ত করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষার মানে উন্নীত করা হবে।
- ❒ বিজ্ঞান, কারিগরি, কৃষি, জনস্বাস্থ্যসহ যাবতীয় বিষয়ে ব্যাপক গণশিক্ষার বাস্তব মাধ্যম হিসাবে সিনেমা ও টেলিভিশনকে কাজে লাগানো এবং
- ❒ শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলা ভাষা পূর্ণভাবে চালু করা হবে।

সাংস্কৃতিক অংগনের পুনর্গঠনের লক্ষ্যে

- ❒ ইসলামী মূল্যাবোধের আওতায় শিল্পকলার পরিপূর্ণ বিকাশের পথ প্রশস্ত করে শিল্পীদেরকে সমাজে উন্নত মর্যাদার অধিকারী হবার সুযোগ দেয়া।
- ❒ সাহিত্যের ন্যায় শক্তিশালী মাধ্যমকে সুস্থ ও সৃজনশীল চিন্তা চেতনার বাহন হিসাবে ব্যবহার এবং

- ❐ রেখা, অংকন, লিপি, ভাস্কর্য ও অনুরূপ শিল্পকে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে পূর্ণ সুযোগ দেয়া হবে।

জনগণের ধর্মীয় জীবনের উন্নয়নের জন্য

- ❐ নামায কায়েম ও রমযানের রোজা পালনের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও পরিবেশ সৃষ্টি এবং হজ্জের ফরজ পালনকে সহজ করা হবে,
- ❐ মসজিদকে সমাজ উন্নয়ন ও কল্যাণের কেন্দ্র বানানো, ইমাম ও খতীবদের যথাযথ মর্যাদা দান এবং
- ❐ যে সব কারণে সমাজে অশ্লীলতা, ব্যভিচার, পতিতাবৃত্তি ও নৈতিক অবক্ষয়ের প্রবণতা সৃষ্টি হয় সেগুলোর মুলোৎপাটন করা হবে।

জাতীয় জীবনে সুবিচারমূলক অর্থব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্যে

- ❐ দেশকে পর্যায়ক্রমে দারিদ্র ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা হবে,
- ❐ জনগণের মৌলিক প্রয়োজন (ভাত, কাপড়, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা) পূরণের ব্যবস্থাকে সরকারী দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত করা হবে,
- ❐ কর্মক্ষম সব নাগরিককে জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণের যোগ্য বানানো হবে।
- ❐ চাষীদেরকে ভূমিহীন হওয়া থেকে রক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- ❐ শিল্পের মুনাফায় শ্রমিকদের অংশ দিয়ে মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক উন্নয়ন করা হবে।
- ❐ হারাম উপায়ে আয় ও ব্যয় করার সকল পথ বন্ধ ও হালাল রুজি রোজগারের পথ উম্মুক্ত ও সহজ করা হবে।
- ❐ জনগণের স্বার্থে কর ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো এবং
- ❐ ব্যাংক, বিনিয়োগ ও ঋণদান সংস্থাকে সুদমুক্ত করা হবে।

ভূমি ব্যবস্থা পূণর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যে

- ❐ অনাবাদী ও খাস জমি ভূমিহীন ও স্বল্প জমির মালিক কৃষকদের কাছে সহজ কিস্তিতে বন্দোবস্ত দেয়া হবে।
- ❐ মালিকানাস্বত্ব বহাল রেখে সমবায় ও আধুনিক চাষাবাদ এবং সমবায় বাজারজাতকরণকে উৎসাহিত করা হবে।
- ❐ শিকস্তি জমির খাজনা মওকুফসহ পয়োস্তি জমির উপর নদী শিকস্তিদের মালিকানাস্বত্ব বহাল রাখা হবে।
- ❐ গ্রামের ভূমিহীন মানুষের বসবাস ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে।
- ❐ কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ, সার্টিফিকেট প্রথা বিলোপ ও ঋণ পরিশোধে অক্ষম লোকদের ঋণ মাফ করে দেয়া হবে এবং
- ❐ কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা হবে।

শিল্প কারখানা সম্প্রসারণ ও সুষ্ঠভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে

- ❒ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীগুলোর মালিকানা বেশী সংখ্যাক জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া ও পরিবারের সর্বোচ্চ পরিমাণ শেয়ার আইন দ্বারা নির্ধারণ করে দেয়া হবে।
- ❒ ছোট ও নতুন পুঁজি সংগঠকদেরকে বিশেষ সুবিধাসহ সুদমুক্ত ঋণ দেয়া হবে।
- ❒ ব্যাপক শিল্পায়নের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভারি শিল্প স্থাপন করা হবে।
- ❒ প্রতিরক্ষা শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং
- ❒ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হবে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান অনুযায়ী ব্যবসায়ী ও জনগণের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে

- ❒ দেশের অপরিহার্য পণ্য আমদানি এবং রফতানিযোগ্য পণ্যের বাজার সৃষ্টির সর্বাত্মক চেষ্টা করা হবে।
- ❒ যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য দেশের সকল অঞ্চলকে একটি উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার আওতায় আনা এবং রেল লাইনসহ যমুনা সেতু নির্মাণ করা হবে।

শ্রমিক, মজুর ও স্বল্প বেতনের কর্মচারীদের জন্য ইসলামী শ্রমনীতি অনুযায়ী

- ❒ ন্যূনতম বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা হবে।
- ❒ বেতন ও ভাতার হারে বর্তমান ব্যবধান ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনা হবে।
- ❒ শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদেরকে লভ্যাংশ থেকে বোনাস দেয়া হবে এবং
- ❒ শ্রমিকদের বাসস্থান ও চিকিৎসাসহ তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

দেশকে শুষ্ক মওসুমে পানির অভাব ও বর্ষাকালে বন্যা থেকে রক্ষার জন্য

- ❒ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ❒ খাল খনন ও নদী সংস্কারের মাধ্যমে শুকনো মওসুমে সেচ ব্যবস্থা ও বর্ষায় পানি নিষ্কাশন এবং জলাবদ্ধতা দুরীকরণের ব্যবস্থা করা হবে।

অর্থনৈতিক ভারসাম্য অর্জন, সম্পদের সুষম বন্টন ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে যাকাত, সাদাকাহ ও উশরের তহবিল গঠন করে

- ❒ বৃদ্ধ, অচল, পঙ্গু ও অভাবী লোকদেরকে ভাতা দেয়া হবে।
- ❒ ইয়াতীম ও গরীব শিশুদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।
- ❒ গরীবদের চিকিৎসা, ঋণগ্রস্থদের ঋণ পরিশোধ ও বিপন্ন মুসাফিরদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা এবং
- ❒ মানুষকে ভিক্ষা করার মতো অপমানজনক পেশা গ্রহণ থেকে রক্ষা করা হবে।

পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে

- ❒ গ্রামের যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য সর্বত্র রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট ও সাঁকো নির্মাণ করা হবে।

- বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থাসহ নর্দমা ও পায়খানার সহজ বন্দোবস্ত এবং
- সবার জন্য 'স্বাস্থ্য' নীতিকে বাস্তবে চালু করা হবে।

মহিলাদের ইসলাম প্রদত্ত মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বর্তমান নারী নির্যাতন বন্ধের উদ্দেশ্যে

- মহিলাদেরকে শরীয়তের সীমার মধ্যে জীবিকা অর্জনের সুযোগ দেয়া হবে।
- যৌতুক প্রথাসহ স্বামীর সব রকম যুলুম থেকে নারীদের রক্ষার ব্যবস্থা এবং তালাক ও মীরাসের ইসলামী বিধান চালু করা হবে।

অমুসলিম নাগরিকদের সার্বিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে

- তাদের জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা এবং নরাগরিক অধিকার সংরক্ষণ করা হবে।
- তফসিলী সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হবে।
- সকল উপজাতির স্বতন্ত্র জাতিসত্তার স্বীকৃতি এবং শিক্ষা ও চাকুরিসহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে।

বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে জামায়াত সুস্পষ্ঠভাবে ঘোষণা করছে যে:

জামায়াত বাংলাদেশকে এমন একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করবে যাতে মানবজাতি ইসলামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণকারিতা উপলব্ধি করতে পারে এবং এদেশের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সকল রাষ্ট্রের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি ইসলামী আদর্শের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে। সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ট সহযোগিতার সম্পর্ক এবং মুসলিম দেশগুলোর সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করাই বৈদেশিকনীতির মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য হবে।

প্রিয় দেশবাসী

শুধু একটি বক্তৃতার মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীর মতো একটি আদর্শ ভিত্তিক দলের গোটা পরিকল্পনা পেশ করা সম্ভব নয়। আমাদের প্রকাশিত সাহিত্য পড়ে দেখার জন্য আপনাদের নিকট আবদেন জানাচ্ছি। নির্বাচনে জামায়াতের মনোনীত প্রার্থীদের চরিত্র ও কর্মজীবন যাঁচাই করে দেখার জন্য আপনাদের প্রতি অনুরোধ রইল।

জামায়াতে ইসলামী কখনও ক্ষমতায় ছিল না। সরকারী ক্ষমতা জামায়াতের হাতে তুলে দিলে দেশের কতটুকু কল্যাণ হবে তা পরীক্ষা করার জন্য এবারের নির্বাচনে আপনারা জামায়াতের মনোনীত প্রার্থীদের বিজয়ী করুন। যারা ইতিপূর্বে দেশ শাসন করেছেন তাদের পরিচয় আপনারা পেয়েছেন। জমায়াতের পরিচয় পাওয়ার সুযোগ এবার এসেছে।

জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের বলিষ্ঠ আওয়াজ নিয়ে আপনাদের খেদমতে হাযির। জামায়াতের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশকে সততা, ইনসাফ ও কল্যাণের পথে এগিয়ে নেবার দায়িত্ব আপনাদের।

জামায়াতে ইসলামী দাঁড়ি-পাল্লাকে কেন দলীয় প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছে সে কথা উল্লেখ করা আমি প্রয়োজন মনে করছি। কুর'আন পাকের সূরা আল-হাদীদের ২৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, তিনি সকল রাসূলকেই কিতাব ও মীযান দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে ইনসাফ পেতে পারে। মীযান অর্থই হলো দাঁড়ি-পাল্লা। আল্লাহ্‌র কিতাবকে মানব সমাজে কায়েম করার জন্য রাসূলকে কিতাবের যে সঠিক ও ভাসাম্যপূর্ণ অর্থ আল্লাহ্ শিক্ষা দিয়েছেন তাকেই এ আয়াতে মীযান বলা হয়েছে। কিতাব ও মীযান নাযিল করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হেয়েছে, 'লি ইয়াকুমান্নাসু বিল কিস্‌ত্' যাতে জনগণ সুবিচার পেতে পারে।

মীযান বা দাঁড়ি-পাল্লা হলো ন্যায় বিচার বা ইনসাফের প্রতীক। জামায়াতে ইসলামী কুরআনে বর্ণিত ঐ দায়িত্ব পালন করতে চায় বলেই দাঁড়ি-পাল্লাকে প্রতীক হিসাবে বাছাই করেছে। আশা করি সমাজে ইনসাফ ও সুবিচার কায়েম করার উদ্দেশ্যে আপনারা দাঁড়ি-পাল্লায় ভোট দিয়ে জামায়াতে ইসলামীকে বিজয়ী করবেন।

আপনার ভোটের মূল্য অনেক। আপনারা যাদেরকে ক্ষমতায় বসাবেন তারা ভাল কাজ করলে আপনাদেরই উপকার হবে। আর তারা খারাপ কাজ করলে আপনাদেরই ক্ষতি হবে। কাদের হাতে ক্ষমতা দিলে আপনারদের মঙ্গল হবে তা বিবেচনা করে নিজেদের বিবেক অনুযায়ী ভোট দিন ॥

খোদা হাফিয
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ জিন্দাবাদ[১]

---

১. অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম, পৃষ্ঠা-৯, স্মৃতির পাতায় জননেতা আব্বাস আলী খান, নাজমুস সায়াদাত (সম্পা:), আব্বাস আলী খাঁন জীবন ও কর্ম, পৃ: ১৫২-১৬৭।

হস্তলিপি

কন্যা জেবুন্নেসা চৌধুরীকে লেখা জীবনের সর্বশেষ চিঠি

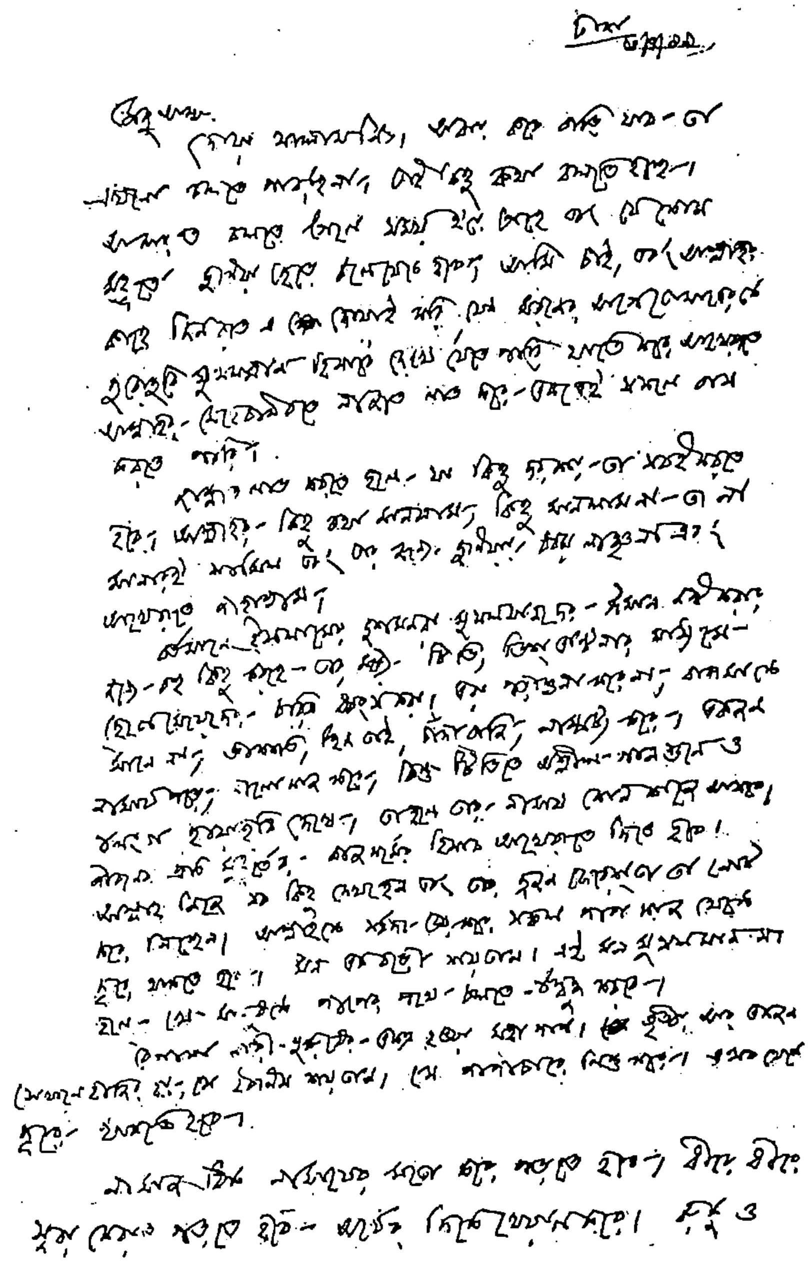

[illegible]

নিজের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের কয়েকজন ছাত্রের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠি

TA'LEEMUL ISLAM TRUST
JAIPURHAT

Ref :

Date 14.5.84

[illegible]

আত্মীয় স্বজন ও বংশধরদের উদ্দেশ্যে আব্বাস আলী খানের একটি অসিয়ত

ABBAS ALI KHAN
Senior Naibe-Ameer
Jamaati Islami Bangladesh

505 Elephant Road
Bara Moghbazar
Dhaka, Bangladesh
Phone : 401581, 417870, 401239 (O)
: 835440 (R)

Date 23.3.77
[illegible]

অসিয়ত

[illegible] অসিয়ত [illegible]

[illegible]

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ইতিহাস এর অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর ইতিহাস

ইংরেজী ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পূর্বে এ-নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানাটি ১৪ই আগস্ট ১৯৪৭ সাল থেকে [illegible] ঐ সময় এটা পূর্ব পাকিস্তান নামে ছিল।

[illegible]

[illegible]

(২)

[illegible] হিন্দু [illegible] পাকিস্তান [illegible]
[illegible]
[illegible] মুসলিম [illegible]
[illegible] মুসলিম [illegible]
[illegible] মুসলিম [illegible]
[illegible] 'মুসলিম' [illegible]
[illegible] 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' [illegible]
[illegible]
[illegible] ইসলাম ও মুসলিম [illegible]
[illegible] মুসলিম [illegible]
[illegible]

[illegible] পাকিস্তান [illegible]
[illegible]

(৩)

[illegible]

ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর শাহাদাত সম্পর্কে আব্বাস আলী খানের লেখা একটি ইংরেজি প্রবন্ধ

Martyrdom of Imam Hussain

— Abbas Ali Khan.

Imam Hussain bin Ali (May Allah be pleased with them) was barbarously and mercilessly slain along with his associates and members of his family by the soldiers of Yazid bin Muabia, in Karbala on the 10th of Muharram. This day, is therefore, observed throughout the Muslim world as a Day of Mourning as also a day of taking oaths to stand against all oppressions and suppressions, against all-cruelties and tyrannism. Many other historical events took place on this day.

What was the fault of Imam Hussain, the grandson of Prophet Mohammad (S) who loved him most? His only fault was that he denied oath of allegiance to Yazid who came to power illegally, adopting methods repugnant to the fundamental principles of Islam.

All the caliphs after the demise of Prophet Mohammad (S) were elected with ~~unanimous~~ unanimous support of the people. The four rightly guided caliphs (Khulafa-i-Rashedeen) ran the administration and did everything as caliph in consultation with a

body of wise and learned associates of the Prophet - called Majlis-e-Shoora (Council of advisors). Their every decision was taken fully in accordance with the tenets of Quran and Sunnah.

Baitul mal, the public money - was regarded as a sacred trust, and every it was ~~dealt~~ fully preserved and ~~every~~ every penny was spent in right way without any reservation ~~and so~~ whatsoever. Lives and properties and fundamental rights of people, irrespective of friend and foe, race and colour, high and low, were fully protected and justice done.

These and other fundamental principles of an Islamic State established by Prophet Mohammad (S) were abandoned or overlooked and Caliphate took the shape of full Kingship - These, in principle, could not be accepted and tolerated by the Muslims. And Imam Hussain (may Allah be pleased with him) stood against all these and refused to recognise Yazid as a true Caliph.

The Prophet Mohammad (S) said: The noblest Jehad (Struggle in the way of Allah) is to speak

the truth in front of a tyrant. ~~ruler~~. This Imam Husain fearlessly did and incurred the rage of Yazid.

Imam Husain with a handful of his associates and members of family left for Iraq and on the way he was surrounded by the soldiers of Yazid. He had no intention to fight and asked them either to let him return back to Madina or go to Yazid. But they turned deaf ear and started fighting and killing. Husain was ruthlessly beheaded and his head was trampled by horses. What a horrible Scene!

The shahadat of Imam Husain, (May Allah be pleased with him) left an everlasting inspiration in the minds of the future generations to firmly stand against all falsehoods, tyranny and oppressions. After that in all ages, leaders of Muslim Ummah followed the footprints of Imam Husain.

Let us the Muslims, gird up our loins and stand firmly against all such tyrants and build a society based on the fundamental principles of Islam, and establish safety and security, peace and tranquility, universal love and affection.

একটি গ্রন্থ পর্যালোচনা

[illegible] [illegible] [illegible] — লেখক [illegible] [illegible]
[illegible] (স্ব:) এ [illegible] [illegible]" গ্রন্থটিতে [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লিখেছেন।

[illegible], প্রকৃতি-পরিবেশ, [illegible],
ভক্তিবাদ, ঈশ্বর ও বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক [illegible] ও
ইতিহাস — এই সবগুলিরই সমাবেশ ঘটেছে গ্রন্থটিতে। লেখকের
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ও [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

গ্রন্থটির [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] করেছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]। [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে। [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible]?
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গ্রন্থটির [illegible] [illegible] হয়েছে —
[illegible] [illegible] [illegible], গ্রন্থটিতে [illegible] [illegible] হয়েছে। [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] হয়েছে।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] — [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]। [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে। [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] — [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] — [illegible] — [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible]।

আলোচিত্র

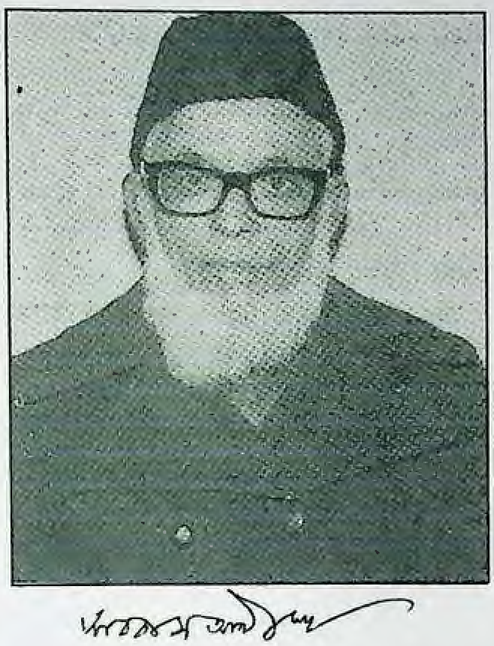

১নং চিত্র : আব্বাস আলী খান

২নং চিত্র : চির নিদ্রায় শায়িত আব্বাস আলী খান

৩নং চিত্র : সেমিনারে বক্তৃতারত আব্বাস আলী খান (সেপ্টেম্বর-১৯৯৭)

৪নং চিত্র : অফিসে অধ্যয়নরত আব্বাস আলী খান

৫নং চিত্র : পল্টন ময়দানে আব্বাস আলী খানের শেষ ভাষণ (৪ জুলাই, ১৯৯৯ ইং)

৬নং চিত্র : আব্বাস আলী খানের আত্মার প্রতি সালাম জানাচ্ছেন
সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ

৭নং চিত্র : আব্বাস আলী খানকে শেষ চুম্বন করছেন অধ্যাপক গোলাম আযম

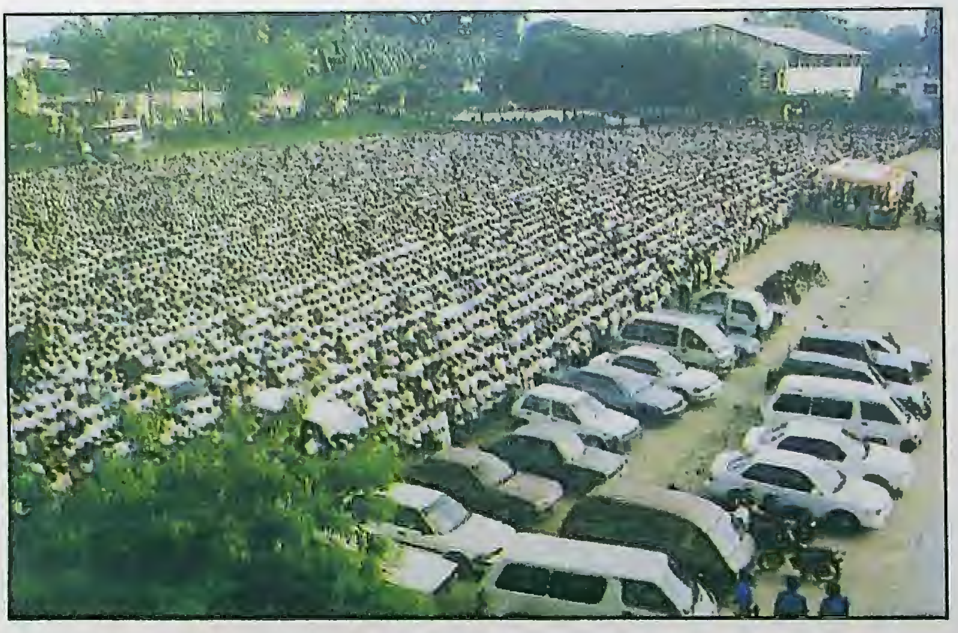

৮নং চিত্র : পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জানাযা

৯নং চিত্র : বগুড়া শহরে আব্বাস আলী খানের ২য় জানাযা

১০নং চিত্র : জয়পুরহাটে সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ময়দানে আব্বাস আলী খানের ৩য় জানাযা

১১নং চিত্র : জয়পুরহাটে জানাযায় শরিক হওয়ার জন্য শোকার্ত মানুষের ঢল

১২নং চিত্র : নিজবাড়ী আঙ্গিনায় খোড়া হচ্ছে আব্বাস আলী খানের কবর

১৩নং চিত্র : আব্বাস আলী খানের মৃতদেহ কবরে নামাচ্ছেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

১৪নং চিত্র : আব্বাস আলী খানের দোয়া মাহফিলে উপস্থিত সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস, হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ

১৫নং চিত্র : আব্বাস আলী খানের দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক গোলাম আযম

১৬ নং চিত্র : আব্বাস আলী খানের স্মরণ সভায় উপস্থিত জামায়াত নেতৃবৃন্দ

১৭নং চিত্র : জয়পুরহাট হাই স্কুল- এই স্কুলে আব্বাস আলী খান প্রধান শিক্ষক ছিলেন

১৮নং চিত্র : জয়পুরহাট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণের তালিকা।
তালিকায় আব্বাস আলী খানের নাম ৫নং ক্রমিকে

১৯নং চিত্র : জয়পুরহাট শহরে আব্বাস আলী খানের প্রতিষ্ঠিত
তা'লীমুল ইসলাম একাডেমী স্কুল এণ্ড কলেজ

২০নং চিত্র : ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সহকারী মহাসচিব ফুয়াদ আব্দুল হামিদ আল
খতীব এর সঙ্গে আব্বাস আলী খান

২১নং চিত্র : একটি বিশেষ সাক্ষাতকারে আব্বাস আলী খান

২২নং চিত্র : জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কর্মপরিষদ বৈঠকে আব্বাস আলী খান

২৩নং চিত্র : মাওলানা মওদুদী রিসার্চ একাডেমীর বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করছেন আব্বাস আলী খান

২৪নং চিত্র : জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ মজলিসে শুরার বৈঠকে আব্বাস আলী খান

মরহুম আব্বাস আলী খান এর বর্তমান বংশধর

খান জেবউননেসা চৌধুরী আব্বাস আলী খান এর একমাত্র কন্যা। তাঁর স্বামীর নাম- আলতাফ হেসেন চৌধুরী। তিনি আব্বাস আলী খানের জীবদ্দশায় ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। খান জেবউনসেনা চৌধুরীর চার সন্তান। একমাত্র ছেলে হাবিবুল হাসান চৌধুরী মাসুম বর্তমানে বাংলাদেশ রপ্তানী উন্নয়ন কর্পোরেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তিনি এক ছেলে ও দু' মেয়ের জনক।

খান জেবউননেসা চৌধুরীর বড় মেয়ে নাসিমা আফরোজ মুন্না। তাঁর স্বামী মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম নাসিম। তিনি পেশায় প্রকৌশলী। তাঁদের চার ছেলে-মেয়ে। খান জেবউননেসা চৌধুরীর দ্বিতীয় মেয়ে লায়লা নাসরীন পান্না। তার স্বামী কাজী মোঃ মোরতুজা আলী প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তাঁদের তিন ছেলে মেয়ে। কনিষ্ঠ কন্যা শামীমা পারভীন চৌধুরী পারু স্বামী সদরুল ইসলাম। ছেলে সাকিব এবং মেয়ে শামিরা সামুসহ বর্তমান সিংগাপুর প্রবাসী।

নিম্নে একটি ছকে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো

- মরহুম আব্বাস আলী খান
  - খান জেবউননেসা চৌধুরী
স্বামী: মরহুম আলতাফ হোসেন চৌধুরী
    - হাবিবুল হাসান চৌধুরী মাসুম
স্ত্রী: রেবেকা সুলতানা চৌধুরী মিলি
      - লাবিবা মোসাররাত চৌধুরী মৌলি
      - মানজের হাসান চৌধুরী রিশাদ
      - নাহিদা মোসাররাত চৌধুরী মৌমি
    - নাসিমা আফরোজ মুন্না
স্বামী: মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম নাসিম
      - সিরাজুম মনিরা শার্লী
স্বামী: তাহমিম হোসাইন খোকন
      - শবনম সাবাহ
      - সোহাইলি ফারজানা
      - মাশরুর সিরাজ সাবিত
    - লায়লা নাসরীন পান্না
স্বামী: কাজী মো: মোরতুজা আলী
      - মুনতাসির শাকিল
      - মুনতাসির নাবিল
      - নাজিয়া নুসরাত সৌমি
    - শামীমা পারভীন চৌধুরী পারু
স্বামী: সদরুল ইসলাম
      - সাকিব
      - শামিরা সামু

Rajshahi University Library
Documentation Section
Document No D-2024
Date 28.4.08